অবধূত ও যোগিসঙ্গ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই
১৩৬৭

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

উৎসর্গ—

যোগিবর—অর্ক অবধূত,—

হে যোগেন্দ্র—অশেষ করুণাময় ভক্তপ্রাণ কবি,
তব করুণার ছবি আঁকা আছে মম চিত্তপটে,—
প্রত্যক্ষ দর্শন যবে সেইক্ষণ হতে তীর্থরাজ প্রয়াগ সঙ্গমে,—
স্নান শেষে বাঁধের উপর, নাটকীয় আবির্ভাব তব
দিগম্বর যেন ছদ্মবেশে—! সঙ্গে সঙ্গে
চুম্বকের আকর্ষণ—নির্দ্ধারিত গতি মম তব সাথে সাথে,—
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে—পথে পথে, প্রেমে বাঁধা চির সাথী যেন।
শয়নে, ভোজনে, বিরামের কালে বৃক্ষতলে, শবাসনে, তারি পাশে
আমি তব শরীর রক্ষক,—এইভাবে কয়মাস।
ইতি অবসরে এক শুভক্ষণে, উদ্ঘাটিত অতীত জীবন,
সত্য পূত স্বরূপ তোমার, জন্ম হ'তে যত বিবরণ,—
শুনায়েছ দিনে দিনে।
অতঃপর বিস্ময়ের উপর বিস্ময় যোগ বিভূতির খেলা, হে স্বামী,—
প্রত্যক্ষ যা দেখেছিনু আমি, নানা ক্ষেত্রে—তব আচরণে,
সে সকল করিয়া স্মরণ তারি সাথে আরও কত কিছু,
এই গ্রন্থাকারে আজ সাহিত্যের আর একখানি
পুণ্যস্মৃতিরূপে তোমাতেই করি সমর্পণ। অতঃপর,—
লহ নমস্কার! পুনঃ নমস্কার!! পুনঃ পুনঃ নমস্কার!!!

কয়েকটি কথা

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ তৃতীয় ভাগ নামে যে সকল বিবরণ, "কথাসাহিত্যে" এক বৎসরের উপর প্রকাশিত হয়ে চলেছিল—তার মধ্যে তখনও যোগীর কথা আসেনি, অবধূতের কথাও নয়, অথচ ঠিক তার পরেই সে সব এসে পড়েচে। তা ছাড়া এক বৎসরের উপর যেটুকু বেরিয়েচে তা সামান্য। ক্রমশ সবটা বার হতে আরও কয়েক বৎসর লাগতো সেই কারণেই আর মাসে মাসে প্রকাশের বিলম্বিত পথে না গিয়ে গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ প্রকাশই ঠিক হবে মনে করে এই ব্যবস্থা হয়েচে। যোগীর কথা ও অবধূতের কথাই এই গ্রন্থের বেশী অংশ অধিকার করেছে তাই অবধূত ও যোগিসঙ্গ নামেই প্রকাশিত হোলো।

আমি একদিকে ভাগ্যবান, কারণ ইতিমধ্যেই কয়েকজন কল্যাণকামী বন্ধু স্থানীয় সুধী, যাঁরা বইখানির প্রেসে যাওয়া ও নাম পরিবর্ত্তনের কথা জেনেছেন তাঁদের কেউ কেউ এসে ধরেচেন, তন্ত্রের সম্পর্ক দিয়ে নামটায় লোকের একটা বিশ্বাস ছিল যে তন্ত্র সম্বন্ধেই আলোচনাটা চলছিল, নূতন নামে হয়তো তন্ত্র সম্বন্ধে আরও কিছু পাবার যোগাযোগ আর রইলো না।

তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে,—যেমন কানু ছাড়া গীত নেই তেমনি এই ভারতের সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সাধন বিভাগে যোগযুক্ত ক্রিয়ামূলে যা কিছু তা ঐ তন্ত্রধর্ম্মের অন্তর্গত শিবেরই দান। অন্যভাবে বললে, এই ভারতের মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার মধ্যে তন্ত্রধর্ম্মের অন্তর্গত যোগমার্গ অবলম্বিত হয়নি। আরও বলা যায়; শুধু এই ভারতে নয়, সারা এসিয়া খণ্ডেও এমন কোন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে শিবের, যোগ-ধর্ম্মের প্রভাব পড়েনি। শুনতে হয়তো অনেকের কানে বেসুরো লাগবে, সভ্যজগতে আজও সকল প্রচলিত ধর্ম্মমতের মধ্যেই উপাসনা ও সাধনক্ষেত্রে যম, নিয়ম, আসন ও জপপদ্ধতি যোগমার্গের প্রাথমিক নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বাইরে গিয়েছে এবং সাধনমার্গে সেই সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের অধিকার অনুসারেই গৃহীত হয়েছে। তবে দান ও গ্রহণ ছেড়ে দিলেও সাধারণতঃ স্মরণ-মনন এ দুটি প্রত্যেক জীবেরই অধিকার, তা কারো গ্রহণের অপেক্ষা রাখে না বা দানেরও অপেক্ষা রাখে না কিন্তু অপরকে প্রভাবিত করবার শক্তি রাখে। সেই হিসাবেই এই যোগধর্ম্মের প্রভাব আজ য়ুরোপ-য়্যামেরিকায় প্রভাব বিস্তার করচে—তা এখানকার যোগীগণের আচরণে প্রভাবিত হওয়ার ফল,—আর মূলে সেটা শিবের অথবা ভারতীয় কোন যোগীরই দান অথবা অবদান।

সুতরাং নাম পরিবর্ত্তনে মূলতত্ত্বের কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি। একথা সহজেই বলা যায়।

প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র



অবধূত ও যোগিসঙ্গ

১

নদীতীর শ্মশানে

মেঘে ঢাকা সারাদিনটা আজ আঁধার, মনের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া কম নয়। কাল বৈকালে এখানে আসিযা পৌঁছিয়াছি আর শ্মশান হইতে কতকটা দূরে এই বিশাল বট-গাছটির তলায় ভক্তিভরেই আসন পাতিয়া কালযাপন করিতেছিলাম। নদীটি আমাদের গঙ্গা, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায এক মাইল হইবে। যখন এখানে আসি তখন জানিতাম না এটি শ্মশান। কাল সন্ধ্যায় একদল আসিয়া শবদাহক্রিয়া আরম্ভ করিল আমাব সম্মুখেই, তাহাতেই জানিলাম এই স্থানের মাহাত্ম্য আছে। সারারাত্র তাহারা কাবণানন্দে মনোবল বৃদ্ধি এবং আপনাদেব কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া আজ সকালে চলিয়া গেল, আব আমি দ্রষ্টা হইয়াই বাত্র কাটাইলাম। আজ সকালে দেখি আকাশের মেঘে ছাওয়া আঁধাব-কবা মূর্ত্তি।

কিন্তু কি আকর্ষণ ছিল জানি না, এখান হইতে নড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পাশে অল্পদূরেই গ্রাম, ঘন ঘন বিশালাকায় গাছের বিশাল প্রাচীর মধ্যে যেন কোন অজ্ঞাত জগৎ লুকাইয়া বহির্জ্জগৎ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। সারাদিনই এখানে বসিয়া বসিয়া কত কি দেখিলাম। এই ভূমি তখন মোটেই বিজন ছিল না, বলিতে গেলে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের বালক-বালিকারাই স্থানটি চঞ্চল করিয়া, যেন হাট বসাইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিল, ঐ চাঁদের মুখ দেখিয়াই সারাদিনের আঁধার ভাবটা কাটিয়া গেল। এইবার যেন আমার দিন আসিল,—সন্ধ্যাটা হইয়া গেল প্রভাত। প্রভাতের প্রফুল্লতা আনিয়া দিল আমার দুঃখপীড়িত মনের মধ্যে। দুঃখ ছিল মনের মধ্যে, চন্দ্র উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেই গ্লানি দূর হইয়া অন্তরে প্রফুল্লতা আনিয়া দিল।

প্রথমে সোনালী চাঁদ, ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে শুভ্র আর উজ্জ্বল হইতে লাগিল আর দিঙ্‌মণ্ডল স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া উঠিল, তাহাতেই নেশার মত একটা আবেশ সৃষ্টি করিল আমার মধ্যে; স্থান-মাহাত্ম্য যেন গুরুতর হইয়া উঠিল তাহার প্রভাবে। কোন অজ্ঞাত আনন্দলোকের সন্ধান আমার মনোরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—এমনই ভাবে আমার প্রাণ হইল উন্মুখ, এক অপার্থিব আনন্দময় আস্বাদনের মধ্যে যেন ডুবিয়া গেলাম।

এই জটিল সংসার ক্ষেত্রে সব দিন সবার পক্ষে আলোর দিন হয় না,—আবার কারো কারো ভাগ্যে রাত্রেও দিনের আলো আসে। প্রকৃতির সকল কিছুই অদ্ভুত এই মায়ারাজ্যে, মানুষের মন লইয়া খেলার অন্ত নাই তার,—সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কত ভাবের সৃষ্টিছাড়া খেয়াল।

বলিয়াছি নদীতীরে শ্মশান,—বেশ বিস্তৃত শ্মশান,—চারিদিকে ছোট ছোট গাছ, মধ্যে একটি বড় গাছ—কিন্তু খানিক তফাতে এক বিশাল বটবৃক্ষ—এই গাছটিই আমায় আকৃষ্ট করিয়াছে এখানে। তার অসংখ্য ঝুরি নামিয়াছে চারিদিকেই। গ্রামের ছেলেরা ঐ ঝুরিগুলির সঙ্গেই সম্বন্ধ বাখিয়াছিল গভীর ভাবেই, মহা কোলাহলে তাহারা সারাদুপুর ও বৈকালটা তাহাতে ঝুলিয়াছে, দোল খাইয়াছে, আরও কত কি করিয়াছে দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি আসলে মুক্ত প্রাণেই এখানে তাহাদের উদ্দাম খেলার সাধই পূর্ণ করিয়াছে। তার পর সন্ধ্যার আগেই তাহারা যে যার ঘরে চলিয়া গিয়াছে—স্থানটিকে শব্দহীন বিজনতায় পূর্ণ করিয়া। এই বিশাল মহীরুহের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ বসিয়া বসিয়া দেখিলাম। চক্ষে দেখিলাম তাহাদের ভালবাসা—শ্মশানের ঐ গাছটিকে ঘিরিয়া সারাদিন খেলা করিয়াছে,—যেন তাহার অস্তিত্বকে তাহারাই সার্থক করিয়াছে, না হইলে শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে ঐ বটগাছটির সম্বন্ধ শুধু ছায়ার, স্বার্থের আড়াল। যদিও তাহার মধ্যে পীড়ন নাই, ঘনিষ্ঠ ভাবও নাই। ছেলেরা দুরন্ত—খেলার ছলে ঘনিষ্ঠ পীড়ন বড়ই নির্মম; সে পীড়ন সহ্য করা—এ সহিষ্ণুতা, একমাত্র ধরিত্রীতেই সম্ভব, আব এই বনভূমি মধ্যস্থ তরুবর ধরিত্রীরই গর্ভজ সন্তান, তাই তাহার পক্ষেও সম্ভব হইয়াছে।

এখানে আমি একেবারেই নিঃসঙ্গ ছিলাম না,—কাল বৈকাল হইতেই আমার সঙ্গী ছিল এই শ্মশানভূমির কয়েকটি কুকুর। এখন আমার বর্ত্তমান আশ্রয়, এই বটবৃক্ষের গোড়ায় ছোট বড় কতকগুলি শিলাখণ্ড,—তাহাতে কোন সময়ে প্রচুর সিন্দুর লিপ্ত ছিল, এখন অতীব অস্পষ্ট ছাপ আছে কোন-কোনটার অঙ্গে। বিশাল গাছটির মূল যেখানে, অনেকটা স্থান জুড়িয়াই মোটা মোটা শিকড়গুলি শিবের জটার মত একটির সঙ্গে আর একটি জড়াজড়ি করিয়া আছে,—জমি হইতে খানিক উঁচু। একসময় বাঁধানো ছিল, এখন উহা ফাটিয়া চটিয়া ঘাস জন্মাইয়া একপ্রকার সমতল আশ্রয়ের মত হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিতে শ্রীহীন হইয়াছে।

এই গাছটির, যেখানে সমষ্টিবদ্ধ মূল শিকড়গুলি একাকার—অনেকটা পরিধি তাহার পার্শ্বেই একটি কুটিরাভাস,—পশ্চাদভাগ ঘেঁষিয়া তাহার একদিকের দেয়াল,—তার ভিতরে ঐ গাছের অবস্থান-গুণে একটি বিশাল গহ্বর,—তাহাই কুটিরের অভ্যন্তর ভাগ,—উপরে খড়ের-ছাওয়া আর তিনদিকে দরমার বাঁশ বাঁধা। দরজা বলিয়া কোন অনুষ্ঠান নাই, একখানা বাঁশ একটি বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা,—সরাইয়া ঢুকিতে এবং বাহিরে আসিতে

হয়, কুটিরের মধ্যে কেহই নাই, অন্ততঃ কাল হইতে কাহাকেও দেখি নাই। যদিও দিনমানে অনেকেই এদিকে আসিযাছে ও গিযাছে,—তবে ঐ কুকুর কযটি দেখিতেছি অশনের টানে মধ্যে মধ্যে দৌড়িযা গ্রামের পানে গেল, অল্পক্ষণেই আবার সেই ভাবেই দৌড়িয়া আসিযা ঐ কুটিরের কাছেই একদিকে বিশ্রামের ভঙ্গিতে দেহ রাখিয়া এদিক ওদিক চাহিযা দেখিতে লাগিল।

এই ভাবেই তিনটি সঙ্গী আমার সারাদিনই কাটাইল দেখিলাম। আমার ভাগে আজ কোনপ্রকার অশনের প্রবন্ধ ঘটে নাই। তাহার জন্য ক্ষোভ বা দুঃখবোধ ছিল না,—কারণ তখন অন্তরের ভাবটি ছিল গাঢ়,—যদৃচ্ছা লাভ। আবার অপরের কাছে অন্নাভাব জানাইযা হাত পাতিযা কিছু গ্রহণের গ্লানিও অসহ্য। বটতলায নিশ্চিন্ত মনে দুই এক রাত্র উপবাসে বরং মুক্তির আনন্দ আছে। দেখিলাম ঐ তিনটি কুকুর কিন্তু একটি বিষযে বড় সজাগ,—যদি কেহ ঐ কুটিরের দিকে যাইতেছে দেখা গেল—তাদের তিনটি মূর্তিই মাথা তুলিযা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল,—যতক্ষণ না সেই কুটিরের গণ্ডি ছাড়াইযা যায়। ইহাতে এটুকু বেশ বুঝা গেল যে ঐ কুটিরের অধিকারীর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধটা গভীর এবং ইহাদের ভরসাতেই সে ব্যক্তি কুটির ছাড়িযা দীর্ঘকাল থাকিতে পারে।

এখন গঙ্গার ওপারে চাঁদ,—জলে তাহার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি,—অনেকটা স্থান জুড়িয়াই খেলা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বায়ুর গতিতে চঞ্চল জলস্রোত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন করিযা সমগ্র চন্দ্রলেখা ব্যাপ্ত, সেই দীর্ঘ ছবি ওপার হইতে এপারের তটরেখা স্পর্শ করিতেছে। সে এক মহা উজ্জ্বল নক্ষত্রঢালা যেন জ্যোতির্ময ছাযাপথ। এখানে তরু-মূলাশ্রযে এমন বসিয়া বসিযা নযনাভিরাম, বৈচিত্র্যময প্রকৃতির খেলা দেখিতে দেখিতে কোন এক সীমাহীন, রূপহীন চিন্তাতরঙ্গে, যেন পূর্ণ আনন্দের মধ্যেই ভাসিযা চলিয়াছি।

একটু যেন জোর বাতাসের স্পর্শে আমি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম। অল্প দূরেই এক মূর্তি,—ঠিক যেন জল হইতে উঠিয়া আসিতেছে,—এই দিকে শ্মশানভূমি লক্ষ্য করিয়াই আসিতেছে। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে অদূরেই এক খেয়া দেখিয়াছিলাম, বোধ হয় এই মূর্তি সেই খেয়া হইতেই জলের ধারে ধারে আসিয়া এখন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। পিছনে চাঁদ, মনে হয় যেন জল হইতে উঠিয়া আসিতেছে এক ছাযামূর্তি, স্থির ও ধীর গতিতে আমার পানেই আসিতেছে। ক্রমে দেখা গেল তার ডান হাতে একটি ত্রিশূল আর বাম হস্তে একটি ঝোলা,—সম্ভবতঃ উহা একটু ভারিও—তাহা বুঝা যাইতেছিল তাঁহার একদিকে একটু হেলিয়া চলার ভঙ্গি দেখিয়া;—কিন্তু তাঁহার মধ্যে অস্থিরতার লেশমাত্র নাই। ক্রমে আরও কাছে আসিলে স্পষ্টই দেখা গেল কাপড় পরায় একটু কৌশল আছে। হাত দুটি দিয়া যাহার ব্যবহার করা যায় এমনভাবে একবস্ত্রে সর্বাঙ্গ ঢাকা। দুই পাশেও

পিঠের দিক জড়াইয়া বুকের সঙ্গে গাঁট বাঁধা ; যেমন পশ্চিমে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। এমনই ভাবে সেই মূর্ত্তি বিনা বাধায় বটতলায় আসিয়া উঠিলেন যেন



এস্থানের সঙ্গে পরিচয় অতীব ঘনিষ্ঠ। গাছ-তলায় সেই বেদির মত স্থানটির উপর হাতের বোঁচকাটি রাখিতে না রাখিতেই কুকুর তিনটি একই সঙ্গে দৌড়াইয়া আসিল এবং লেজ নাড়িতে আরম্ভ করিল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া। তৎক্ষণে অপর হাতের ত্রিশূলটি একটা ডালে ঠেকাইয়া রাখা হইল।

এখন তাঁহার ঘোরাফেরার ফাঁকে চাঁদের আলো মুখে পড়িতেই দেখা গেল একটি নারীমূর্ত্তি, ভৈরবী,—বেশ স্বাস্থ্যবতী, বোধ হয় ছাই মাখা, তাই রংটা অপূর্ব্ব রজতাভ শুভ্র,—চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বল। মাথায় জটায় চূড়াবাঁধা যেন হিমালয়ের পার্ব্বতী। এই দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাবে স্থানটি যেন অকস্মাৎ মধুময় হইয়া উঠিল। ভৈরবী তো আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকই দেখিয়াছি কিন্তু এমন চাঞ্চল্যহীন রূপ সহজ বস্তু আর কোথাও দেখি নাই। তাঁর বয়সটা যে কত হইতে পারে তা দেখিয়া অনুমান করা দুঃসাধ্য। একটু খর্ব্বাকারই হইবে, কিন্তু বয়স অনুমান, চাঁদের এই মায়াময় স্নিগ্ধ আলোকে একেবারেই অসম্ভব। আমার পক্ষে এখন সব কিছুই যেন সাধারণ হিসাবের বাহিরে। বুঝিতেছি অন্তর ক্ষেত্রে নীরব আলোড়ন আরম্ভ হইয়া গেল। অনির্ব্বচনীয় এক অনুভূতি আমায় চঞ্চল করিয়া তুলিল,—এই অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। পূর্ব্বের সে তন্ময়তা কোথায়

চলিয়া গেল, অথচ রূপ যাহাকে বলে আর সৌন্দর্য্যানুভূতির সঙ্গেই ইহার যে সম্বন্ধ, তা যথার্থ নাই এই মধ্যে ;—আছে মাত্র ইহার প্রকট প্রভাব—সে প্রভাব কাহারও এড়াইবার সাধ্য নাই।



যেখানে আমি বসিয়াছিলাম সেখানটা ছাওয়া, শিকড় হইতে একটা চওড়া মোটা ডাল উঠিয়াছে, তার ছায়াও বটে। তাহাতে এখন হইল কি,—একটা কুকুর হঠাৎ দৌড়াইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,—একবার আমার মুখের পানে চাহিল,—এবং তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া ভৈরবীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কুঁই কুঁই করিয়া যেন কি জানাইল। ঐ কুকুরের গতি অনুসরণ করিয়াই ভৈরবীর দৃষ্টি পড়িল আমার দিকে ;—কুকুরটা ঠিক যেন আমায় দেখাইয়া দিল। তখন ভৈরবী আমায় দেখিয়া, কোমল কণ্ঠে বলিলেন, কে ওখানে ? কাজেই আমায় উঠিতে হইল,—তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে দেখিয়া লইলেন। সবিনয়ে বলিলাম, আমি পথিক, কাল সন্ধ্যা থেকেই এখানে আছি। তারপর তাঁর প্রশ্নের ধারা,—কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আগমন, যাইবই বা কোথা, উদ্দেশ্য কি, এই সকল পর পর মোটামুটি সকল কিছু জানিয়া শেষে এই প্রশ্ন আসিল,—এখনকার দিনে রেল, নৌকা বাদ দিয়া হাঁটা-পথে দেশের সব মাটি মাড়াইয়া বেড়াইবার উদ্দেশ্যই বা কি ? তাহার উত্তরে বলিলাম,—হেঁটে বেড়াতেই আমার আনন্দ,—তাছাড়া আমার অবস্থাও ঠিক লম্বা ট্রেনে পাড়ি দেবার

অনুকূল নয়। কত লোক সারা পৃথিবীটা হাঁটাপথেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমার সাধ্য থাকতেও খানিক হাঁটতে পারবো না ?

এর ওপর আর কথা নেই, বলিয়া ভৈরবী কুটিরের দিকে কতকটা অগ্রসর হইলেন,—তারপর,—এখন আপনি একটু বসুন যেমন বসেছিলেন, আমি ঘরকন্নার কাজটুকু সেরে নি। আজ তিনদিন ছিলাম না, দেখি ইঁদুরগুলো কি কাণ্ড করে রেখেছে। বলিয়া ঝাঁপ উঠাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমি বসিলাম বটে,—কিন্তু কি জানি কেন মনটা অস্থির হইয়া উঠিল,—এতটাই বিচলিত হইয়া উঠিলাম যে এখানে থাকিতে কিছুতেই প্রাণ চাহিল না। যেন কোথাও বাঁধা পড়িতেছি, আমার আধ্যাত্ম্য গতিপ্রবাহ যেন প্রতিহত হইতে বসিয়াছে,—যদি এখনও সাবধান না হইতে পারি তাহা হইলে আমি কোন্ অতলে তলাইয়া যাইব। এটা যেন আমার স্বাভাবিক সংযমের উপরেই আক্রমণ মনে হইতে লাগিল। অথচ ভৈরবীর প্রতি একটা সহজ উপেক্ষার ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাবই নাই। কিন্তু মনের অগোচরে তাহার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিয়া সম্বন্ধটা যাহাতে ঘনিষ্ঠ হইতে না পায় এমনই একটা সাবধানতার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে আমার মন। এখন যাহা কিছুই স্থির করিতে যাই—তাহাই প্রতিকূল ভাব লইয়া অস্থির করিয়া তোলে আমাকে।

স্থানটি গোড়াতেই ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াছি, তারপর এক রাত্র এবং একটি পূর্ণ দিনমান কাটাইয়া একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম, এমন কি এখানে কিছুদিন থাকিতেও একটা আগ্রহ ছিল,—কিন্তু এই অপরিচিত ভৈরবীর আগমনে এখন আমার মনের অবস্থা মহাদ্বন্দ্বময় হইয়াই উঠিল। কত রকমের কত ভাবই যে মনে উঠিতে এবং মিলাইতে লাগিল তাহার বর্ণনা অসম্ভব। এখনও তো সময় আছে,—বাহির হইয়া পড়িলে কে বাধা দিবে ? জ্যোৎস্নারাতে পথচলা ভালই লাগিবে, এতটা দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর, দিনের গরমের হাত এড়াইয়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাইবে ভালো, এখানে যতক্ষণ থাকা, ততক্ষণই আকর্ষণ, না থাকিলে তো আর তা নাই, সুতরাং শনৈ শনৈ বাহির হইয়া যাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যাইব। এই তো ঠিক সময়, এখন ভৈরবী নিজের কাজেই আছেন ঘরের মধ্যে—লক্ষ্য পড়িবার কোন সম্ভাবনাই নাই,—ভাবিয়া কম্বলখানি কাঁধে ফেলিয়া পাত্রটি হাতে লইয়া গুটি গুটি পথের দিকে পা চালাইয়া দিলাম। যাইবার পূর্ব্বে একবার চাহিয়া দেখিলাম, কুটিরের মধ্যে চূড়া-বাঁধা মাথা লণ্ঠনের আলো-ছায়ায় নড়াচড়া করিতেছে,—একটু নিশ্চিন্ত ভাবেই অগ্রসর হইলাম।

মনের মধ্যে এই পলায়নের ব্যাপারটা লইয়া একটা প্রবল আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রথমটা হাসির ব্যাপার, তার পরক্ষণেই আপনার কাছে এই দুর্বলতাটা এমনই বিশ্রী লাগিল—যেন এ কাপুরুষতার অপরাধ অমার্জনীয়,—একটা অনাগত বন্ধনে

ভয়ে একেবারে চোরের মতই পালানো। ছি ছি,—অথচ এই যোগাযোগের ফলটা কতই না শুভ হইতে পারিত, নিজ সংযমে অটুট থাকিলে !

এদিকে চোরের মত ভাবটা দেখিয়াই বোধ হয় একটা কুকুর ঐ সময় বার দুই গম্ভীর ভাবেই ডাকিয়া উঠিল, আর সেই শব্দে ভৈরবীও লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আমার দিকে আলোটা তুলিয়া ধরিলেন,—ঠিক যেন এই ব্যাপারের জন্যই তিনি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার ! আমি তো স্তম্ভিত হইয়াই দাঁড়াইয়া গেলাম।

এ কি, একেবারে চম্পট দেবার চেষ্টায় আছেন দেখি,—এঁ্যা, এত বড় লম্বা-চওড়া একটা মরদের এতটুকু সাহস নেই ?

মিথ্যা যুক্তির অভাব কোনকালেই হয় না—এতটা নামিয়াছি যখন আরও একটু নামিতে কোন সঙ্কোচই নাই,—বলিলাম,—ভাবলাম চাঁদনী রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ হাঁটা যাবে, আজ তো সারাদিন বসে বসেই কেটেচে।

এদিকে যে গামছা মোড়ার দল আছে সেটা মশাইয়ের জানা আছে কি ? তাছাড়া গ্রামের কুকুরের পাল্লায় পড়লে আর কি রক্ষা আছে ? বলিয়া লণ্ঠনটা বেদীর উপরে রাখিয়া সোজা আমার দিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হাত হইতে জলপাত্রটি লইয়া আবার বলিলেন—এমন ভাবে কি যেতে আছে, আমার অতিথি যে,—সে হবে না এখন। কাল সকালে না হয় যাবার ব্যবস্থা হবে,—তারপর আমার হাত ধরিয়া,—ভয় কি ? আমি খেয়ে ফেলবো না,—বলিয়া টানিয়া তরুমূলে উপস্থিত করিলেন। আপনি তো নেহাৎ ছেলে-মানুষ দেখি, পালাচ্ছিলেন কোন ভয়ে !

উত্তর দেওয়া সহজ না হইলেও বলিলাম, এখানে থাকা কি সুবিধে হবে আমার পক্ষে ? তিনি নিঃসঙ্কোচ, মুখে তাঁর কোন কথাই আটকায় না। বলিলেন, পরনারী বলেই কি এতটা উপেক্ষা করতে হয় ? আমরা তো ভৈরবী, আগে কোন ভৈরবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে নি বুঝি ?

বলিলাম, তা বিশেষ পরিচয় হয় নি—তাছাড়া পূর্ব্বে যে দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তাঁরা প্রবীণা,—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই বাধা দিয়া বলিলেন, আর আমি বুঝি নবীনা,—তা হোক, এবার যখন যোগাযোগ ঘটেছে তখন একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েই যাক না কেন ? আমায় কথা কহিবার অবকাশ না দিয়াই আবার আপনভাবেই অবিরাম বলিয়া চলিলেন,—দেখুন, এটাকে বিধাতার যোগাযোগ বলেই ধরে নিন না, না হয় দেখেই যান না যে একটা ভৈরবী কি ভাবের হতে পারে !—নিশ্চয় বলছি, বিশ্বাস করুন, এতে আপনার লাভ ছাড়া কোন লোকসানই হবে না। এখন শুয়ে পড়ুন তো,—আমায় একটু সময় দিন, আমি খুচরো কাজগুলো সেরে নি, কেমন ? তারপর পরিচয় হবে,—বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হবে আপনার সঙ্গে।

লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পুনরায় কুটিরে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতরে কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও বলিতেছেন,—বুঝে দেখুন না,—এমন জীবনযৌবন, এমন চাঁদনী রাত,—প্রাণের মানুষ পেলে কি ছাড়া যায়?—জীবনের সুখটাকে সবই ছেড়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? তারপর আবার বলিতেছেন, ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না,—আমার বয়স কতো জানেন,—বয়সের কথা শুনলে আর মধুযামিনীর কথা মনেই আসবে না। হবে হবে, ক্রমে ক্রমে সব পরিচয়—এখান থেকে যখন যাবেন পাকা লোক হয়ে যাবেন, এখন একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন দেখি,—ইত্যাদি, চলিতে লাগিল, আমি তাঁহার সম্বন্ধে কি যে সিদ্ধান্ত করিব কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া একটা অদ্ভুত অবস্থাব মধ্যে কালক্ষয় করিতে লাগিলাম। বেশিক্ষণ নয়—যেন একটু দ্রুত ঘরের কাজ সারিয়া বেশ ব্যস্তভাবেই তিনি সম্মুখে আসিয়া আলো হাতে, আমি এখনই আসচি, আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেলেন গ্রামের দিকে।

সেও বেশিক্ষণ গেল না, সঙ্গে একটি বালক, অনেক কিছুই আসিয়া হাজিব হইল। আজ সারাদিনের পর আমার অদৃষ্টে উত্তম ফলাহার জুটিল। খাঁটি দুগ্ধ,—চিঁড়া, কলা ও কিছু মিষ্টান্ন উপযোগ, অতিথি সৎকার যাহা হইল তাহাব কথায় কাজ নাই, আমার তৃপ্তির ব্যবস্থা যথেষ্ট হইল কিন্তু তাঁহার নিজের কি হইল জিজ্ঞাসা করিতে উত্তর আসিল, দেখুন, নিজের দিকটায় সবাই সজাগ, স্বার্থপরতা আমাদের জন্মগত সংস্কার, সুতরাং ও দুর্ভাবনাটাব ভার আর নিজের উপব রাখবেন না—সেটা আমার উপরেই থাক, কারণ তাতে ব্যাপারটা সহজই হবে। এখন,—সারারাত আছে, দুজনে আনন্দেই কাটানো যাক, কেমন?

আবার ঐ কথা,—উদ্দেশ্যটা কি, কিছুই স্পষ্ট নয়—এক-একবার মনে হয় ইনি প্রবীণা, কিন্তু এমনই শরীর এবং মুখের গঠন—কণ্ঠস্বর এমনই মধুর এবং ক্ষীণ যেন মনে হয় ত্রিশ-বত্রিশের বেশী বয়স মোটেই হইবে না,—ইনি যে শক্তিশালিনী সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না,—আমার তুলনায় ইনি অনেক মনঃশক্তিসম্পন্ন।

এখন তিনি আসিয়া আমার নিকটেই, বসিলেন,—বলিলেন,—যত্নের জিনিস পেয়েছি, মা জগদম্বাই মিলিয়েছেন—না হলে আপনি এত দেশ থাকতে বঁদেলের এই শ্মশানে আমার অধিকারে এলেন কেন? এখানে কারা আসে জানেন?—আমি বলিলাম, কেমন করেই বা জানবো বলুন?—তিনি বলিলেন, এখানকার পক্ষে আপনি নূতন মানুষ সেইজন্যই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। যদিও আপনার সৎবুদ্ধি আছে,—তারই জোরে সব কিছু বিপদেই রক্ষা পেয়ে আসচেন, কিন্তু আজ যে যোগাযোগ এটা সম্পূর্ণই দৈব ব্যাপার।

আমি বলিলাম, সেটা এখনও আমি বুঝতে পারি নি—আপনি যতক্ষণ আপনার স্বরূপটা আমার কাছে না খুলছেন ততক্ষণ আপনাকে বুঝে ওঠা আমার সাধ্যের অতীত।

আচ্ছা শুনুন, আমার কথা একটু,—কাল গিয়েছিলাম এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ

হবে চৌধরীপাট বলে এক গ্রামে। সেখানে এক বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলের বড় অসুখ। সেটা ঠিক রোগ নয়—কেউ তার উপর মারণ-ক্রিয়া করেছে, অবস্থা তার খারাপ, প্রায়ই সেরে এনেছিল—এখন তার বাঁচবার আশা হয়েছে মনে হয়। মায়ের কৃপায় বোধ হয় এ যাত্রায় বাঁচবে।

এখন আমার কথা ফুটিল, একটু অবিশ্বাসের ভাবেই বলিলাম,—একজন মানুষ ইচ্ছা করলেই আর একজনের প্রাণ নিতে পারে? বিষ দিয়ে মারা, ছোরা মারা, খুন করা এসব বুঝতে পারি, কিন্তু মন্ত্রশক্তিতে মারা এটা সহজে কি করে বিশ্বাস করবো। শুনিয়া তিনি বলিলেন, কেন তন্ত্রেমন্ত্রে অভিচারিক ক্রিয়ার কথা কি শোনেন নি? উত্তরে বলিলাম, শুনবো না কেন,—কিন্তু এখনকার দিনে ওসব বিশ্বাস করা সহজ কি? ভৈরবী বলিলেন, বুঝলাম আপনারা এখনকার ইংরাজী পড়া ছেলে—ওসব বিশ্বাস করবার কথা নয়—যাক ওসব কথা, এখন বলুন দিকি, আপনি কোন সম্প্রদায়ের শিষ্য?

সুতরাং উত্তরে আমার সম্প্রদায়বিহীন অস্তিত্বের কথা খুলিয়া বলিলাম, নিজ মনোমত একটি পথ ধরেই চলেছি। আমার কথা এই পর্য্যন্ত। তবে তন্ত্র সম্বন্ধে আমার অনেক কিছুই জানবার প্রবল একটা ইচ্ছা, আজ কয়েক বৎসর থেকে আমার ঐ সম্প্রদায়ের সাধু খুঁজে তাঁদের কাছ থেকে শুনতে ও জানতে প্রবৃত্ত করেছে।

দীক্ষা হয়েছে তো, জপধ্যান এসব আছে জানেন তো? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।—আমি বলিলাম, তা তো আছেই, ওটা তো সকল সাধনারই গোড়ার কথা।

আচ্ছা, জপে বসলে মন স্থির হয় তো? আগডম বাগডম যতো সব অসংলগ্ন বাইরের চিন্তা এসে জ্বালাতন করে না?

করে বৈকি, ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়?

তা হলে ইষ্টে মনস্থির করেন কেমন করে?

প্রথম খানিকটা ঐ রকম হয় বটে, শেষে জপের সঙ্গে মনের উপর জোর দিয়ে বাগিয়ে নিতে হয়।

আচ্ছা প্রথমে একটা মূর্ত্তিতে মন স্থির করে নিলে হয় না?—বুঝিলাম ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর জীব। এযাত্রায় যদি একটু অনুগ্রহ করেন তবেই সার্থক হয় এখানে আসা। বলিলাম, আমি কাল্পনিক কোন মূর্ত্তি মানি না যে।

তবে কি অরূপ রাজ্যের জীব নাকি,—ব্রহ্মজ্ঞ হবেন?

তাই তো হতে চাই, কিন্তু সে কি সহজ? রূপের রাজ্য পেরিয়ে তবেই তো অরূপ?

দেখুন রূপ-রাজ্যে জন্মে, রূপ নিয়ে যত রকমের কারবার আছে তা করে রূপের প্রভাব এড়াতে পারবেন? একেবারে অতো বড়ো একটা লাফ দিতে পারবেন? যাক, ওসব বড় বড় কথা থাক্, এখন আসুন সম্ভবমত কথা কওয়া যাক। আচ্ছা বলুন তো এবার শব্দ ও

স্পর্শে মন রাখা যায় না ?

মন্ত্রটাই তো শব্দ, স্পর্শে মন রাখা কি রকম ?

ভৈরবী একেবারে নিকটে আসিয়া আমার কাঁধে তাঁহার দক্ষিণ হাতটি রাখিয়া বলিলেন,—এই রকম, মনে করুন ছুঁয়ে আছেন আমায়। স্পর্শ অনুভব করছেন না ?

সর্ব্বনাশ, প্রথম ধাক্কায় আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ, তারপর অপূর্ব্ব স্থৈর্য্যে স্নায়ুমণ্ডল শীতল হইয়া গেল। আমার বাদ-প্রতিবাদের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যে স্পর্শ, এর অনুভূতি একটা আছে কিনা ?—আমি বলিলাম, তা তো আছে, কিন্তু তাতে হবে কি ? তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হবে এই যে ইষ্টকে ছুঁয়ে আছি এই ভাবটি প্রথম আসবে, তারপর ঘনীভূত হয়ে ইষ্ট নিকট হবেন।

আপনি তো আর আমার ইষ্ট নয় !

আমি কেন ? আপনার যে শক্তি তাঁকে নিয়েই কাজ শুরু করবেন, তাঁতে ইষ্টসিদ্ধি সহজ হবে।

স্ত্রীর সঙ্গে একটা কামজ সম্বন্ধ আছে কিনা, যদি কোনরকম উত্তেজনা—

বাধা দিয়ে ভৈরবী বলিলেন,—সেই জন্যই তান্ত্রিকদের স্ত্রী নিয়েই সাধন, ঐ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থেকেই ইন্দ্রিয়াতীতের সন্ধান পাওয়া যায়, আস্বাদ পাওয়া যায়, তখন আর স্থূল ভোগের প্রবৃত্তিই থাকে না—ওসব তুচ্ছ, হেয় বোধ হয়। একটু থামিয়া যেন কি ভাবিলেন, তারপর আবার বলিলেন, নানা প্রকার ক্রিয়া আছে, জানেন আপনি ?

আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়,—ও সকল গুহ্য, কেউ তো কাকেও বলে না, আপনি যদি এতটাই অনুগ্রহ করলেন, যদি আরও একটু করেন,—

বলবো—শুধু বলা নয়, দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্চি—ঠিক ধরে নিতে পারলে কাজ সহজ হবে। তবে নিঃসঙ্কোচ না হলে কিছুই হবে না, জানা আছে তো, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, এ সকল বড়ো বড়ো এক-একটা পাশ, ঐ পাশ থেকে মুক্ত হতে হবে।

তাই তো,—বলিয়া আমি গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলাম। তাই দেখিয়া তিনি বলিলেন,—তাই তো নয়, যদি ঠিক ঠিক কাজগুলি করতে পারেন তবে দুজনেই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হবেন—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই।

আমাকে এতটা গভীর ভাবে চিন্তিত দেখিয়াই বোধ করি মনের ভাবটা বুঝিয়া ভৈরবী বলিলেন,—তোমার মধ্যে একটা বেশ বড়গোছের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিলাম দেখছি,—ভয় হচ্চে বুঝি ? শুনিয়া আমি একটু সহানুভূতির আশায় বলিলাম, কখনও করিনি যেটা ধরতে ভয় হয়, পাছে কিছু গোলমাল করে ফেলি। আমার সাধনপথ সহজ রাজযোগেরই পথ, তন্ত্রের সাধন সম্বন্ধে শুধু জানতেই চেয়েছিলাম—শেষ অবধি তান্ত্রিক সাধনা কোথায় নিয়ে যায় একজনকে, আর রাজযোগের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কতটা, আরও ঐ সাধনার ফল কি ? আমার

ও-পথে যাবার উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না।

তা নাই বা রইলো, তোমার পথের সঙ্গে বড় বেশী তফাৎ হবে না,—আসল কাজটা বরং সহজ হয়েই আসবে। আমি আর আপনি বলবো না তোমাকে, বয়সে বড় তো আমি নিশ্চয়ই, তোমার সঙ্গে অতটা বাহ্য পার্থক্য রাখাও হবে না, আরও কাছাকাছি আসতে হবে, না হলে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। দুজনে আরও কাছাকাছি না এলে দেওয়া-নেওয়াব সুবিধা হবে না। একজনের যা কিছু অনুভূতি, আর একজনেব মধ্যে সহজেই স্ফুট তুলবে তবেই হবে। একই ধারায় চলবে প্রবাহ দুটি।

বেশ বুঝিতেই পারিতেছি ইনি নিজশক্তিতে আমায় বড ঘনিষ্ঠ ভাবেই টানিতেছেন আব আমার ক্ষীণবিশ্বাসী মন কোনপ্রকার প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইতেছে। তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া আমার মনে একটি উৎসাহপূর্ণ ভাব সাগ্রহে তাঁহার নির্দ্দেশ পালনের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, যাহার ভাবটি এই যে ইনি সৎ এবং আমার প্রতি স্নেহপরায়ণা হইয়াই যাহা কিছু করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। নিজ স্বার্থ নাই, স্বার্থ-মূলক কোন উদ্দেশ্যই নাই আমার সম্বন্ধে। এই গেল এক ভাব। পরক্ষণেই যে ভাবটা উঠিল সেটা এর বিপবীত, অর্থাৎ এঁর নিশ্চয়ই একটা মতলব আছে যেটা আমার সংসর্গে, আমাব কর্ম্মসাহায্যে উদ্ধার করিয়া লইতে চান। যখন এই ভাবটির প্রভাব ক্রিয়া করিতে লাগিল, তখন একটা অনাগত অশান্তির আশঙ্কায় বুকটি গুরু গুরু করিয়া উঠিল। যাহাই হউক না কেন, যখন জলে পডিয়াছি তখন দেখিতেই হইবে তলায় কি আছে।

এখন যেন আমার সম্মতির লক্ষণ অনুভব করিয়া তিনি ধীরে ধীরে আমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া আসিলেন, তাঁর মুখখানি ঠিক আমার চক্ষের সম্মুখেই আনিয়া বলিলেন,—দেখ দেখি আমার মুখের দিকে চেয়ে, কি মনে হয় তোমার ?

আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শবোধ যেন স্তম্ভিত হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। মুখে কোন বাক্যই সরিল না। ঠিক সংজ্ঞাহীন হইবার পূর্ব্বাবস্থা।

হয়তো অবস্থাটা বুঝিয়াই তিনি আমার কাঁধের উপর হাতখানা রাখিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন,—ওকি, অমন হলে কেন ? এতটা শক্তিহীন তো তুমি নও,—দ্বন্দ্ব বাধিয়ে বসেছ বুঝি ? না না, তা চলবে না, স্থির-দৃঢ় হও নিজ উদ্দেশ্যে,—নাও এখন দেখো, বেশ করে দেখো ;—বলো তো—নায়িকাভাব না মাতৃভাব,—কোনটা ঠিক তোমার আসল ভাব ?

তাঁহার ঐ ঝাঁকুনিতেই আমার জডতা, দ্বন্দ্বমূলক অবসাদ মুহূর্ত্তেই আত্মশক্তিতে পরিণত হইল। বলবান মনে হইল নিজেকে,—তখন মনের সাহস এমনিই ভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল যেন এইটাই ঠিক আমার প্রকৃতি। বেশ বুঝিলাম একটা শক্তিমান ব্যক্তিত্বের উত্তেজনা আসিয়া আমায় মোহমুক্ত করিয়া দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমার মুখ হইতে

বাহির হইল,—নায়িকা। শুনিবামাত্রই তিনি যেন মৃদু হাসিয়াই বলিলেন,—কোথা ছিল তোমার এত শক্তি কিছুক্ষণ আগে? নায়িকা! এত বড়ো কথা? কিন্তু তোমার প্রকৃতি তো তা বলে না, আমার সন্দেহ হচ্চে। শেষ পর্য্যন্ত সামলাতে পারবে তো?

আমার মধ্যে তখনও কোন সংকোচই নাই, সুতরাং বলিলাম, তা জানি না, আমার কিন্তু কোন সন্দেহ এখনও নেই, যা মনে এসেছে ঠিক তাহাই বলেছি,—বিশ্বাস করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রথম থেকেই কি এই ভাবটিই ছিল তোমার মধ্যে?

২

যুক্ত-সাধন কথা

আমি বলিলাম, না, কিছুক্ষণ আগেও আমার মধ্যে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল, কিছুতেই স্থিব হতে পারছিলাম না,—ঐ দ্বন্দ্বটায় আমায় বড়ই দুর্ব্বল করে ফেলেছিল, তারপর আপনার স্পর্শের প্রভাবে আমার এই পরিবর্ত্তন। এখন আমাব নিশ্চিত মনোভাব যা আপনাকে বললাম।

তিনি বলিলেন, এখন তোমার নিশ্চিত মনোভাব মনে হচ্চে বটে, কারণ একটি অনিশ্চিত দ্বন্দ্বময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছ—পরে পরিবর্ত্তন হতে পারে। এখন এটা তোমার নিশ্চিত ভাব নয়। দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়!

যাই হোক, একটু চিন্তার পর তিনি বলিলেন,—এখন থাকুক এসব কথা, একটু বিশ্রাম নাও, দু'তিন ঘণ্টা তুমি ঘুমাও দিকি। দ্বিপ্রহরের পর কাজ আরম্ভ করা যাবে। আমিও একটু যোগাড-যন্ত্র করে নি। ভরা পেটে এসব কাজ হয় না,—এখন তোমার কিছুক্ষণ পূর্ণ বিশ্রাম দরকার, বুঝলে? ঠিক সময়েই আমি তোমায় ডেকে তুলবো।

সেই বেদীর মত স্থানটির পাশে একখানি মাদুর, তার উপর কম্বল ও চাদর পাতিয়া আমার শয্যা রচনা হইল। তিনি শোও বলিয়া চলিয়া গেলেন—আমিও শয়ন করিলাম এবং গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। যদিও কিছুক্ষণ আগেও আমার ঘুমাইবার মত শরীরের অবস্থা ছিল না।

স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রা হইতে যখন উঠিলাম, অবশ্যই তাঁহার ডাকেই উঠিয়াছিলাম, এমন সুন্দর স্বচ্ছন্দ শরীর, প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ। তিনি বলিলেন, ঐ কম্বলখানা চারপাট করে আসন করে নাও,—বোসো।

বসা ঠিকমত হইলে তিনি বলিলেন, বেশ হয়েছে—এখন বল তো তোমার তো বেদান্ত মত, কেমন না? ঠিক ঠিক বলবে—যেন বাক্য-চাতুরী করো না, এখানে অকপট ভাব

আমি বলিলাম, কেমন করে জানলেন, আমার বেদান্ত মত? শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, তোমার ছট্‌ফটানিটা দেখে। আমি যতই তোমার কাছে যাচ্ছি,—ভেবে দেখো না, ততই একটা অস্বস্তি অনুভব করছিলে, মনে ভাবছিলে যেন আমার নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তোমায় বশ করবার চেষ্টায় এইভাবে টানাটানি করচি। তারপর এখন ঠাণ্ডা হয়ে কি রকম মনে হয়?

আমি ভাল মতেই বুঝিলাম—ইনি সেই প্রথম হইতেই অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আজ আমার প্রথম দেখাশুনার সময় পরিচয়ের সূত্র হইতেই আমার অবস্থাটা আগাগোড়াই দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন; মনে হইল ইনি অন্তর্যামী। মুখে আর আমার কথাটি নাই, মনে মনেই ঐ সব ভাবিতেছিলাম। তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আচ্ছা এই যে আগে বললে, স্ত্রীর সঙ্গে একটা কামের সম্বন্ধ আছে কিনা তাই, এটা কি রকম খুলে একটু বলো তো, কেমন বুঝেছো?

আমি যে কেমন বুঝেছি তা আগেও বলেছি, আপনিও ঠিকই বুঝেছেন। এসব কথায় সঙ্কোচ হয় না কি, আর আপনার তা যখন কিছুতেই মনঃপূত নয়, কাজেই আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ক্ষমা? এ কি প্রেমাস্পদের কথার খেলাপ, তাই ক্ষমা? ওসব কিছুই চলবে না, ক্ষমা হবে সেইখানে যেখানে অপরাধ। এখানে যখন তার কোন সন্ধানই নেই, পরিষ্কার জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ব্যাপার তখন ওসব বৃথা কৃত্রিম ভদ্রতার ভান কেন, সোজা উত্তর চাই আমার কথার। আরে ভদ্র! আমায় বুঝতে দাও তুমি কি ধাতু—তবে তো আমাদের এই যোগাযোগ সার্থক হবে?

তারপর আমায় চিন্তিত দেখিয়াই বলিতেছেন, দেখুন, না না, দেখো, বন্ধু! কোথায় ছিলে তুমি, আর কোথায় ছিলেম আমি—এই যে যোগাযোগটা, কি মনে করচ এটাকে! মহামায়ার খেলা জানো না? তোমরা লেখাপড়া-জানা সায়েব গুরুর শিষ্য বুঝি? তা হোক, শুনেছি তোমাদের গুরুরাও নাকি মানে এসব, ভারতের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিষয় সত্য বলেই তারা মানে। তুমি এই সুন্দর যোগাযোগটিকে সঙ্কোচবশতঃ সামান্য একটু খোলাখুলি কথার জন্য নষ্ট হতে দেবে? মুক্তভাবে কথাবার্ত্তা চালাবার যোগ্যতা নেই তোমার? আরও একটু খোঁচা দিয়ে তোমার পৌরুষে আঘাত করবো,—বলো তোমারই সম্মতি প্রার্থনা করচি।

আমি বলিলাম,—আমার পৌরুষ আপনার আঘাতের যোগ্য নয়, আমি তো প্রস্তুত,—যা বলবেন আমি কখনও পিছিয়ে আসবো না।

ঠিক তো?

ঠিক।

বেশ, বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

তারপর স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ লইয়া যে সকল কথা তুলিলেন, সেগুলি অবশ্য আমার স্ত্রীর রীতি, স্বভাবপ্রকৃতি, নীতিজ্ঞান, আচরণ সম্বন্ধেই কথা। তারপর আমি তাহাকে কিরূপ বুঝিয়াছি তাহাই বলিতে হইল।

তারপর সাধারণ নারীপ্রকৃতি আমি কিভাবে দেখিয়া থাকি এবং পুরুষ সম্পর্কে তাহাদের কিভাবে ধারণা করিয়াছি, তাহাই আলোচনার বিষয় ছিল, অর্থাৎ নারী একজনের জীবনে যথার্থ শক্তি হইয়া কাজ করিতে পারে বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করি কি না। শেষে আমার নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে যেভাবে প্রশ্ন বাহির হইতে লাগিল, তাহার ধরনটা আদালতে আসামী অথবা সাক্ষীকে আইনজ্ঞ একজন বিচক্ষণ যেমন জেরা করেন ঠিক সেই ক্রস একজামিনেশনের সমপর্য্যায় বলিলেও চলে। তারপর আবার বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি যে বললে, স্ত্রীর সঙ্গে একটা কামজ সম্বন্ধ আছে, তাই তুমি স্ত্রী নিয়ে সাধনের পক্ষপাতী নও,—এটা একটু পরিষ্কার করে বলো তো দেখি।

আবার সেই কথা! সঙ্কটে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছিলাম, দেখিলাম নিষ্কৃতি নাই। তখন কেমন করিয়া জানিব তাঁর প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সসঙ্কোচে যাহাই বলিতেছি তাহাই আমার বিরুদ্ধে যাইতেছে, শেষে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া এখন আমার নিজের মুখের উত্তরগুলি বিফলতায় পর্য্যবসিত হইবে। তবে যতটা সম্ভব উত্তরগুলি সন্তোষজনক ভাবে দিবার চেষ্টাই করিলাম। বলিলাম,—

আমাদের যৌবন-ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়সুখের যে প্রেরণা ঐ স্ত্রীকে অবলম্বন করেই চরিতার্থ হয় আর সেইটা আমাদের সংস্কারগত হয়ে আছে। কাজেই স্ত্রীর প্রভাবটা পাছে আমার সাধনের হন্তা হয়ে দাঁড়ায় এই অবস্থায়, একই সঙ্গে সাধন করতে গেলে, সেই ভয়েই আমি দুজনে যুক্তভাবে সাধনে সম্মত নয়, এইটুকুই আপনাকে বলতে চাইছিলাম। আমার বিশ্বাস আপনি তা ঠিকই বুঝেছেন। ভাবিলাম এবার নিশ্চয়ই আমায় এই সকল প্রশ্ন হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। কিন্তু তিনি তবুও বলিলেন,—

স্ত্রী-প্রভাবটা বললেই তো সব বলা হলো না, খুঁটিয়ে বিচার করতে, শরীর ইন্দ্রিয় মনের ক্রিয়াগুলি সবই বলতে হবে, যা কিছু অনুভূতি ঐ সৃষ্টি-সঙ্গমে অবগাহনের ফলে লাভ হয়, পর পর বিচার-বিশ্লেষণের দরকার আছে যে!

এমন অদ্ভুত নারীর সঙ্গেও আমার যোগাযোগ হইয়াছিল, হে ভগবান,—ইনি চান কি? ঠিক যেন ইট, কাঠ, পাথর বা লোহা প্রভৃতি কোন জড়বস্তুর কথা হইতেছে এইভাবেই নিঃসঙ্কোচে বিচার-বিশ্লেষণ চালাইতে চান। কিন্তু আমার কেন সঙ্কোচ কিছুতেই কাটিতে চাহে না। আবার তখন অন্তরে প্রতিবাদের সাড়া জাগিল, বলিলাম, দেখুন, এখানে নিজ অভিজ্ঞতা যা তাই বলচি। প্রথমে আসনে বসিয়া, একাগ্রে সরল

প্রাণায়ামের পর যথাকালে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে জপের কাজ চলতে থাকে, শেষে ধ্যানের অবস্থা যখন আসে আপনি বুঝতেই পারচেন কি আনন্দ লাভ হয়,—আর ঐটিই আমার নিজের পথ,—কি উপকার হবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সাধনায়,—যা আমার পক্ষে বিষম। আমার জপের মন্ত্র, ইষ্টের ধ্যানে এক হয়ে যখন সহজেই জীবনকে পূর্ণ করে আমার দৈনিক সাধনায়, তখন ঐ ফ্যাসাদ আমি ডেকে নিয়ে আসি কেন ?—আমার আপত্তির কথা আপনি বুঝেছেন, তবুও কেন স্ত্রী নিয়ে সাধনের জন্য টানাটানি করছেন বুঝি না।

জানি গো জানি, তুমি নিজে কোন রকমের হাবাতে কাঠের মত বেশ খানিক ভেসে যেতে পারবে, কিন্তু ঐ মেয়েটির সঙ্গে তা হলে তোমার সেবাদাসীর সম্পর্কই অটুট থাকুক কেমন,—তার পক্ষে কোন অধ্যাত্ম জ্ঞান ধর্ম্ম বা শক্তি লাভের কোন দরকারই নেই,—তোমার আয়েস আর সুখ-স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থাতেই তার জীবনতরী ডুবে সার্থক হোক, কেমন ?

কি সর্ব্বনাশ ! তার অধ্যাত্ম জীবনের গতির জন্য আমি দায়ী নাকি ?

যদি তার যোগ্যতা সত্যই থাকে অধ্যাত্ম জীবনমার্গে তা সত্ত্বেও তোমার জীবনের দৈনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় তার জীবনের সবটাই পাত করতে হয়, ফলে অধ্যাত্ম জীবনে বঞ্চিত হতে হয়, তাহলে কোথায় এসে পড়ে দায়িত্বটা, হে বীরেন্দ্র স্বামী আমায় সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। আমি ঐ সেবাদাসীর অধিকার নিয়েই জিজ্ঞাসা করছি, যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করুন অধিনীকে।

ইহার পর শুধু স্তব্ধ নয়, স্তম্ভিত হইয়াই থাকিতে হইল কিছুক্ষণ ; উত্তর যথাযোগ্য দিবার যোগ্যতার অভাবে। ইহা বুঝিয়াই তিনি বলিলেন, দেখো, আত্মা স্বাধীন, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত এটা তো জানো, তা আমি তোমায় তাই ভেবেই নিবেদন করতে চাই,—তোমার যথা ইচ্ছা সাধন তুমি কোরো, একা নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ হয়ে নিজ পথে তুমি যেও, কেউ কোন প্রশ্নই করবে না। কেবল এখন মফস্বলে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, ভেবে দেখো। সেটা এই যে,—ঐকান্তিক প্রীতিতে আবদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ একই ইষ্টের পানে সাধনা দ্বারা চালিত হতে পারলে, ফলে অপূর্ব্ব শক্তিশালী হওয়া যায়,—সিদ্ধিলাভ সহজ হয়, এমন কি জীবন-মুক্ত হওয়া যায়,—তান্ত্রিক সাধনার মূল কথাই ঐটি ;—তুমি করো বা না করো এই আশ্চর্য্য পরম গুহ্য সাধনার ক্রম, বা পদ্ধতিটা জেনে আর বুঝে রাখতে দোষ কি ? তুমি ঐ সব জানতেই তো ঘুরে বেড়াচ্চো ?

আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, শিবের দান এই মহান সম্পদ, আজ এই জাতটা বহুকাল হারিয়েছে, আসনহীন আশ্রয়হীন হয়ে, হাঘোরের মতই হা ধর্ম্ম হা ধর্ম্ম করে বেড়াচ্ছে। যাক সে কথা, এখন যদি তোমার অনুমতি হয়ে থাকে তাহলে যা জিজ্ঞাসা করি সোজা উত্তর দাও!

আমার অন্তরের সত্য, গোপন উদ্দেশ্যটি এমন ভাবে আমার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়ার পর আর আমার সাধ্য কি তাহার প্রতিবাদ করি ! ইতিমধ্যে ঠিকই জানিয়া লইয়াছেন যে, আমি তন্ত্রধর্মের সাধন সম্বন্ধেই গভীর ভাবে জানিতে চাই, সুতরাং আমার মহা-সুযোগ উপস্থিত একথা স্মরণ করিয়াই আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল ;—আমি প্রস্তুত হইলাম, পদ্ধতি আমায় জানিতেই হইবে। আমায় প্রস্তুত দেখিয়াই এবার তিনি আরম্ভ করিলেন ;—যথা—কত দিন হাঁড়ি কেড়েচ ?

বলিলাম, দশ-বারো বছর হবে । শুনিয় আবার কহিলেন,—সাধারণতঃ দুরকম স্ত্রী দেখা যায়, জানো তো ? এক রকম—তাবা বলে বিয়ে ক'রেছ, ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সুখে ভেসে যাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য, ধন ঐশ্বর্য্য গয়নাগাঁটি হবে গা-ভরা, পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ানো কত সুখে আছি তোরা দেখ্—, এসব সাধ পূর্ণ না হলে স্বামীকে হেয় জ্ঞান, তার অক্ষমতায় অসন্তোষের রোষে সংসার অশান্তিময় করে তোলা ইত্যাদি,—এটা হোল এক নম্বর স্ত্রী। তারপর আর এক রকম আছে, সুখই হোক, দুঃখই হোক তার অবলম্বনটা ঠিক হয়েছে এই জ্ঞান এবং বিশ্বাস তার অন্তরে অন্তরে নিশ্চিত হয়ে যায়, অর্থাৎ যাকে ধরে তার জীবন আরম্ভ হলো তার সঙ্গে তার অন্তরের যোগটা গভীর, আশ্রয়টা তার পাকা এই বিশ্বাসই থাকে প্রবল, তারপর সংসারের যা অভাব অনটন অথবা সাচ্ছল্য এসব তার বাইরের কথা, এইটা হোলো দু নম্বর.—এখন আমায় এই খবরটুকু দাও, তোমার যিনি, তিনি এক নম্বর, না দু নম্বরের স্ত্রী, তাহলে আমার ধরবার সুবিধা হবে। আমি বলিলাম, দু নম্বরই ঠিক,—আমার স্ত্রী ঐ ভাবেরই।

—তারপরে আরও একটু আছে—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে এটা বুঝে নিতে হবে যে, তার অধ্যাত্ম জীবনে বিশ্বাস আছে কিনা অর্থাৎ তার মধ্যে কোন ভাবের ভাগবতী সংস্কার আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে যুক্ত সাধনায় অভীষ্ট ফললাভ নিশ্চিত। যদি তার ঈশ্বরবিশ্বাস অথবা কোন প্রকার অধ্যাত্ম প্রেরণা না থাকে, তা হলে যুক্ত-সাধন নিষ্ফল, স্বামীর কোন দায়িত্ব নেই এদিকে। এমনও হয়, স্ত্রী, যিনি লোকটি ভালো কিন্তু সাধন ভজনে আস্থা নেই। তাদের কাছে স্বামীর অধিকারে, লেকচারে কোন কাজই হবে না। তবে স্বামীর ঐকান্তিক নিষ্ঠাই অনেক সময় সংক্রামিত হয়ে যায় তার মধ্যে, স্বামীর ব্যবহারে অধ্যাত্ম শক্তি, ভালবাসার ভিতর দিয়ে স্ত্রীর অন্তর-চৈতন্যে প্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু ফাঁকা লেকচারে উপকার হবে না। যাই হোক, যদি স্ত্রী দু নম্বরের আবার তার উপর দেখা গেল সে অধ্যাত্মজীবনে বিশ্বাসী, এটা হোলো সোনার উপর সোহাগার রং—মহাভাগ্যবান তারা, যুক্ত-সাধনার অধিকারী ;—এ সত্য মনে মনে থাক তোমার। এখন আরও একটা আছে, তাই বলচি।

এটা জানো তো, সবার মধ্যে কিছু না কিছু গুহ্য আছে যা কাকেও বলবার নয়। সে

গুহ্য সাধারণভাবে স্ত্রীরও আছে পুরুষেরও আছে। তবে স্বামী-স্ত্রীতে এমনই ঘনিষ্ঠতা যদি থাকে যেন দুজনের মধ্যে সত্যই গুহ্য নেই যেহেতু, দুজনেই দুজনের কাছে উলঙ্গ হতে পারে এবং হয়েও থাকে। এটা স্থূল শরীর বা দেহ নিয়ে কথা তাই, একই উদ্দেশ্যে দুজনেই তা পাবে কিন্তু অন্তঃকরণ উলঙ্গ করে দুজনের মধ্যে সম্পূর্ণই মুক্ত করে দেখানো যায় না, তা হবার নয় এ সংসারে। সংসারের বাহিরে গেছেন যাঁরা, তাঁদের কথা এখানে তো নয়। এখন এই গুহ্য কেউ যেন কখনও কারো হাঁটকে বার করবার চেষ্টা না করে। সাধনরাজ্যে কারো কোন গুহ্য হাঁটকে বার কবা অপবাধ, সে অপরাধের দণ্ড আছে। তবে কখনও কখনও এমন হয় যে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য প্রকৃতিই হয়তো অপ্রত্যাশিত ভাবেই কোন গুহ্য প্রকাশ করে দিলেন তাঁর নিজ সহজ কৌশলে। সেকথা আলাদা,—তাঁব উদ্দেশ্য তিনি জানেন ভালো।

আমি এখানে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোন গুহ্য থাকাটা উভয়ত মানসিক জটিলতা বৃদ্ধির কারণ হয় না কি? শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, তুমি পাগল নাকি? গুহ্য মানেই অন্যায়, পাপ বা অশান্তিকর একটা কিছু হতে যাবে কেন? ওসব সন্দিগ্ধ মনের কথা,—আর সন্দিগ্ধ মন যার, অধ্যাত্ম-মার্গ, স্বর্গের পথ অথবা ভাগবতী বাজ্যের দ্বার তাব পক্ষে চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ থাকে এটা যেন তোমার জানা থাকে। কত কত সৎভাব, অধ্যাত্ম অনুভূতিও গুহ্য রাখতে হয়, কত কত প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিষয় অকালে অক্ষেত্রে প্রকাশেব ফলে লোকসমাজের অনিষ্ট ঘটতে পারে সেইজন্য অনেক কিছুই গুহ্য থাকাই জগদম্বার বিধান। উচ্চস্তরের যাঁরা, তাঁরা এই গুহ্য রহস্য তত্ত্বটি সম্যকভাবেই জানেন এবং ব্যবহার করতেও পারেন, তাই মা জগদম্বা তাঁর রহস্য তাঁদের কাছেই খোলেন। আচ্ছা, এখন থাক্ এসব কথা, শুধু এইটুকু আরও বলি, মানুষের সম্বন্ধে মানুষ কতটুকুই বা জানে। এটা সহজেই বুঝতে পারবে একজনের দিক থেকে আর একজনের জীবনের দিকে চাইলে তার জীবনের কতটুকুই বা দৃষ্ট, কতটাই বা অদৃষ্ট? অ-দৃষ্ট অংশই বেশীর ভাগ নয় কি?

৩

যুক্ত-সাধনার আরো কথা

আমি বলিলাম, আর বলতে হবে না, বুঝেছি। তিনি বলিলেন, কিচ্ছু বোঝনি, আরও অনেক শুনতে হবে। এখন নেকা-বোকা সেজে থাকলেও আরও শুনতে হবে, তুমি যা জানো, তাতেও উপকার আছে, পাকা হবে তোমার জ্ঞান। যাক্ সেকথা, এখন তা হলে এটা স্থির এবং তোমার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কথাটা যে,—সাধনজীবনে, বিশ্বাসী স্ত্রীর সঙ্গে

যুক্তভাবে সাধন চলে, আর তার ফল উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর, কেমন ? আমি তোমার নিজের সাধনাব কথাই বলছি। অনেক সংসারে তান্ত্রিক-গুরু স্বামী-স্ত্রীকে যুক্তভাবে তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তাঁরা সেই গুরু-উপদিষ্ট তান্ত্রিক মতেই সাধন করেন,—তাব সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধই নেই, তুমি তোমার নিজ নির্ব্বাচিত পথেই যাবে। এখন স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তভাবে সাধন, যে সাধনেব প্রভাবে সিদ্ধিলাভ কবা যায়, মহাশক্তি ও মুক্তিব অধিকাবী হওয়া যায়, তার পদ্ধতি বা ক্রম তুমি জানতে চাও। করো বা না করো, জানা থাক তোমাব এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পন্থা, এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমায় বলচি,—উপযুক্ত পাত্র ভেবে। কেমন ? বেশ কথা, এখন কযেকটা প্রশ্নেব সবল উত্তব দাও তো— ? আচ্ছা—যখন স্ত্রীব সঙ্গ কামনা কবো তখন অস্তিত্বেব কোনটা তোমায় তাঁর পানে টানে বা আকর্ষণ কবে ?

আবাব ত্রাহি মধুসূদন। আমাব সঙ্কোচ দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, যদি বলো রূপ তা'হলে আমি প্রশ্ন করবো, তিনি কি রূপসী ? আমি বলিলাম, রূপসী মোটেই নয, বরং নিতান্তই সাধাবণ, তবুও ঐ রূপই প্রধান আকর্ষণ-সূত্র মনে হয।

উৎসাহিতভাবে তিনি বলিলেন, বেশ বেশ, পথে এসেছো দেখি।

আমি চুপচাপ বসিয়া,—এবাব কোন সূত্র ধবিবেন, কোন দিকে যাইবেন, কতক্ষণে আসল কথায় আসিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। তিনিও যেন একটু সময় লইলেন।— তারপর—এখন তিনি এই বলিয়াই আরম্ভ কবিলেন,—

—বলো তো বন্ধু রূপটা কি বস্তু, কোন কাজে লাগে তোমার ? আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম, আমার ব্যক্তিগত ? হাঁ হাঁ তোমাব, ঐ তোমার হলেই সবাব পাওয়া যাবে।

যদিও তর্ক উঠিল মনে, আমি আব সেদিকে না গিয়া সহজ পথই ধরিলাম। বলিলাম, ঐ রূপই তো সকল আকর্ষণেব মূল, সকল বাঁধনেরই তো মূলে রূপের প্রভাব। এবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, রূপের আসন কোথা ?

আমার চক্ষু স্থির হইল তাঁহাব মুখেব উপব, তবুও ভাবিয়া বলিলাম, যদি ইন্দ্রিয় অর্থে বলেন তাহলে চক্ষু।

—ওটা তো দ্বার, ঢোকবার দরজা, রূপের অনুভূতি কোথা, রূপকে রূপ বলে পাও কোনখানে ? আমি ভাবিতেছিলাম মস্তিষ্ক বলিব কিনা। তিনি হাতটি বাড়াইয়া তাঁহার তর্জ্জনীর ডগা দিয়া আমাব দুই ভ্রূর সংযোগস্থলে, নাকের সেতুর ঠিক উপরে কপালটা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, এইখানে। আমি উহা জানিতাম, এখন যদি অজানা কিছু হয়তো— তাঁহার কাছে শিখিতে পারিব বলিয়া সারিতে গিয়াছিলাম। শুধু রূপ নয়, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সম্পর্কিত সকল কিছুরই অনুভূতির কেন্দ্র-বিন্দু, যাহার অপর নাম প্রজ্ঞাচক্র ; —স্থানটি মাথার ভিতর, যাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে সেই স্থান। এনাটমির অর্থাৎ শরীর-স্থান

হিসাবে নির্দ্দেশ অসম্ভব, সেই জন্য যোগশাস্ত্রের মতে বিন্দু বলাই ঠিক মনে হয় ,—নিতান্তই সূক্ষ্ম বলিয়া।

এখন, ঐ রূপের অনুভব এবং সেই সূত্রে ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত উপভোগের ক্রম পর পর যেভাবে ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল বিশ্লেষণের বিষয়। আমি অপ্রাসঙ্গিক ভাবিয়া বলিলাম, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সাধনার কথায় এসব কেন? উত্তরে বলিলেন, শেষের কথাটা আগে কেন? সাধনার সঙ্গে এর যোগাযোগ না থাকলে আমি এ সব বলতে যাবো কেন, আমার কি কাজ ছিল না? আমাদেরও সময়ের দাম আছে কর্ত্তা, বিশেষতঃ এই পূর্ণিমা তিথির মধ্যরাত্রে। এখন বলো কিভাবে ঘটে ব্যাপারটা। তারপর আমার সঙ্কোচ দেখিয়া তিনিই আবার আরম্ভ করিলেন,—

—এখন ভেবে নাও তোমার অন্তরে শক্তি জেগে উঠেছে , অথচ তোমার মত একজন রূপবিলাসীর জানাই আছে যে, ইন্দ্রিয়ের এই উত্তেজনা জাগিয়াছে যে রূপ, যাকে ধরে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের মধ্যে নৃত্য আরম্ভ হোলো, পরক্ষণেই সেই উত্তেজিত শক্তির তৃপ্তি বা শান্তির সঙ্গে আর সে রূপের মুখ্য সম্বন্ধই নাই। সেটা তখন বাহ্য। তারপর তোমারই স্বভাবগত ভিতরের পুরুষ অভিমান, সৃষ্টির বীজ তোমার অধিকারে, সেই সময় স্রষ্টার আসনে সৃষ্টির আনন্দে তোমার বাহ্য জগৎ যাবে লুপ্ত হয়ে,—মনোমত ক্ষেত্র প্রস্তুত, বীজ রোপনের উন্মাদনায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রবল হয়ে যেন একটি হয়ে যায়,—স্পর্শের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। কৃষক বীজ রোপনের আগে ক্ষেত্রকে মনোমত তরল, আদ্র, বীজ বপনের উপযুক্ত করে নেয়, আকাশের কিম্বা সেঁচা জলে মাটির কঠিনতা একেবারেই লোপ করে, একহাঁটু কাদায় ভরে দেয় ক্ষেত্রটা, তবেই সে সুখে বপন করতে পারে নিশ্চিত সফলতার পূর্ণ বিশ্বাসে ,—ঠিক সেই ধারায় তোমারো ক্ষেত্রকে মনোমত করে খানিক ক্ষেত্রস্থ মাটির কাঠিন্য ভেঙে নিতে হয়, শরীর থেকে শুরু করে কর্ম্ম ও জ্ঞান ইন্দ্রিয়, তারপর মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর অহম্ পর্য্যন্ত আগাপাশতালা একেবারে কোমল আর জলবৎ তরল একমুখী হয়ে যায় ,—উভয়ত , এটা ঘটে যতক্ষণ না প্রকৃত সন্ধিক্ষণ আসে।

প্রায় পাঁচ মিনিট চুপচাপ, নিস্তব্ধ যাকে বলে তাই। তারপর তিনি বলিতেছেন, এই যে রস উপভোগ এর ক্রিয়াবস্থাটার কথাটা বিশেষ ভাবা দরকার, সেইটি একটু ভাবো তো?

আমি একান্তই অকূলে পড়িয়া বলিলাম, বলুন।

—আমি তো সবই বলে দিলাম, তুমি কিছুই বলবে না, এড়িয়ে যাবে? তাই বলি, াদের মত নাকারা পুরুষ নিয়ে ঘর ব্যবহার করতে গেলে এই রকমই হয়। এখন ও আসল কথাটা সেরে নাও তো খোকা। বলিলাম, সেটা তো আপনার কাছেই—

—দেখো, এক্ষেত্রে একটা কতো মহৎ বস্তু, গুহ্য তত্ত্ব আমি তোমায় দিতে যাচ্ছি, তুমি এমনই একজন—

আমি আর বলিতে দিলাম না, তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিলাম, আর বোলবেন না, একটা সঙ্কোচ কিছুতেই কাটাতে পারছিলাম না,—এখন আপনি এক কথায় সেট কাটিয়ে দিলেন,—এখন আমি নিঃসঙ্কোচেই সব বলতে পারবো—বলুন আপনি কি চাই ?—

এইবার তিনি বলিলেন, তুমি আমায় নায়িকা ভাবে দেখেছো বলে ছিলে না ? দেখো ওটা তোমার পক্ষে কতো মিথ্যা সেটা এখন সম্পূর্ণ ই প্রমাণ হয়ে গেল আগাগোড়া এত কথার ভিতর দিয়ে এসে। আমরা অনেক দেখছি, বুঝতে পারি 'ওর সাহায্যে একটা শক্তি পেয়ে তোমার বুদ্ধিতে গলদ ছিল তখন, আসলে তোমার মাতৃভাবটাই সংস্কারগত, সেটা এতক্ষণ ধরেই প্রমাণিত হোলো তোমার প্রত্যেক কথায়। আমার সঙ্গে তোমার নায়িকা ভাব থাকলে তুমি কখনও এতটা সঙ্কোচ পোষণ করতে পারতে না। তোমার পৌরুষ সতেজে অগ্রসর হ'তে পারতো নিঃসঙ্কোচে, বুঝলে ? তুমি এতক্ষণ পরীক্ষাই দিয়েছ—যার শেষ ফল হলো তোমার বাইরের ঢাকাটি খুললেই দেখা যাবে তুমি অসহায় শিশু, মাতৃ-সাহায্যের জন্যই কাতর। ভক্তি ও প্রেম-রাজ্যের জীব,—জ্ঞান ও শক্তি তোমার বাইরের পোষাকী খোলস। এখন শেষ কথাটা শুনে নাও। এই যে মিলন বা সঙ্গমের আনন্দ, তার সঙ্গে আত্মতত্ত্ব অনুভূতি,—যদি স্থূল দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে, আসনে বসে, জপ ধ্যান ও সমাধির মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়,—যা তান্ত্রিক সাধনার মুখ্য ফল, তাকে তুমি কি লাভ বলো না ?

তাঁহারই প্রভাবে আমার মধ্যে কতকটা পৌরুষ জাগিয়াছিল, আমি বলিলাম, ঐ সব আমার পক্ষে একক সাধনায়ও সম্ভব তো হতে পারে ?

শুনিয়া তিনি প্রসন্ন মনেই বলিলেন, তা তো ঠিকই পারে,—অবশ্যই পারে, কিন্তু অনেক বাধা বিপত্তি দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, সব ধাক্কা একাই সইতে হবে আর দীর্ঘকাল লাগবে। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আর এক জনের কতোটা একতা, কতোটা গভীর পবিত্র সম্পর্ক ধরে যে সকল অপূর্ব্ব তত্ত্ব তোমাদের উভয়ের মধ্যে ফুটবে তার কি হিসাব হয় ? যিনি প্রথমে এইটি আবিষ্কার করেছিলেন আর জগতের গৃহস্থ-সাধারণের কল্যাণের জন্য তা ধরে রেখে গেছেন, তাঁর কাছে জগৎ কতটা ঋণী ভেবে দেখো তো।

আমি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই বলিলাম, এখন উপায়টা যদি দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দেন তা হলে জন্ম সার্থক হয়ে যাবে আমার। শুনিয়া তিনি বলিলেন, চুন আর হলুদ দুটো মিললে লাল রং হয়, আমি তোমায় চুন আর হলুদ চিনিয়ে দেবো, তারপর ঐ দুটি পদার্থ সংগ্রহ করে তোমার রং তুমি করে নেবে। এমন কি আমি আরও কোথায়, কোন্ দিন ঐ দুটি পাওয়া যাবে তাও বলে দিতে পারবো,—বাকী কাজ তোমার। কেমন রাজী ?

আমার মুখে বাক্য সরিল না।

এখন তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার পরেই তিনি অনেকক্ষণ নিজ ভাবেই সমাহিত,

তাঁর ডান হাতটি বুকের উপর যেমন করিয়া জপের সময় আঙ্গুলগুলি ধরা থাকে সেই ভাবে রাখিয়া ঠিক যেন জপ করিতেছেন এমন ভাবেই কাটাইলেন। আর আমি,—কত বিষয় যে ইতিমধ্যে ভাবিয়া ঠিক করিতে চেষ্টা করিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। এই যে রহস্যময়ী ভৈরবী, যাহার পাল্লায় পড়িয়া প্রথম হইতে নাকানি চুবানি খাইতেছি, ইনি যে আমায় কোন অতলে লইয়া যাইতে চান সস্ত্রীক সাধনের নামে তাহার নির্দ্দেশ নাই। প্রথম হইতেই যে একটা ভয় ও সন্দেহ যুগপৎ আমার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে এখনও তাহার প্রভাব এড়াইতে পারি নাই,—এই অনাগত ভয়টা একটা গুরুতর কথাবার্ত্তার পরেও দেখিতেছি নিঃশেষে যাইতে চাহে না। আরও একটা অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে আমার মধ্যে,—ক্রমান্বয়ে তাঁহার উপর একবার বিশ্বাস আবার পরক্ষণেই অবিশ্বাস, যাহা কখনই পূর্ব্বে কোন সাধুসঙ্গের বেলা অনুভব করি নাই, ইহাতেই আমাকে যেন খানিকটা নীচে নামাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক এখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এখন তা হলে শোনো,—

আমার চমক ভাঙিল,—অবহিত চিত্তে বসিয়াই রহিলাম, মুখে বলিলাম, বলুন।

আমাদের এখন ঐ কথাটা স্পষ্ট করে নিতে হবে. মনে আছে তো, তোমাদের দুজনের মিলন, আসন্ন সঙ্গমে অবগাহনের বেলা তোমার মনের ভাবটা কি হয়েছিল, খুলে বলতেই হবে তোমাকে। তুমি আগেই নিঃসঙ্কোচে বলবে বোলে স্বীকার কোরেছ, এখন বলো।

এ প্রসঙ্গ ইনি কিছুতেই ছাড়িবেন না,—যাহা হউক আমি যথাসম্ভব নিঃসঙ্কোচেই বলিলাম, তখনি প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যাবার সময়, অন্য বিশেষ কি ভাব তখন মনে আসতে পারে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়,—ঠিক করতে পারচি না। শুনিবামাত্রই তিনি চঞ্চল হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে তিরস্কারের ভাবেই বলিলেন, আঃ, একটা সহজ কথা বুঝতে এতটা সময় নষ্ট করা চলে না। আসন্ন সময়ে যোদ্ধার মনে একটা প্রবল উদ্দীপনার ভাব থাকে না, আর সেই ভাবের প্রকাশ নেই ভাষায়, বোলতে চাও?

সব কটা ইন্দ্রিয়, তার সঙ্গে মনে তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা, এইটাই তো তখন অনুভূত হয়, তার পর ঝাঁপিয়ে পড়া—শুনিবামাত্রই তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, না, না, না, ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা নয় আর ঐ স্থূল ইন্দ্রিয় সম্ভোগের কথাও নয়,—তুমি কি সত্যই এতটা নির্ব্বোধ যে প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারোনি? নাকি ন্যাকা সেজে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরচো? ফের বলচি,—প্রশ্নটা হোলো এই যে,—মূলে কি ভাবটা নিয়ে ঐ সম্ভোগটা সুরু হয়, অর্থাৎ ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্তির গোড়ার কথা, এটা মীমাংসা না হলে আমার হাত থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই,—বলো?

—তা যদি বলেন তা হলে আমি বোলবো, আশু মিলনের আকাঙ্ক্ষায় দুজনেই দুজনার,—

পুনরায় বাধা দিয়া, একটু ব্যঙ্গ,—কতকটা ঝাঁঝালো রসিকতার ভাবেই বলিলেন, বাবুমশাই—একজনের কথাই কও, এখানে দুজনের কথা অবান্তর। তাছাড়া তুমি সবজান্তা তো নও। যে নিজের ভিতরের ভাব ধরতে পারে না, সে আবার কোন অধিকারে নারীর ভিতরের ভাব নিয়ে কথা বোলতে চায়। অনধিকার চর্চ্চা নয় কি? নিজের ভাবটা কি তাই বলো সোজা কথায়।

বলিব কি,—সোজা বাঁকা কোন কথাই আমার মুখ হইতে বাহির হইতে চাহিল না। এই যে পৌরুষের উপর আঘাত তাহাতেই আমার আক্কেল লোপ হইল। কিন্তু তবুও মনের মধ্যে উত্তরটা খুঁজিতেছিলাম। ক্রমে ভাবটা যেন ধরিতেও পারিলাম। ব্যাপারটা পেটে আসচে মুখে আসচে না-র মত। আমার অবস্থাটা এই প্রবীণা ঠিক বুঝিলেন, তখন বলিলেন, আরে বাগ্দেবীকে না পেলে গুহ্য ভাবকে ভাষায় আনা যায় কি? নাও শোনো আবার বলি,—

—সম্ভোগের বাসনা মূলে প্রবল থাকলেও, কর্ম্মের সংকল্প যখনই স্থির হোলো, তারপরে ইন্দ্রিয় নিয়ে যে খেলা তা আরম্ভ করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কালটুকু তার মধ্যে একটা তপ্ত ভাব মনের ভিতর ক্রিয়া করে তো? তারও একটা ভাষা আছে তো?

বড শক্ত। আমার মুখে কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ বাহির হয় নাই। তিনি বলিয় উঠিলেন, খুলে বলচি আবার শোনো, একরকম আছে,—সম্ভাষণের বেলায়, পুরুষকেই এগিয়ে যেতে হয় তো,—এক শয্যায় দুজনে একই উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার পর একটা অছিলায় দু'চারটি সময়োচিত প্রিয় মিষ্ট কথা আরম্ভ করা, ক্রমে ঐ কথার ফাঁকে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়া, তারপর মিলনের বেলায় আর কথা থাকে না। আর এক রকম আছে প্রথম থেকেই নির্ব্বাক, আদি মধ্য ও অন্ত কোন কালেই কোন কথাই থাকে না উভয়ের মধ্যে। সেটা হয় উভয়তঃ মিলনের জন্য একটা তীব্র উন্মাদনা থাকলে। বিশেষতঃ তোমার মধ্যে পুরুষ ভাবের নির্ব্বাক যে উন্মাদনা বর্ত্তমানে তাই নিয়েই কথা। মনে থাকে উন্মাদনা, নির্ব্বাক,—এই কথা দুটি বলেছি—ঐ সময়ে তোমার যে ভাব, তারই ভাষা চাই এখন আমার। কারণও বলচি,—এই নির্ব্বাক গভীর উন্মাদনাই মূলে পুরুষ প্রকৃতির মিলনের যে ভাব অন্তত ক্ষণেকের জন্যও তোমাদের এই নির্ব্বাক উন্মাদনার সমপর্য্যায়ে পড়ে। তাই কথাটা বার করবার জন্যই এত মাথা ফাটাফাটি, এখন বোঝো ঐ অবস্থায় তোমার ভাবটার স্বরূপ।

এই ভাবে দয়াময়ী এতটা খুলিয়া বলিলেন যে, বুঝি নাই, বলিবার উপায় রহিল না আর। এখন যাহাতে আমি সহজে বলিতে পারি তাহার উপায় করিয়া দিয়া উত্তরের জন্য আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—বুঝিলাম তিনি আশা করিতেছেন এবার আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারিব। কিন্তু আমার যে কি হইয়াছে এতটা বুঝিয়াও নিজ ভাবটি প্রকাশ

করিবার ভাষা পাইতেছি না। অবশ্য পরে তিনিও ইহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু বিরক্ত হইলেন না, এবং কথায়ও আর কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না,—এবার করিলেন চরম আঘাত এই বলিয়া,—

—তুমি যখন পুরুষ অভিমান নিয়ে এসেছো তখন তোমার নিজের কথায় ঐ ভাবটা প্রকাশ করতেই হবে,—তা যদি না পারো তা হলে সরে পড়ো, এখানে আর কিছুই পাবে না,—আমি বুঝবো অপাত্রেই এতটা বাক্-শক্তি নষ্ট করেছি। তুমি একটা নিতান্তই হীন আধাব।

সত্য,—এ আঘাত আমার উপযুক্তই,—প্রথম হইতে মনে করিয়াছিলাম, এইভাবে সহজেই সব কথা শুনিয়াই লইব,—এতটা পরীক্ষার মধ্যে পড়িব কল্পনাও করি নাই। যাহা হউক শেষে কিন্তু ব্যাপার যা ঘটিল তা অভাবনীয়, তাঁহার শেষ কথার অপ্রত্যাশিত চাপের প্রভাবে। ভাষা পাইলাম, তখন মুখও খুলিল বটে, তবে প্রকাশ করিবার বেলা, আমার নিজের মনে একটু সন্দেহই আমায়—উত্তরটি সম্বন্ধে ঠিক নিঃসঙ্কোচ হইতে দিল না। তবুও এখন আর কালক্ষেপ না কবিয়াই বলিলাম,—এবার ভাষা পেয়েছি, বলতেও প্রস্তুত, অনুগ্রহ করে একবার আপনার প্রশ্নটি আবৃত্তি করুন, আমি মিলিয়ে নেবো—। তিনি মৃদু হাসিয়াই উহা করিলেন,—আমিও বলিলাম,—ঐ সময়ে আমার এই ভাবটাই প্রবল হয়েছিল যেন আমি ওকে একেবারে এমনভাবেই আত্মসাৎ করে,—আমার মধ্যে নিঃশেষে মিশিয়ে নেবো যে তার কোন পৃথক অস্তিত্বই থাকবে না আর।

এবার তিনিও প্রসন্ন হইয়া হাত বাড়াইলেন, আর আমার দাড়িটি ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন,—এই সত্যটা বার করতে আমায় কতটা বোলতে হোলো, তোমায় কতটা আঘাত করতে হোলো বল তো? বেশ, এখন যখন পথে এসেছো তখন তোমার অজ্ঞাত একজন সতীর্থের কথাটাও শুনে নাও। আমার সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল, অবশ্য গভীর প্রণয়-ঘটিত মিলনের কথা বোলে বলচি, তাঁর মধ্যেও যে উন্মাদনা দেখেছিলাম তার ফলে ঐরকম কথাই বেরিয়েছিল, তিনি বোলেছিলেন,—আমার মনে হয় তোমায় খেয়ে ফেলি।

আসলে ঐ মিলন বিষয়টিই সর্ব্বগ্রাসী কিনা,—পুরুষপক্ষে এই ভাবেরই হয়, নারী-পক্ষের কথা পরে বলচি এই বিষয়টা তোমাদের শেষ করে নিয়ে। জেনে রাখো, আসলে গভীর প্রেমের যে উন্মাদনা তা একই পর্য্যায়ভুক্ত। ভাবটা একই বুঝেছো তো? আমি তখন বলিলাম, রামপ্রসাদের একটি গানে আছে, এবার কালী তোমায় খাবো, জানেন তো?

তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, ইষ্টের সঙ্গে মিলনে একত্বই তো কাম্য,—ভাবের মূলে যা, তা সকল ক্ষেত্রেই এক। এ বিষয়ে আর সংশয় কোথা? এখন এই মূল অথবা অন্তরের

ভাবটির সঙ্গে বাইরের প্রতিক্রিয়ার কথা—সেইটাই বলো।

—এখন তো ঐ স্থূল ইন্দ্রিয়-সুখের পর্য্যায়ে এসে পড়ে। শুনিয়া তিনি বলিলেন,—কিন্তু এই ব্যবহারটা পাশবিক বোলে মনে হয় না তোমার ?

—হয় না আবার! তবে আমি প্রথম থেকে এতটা সঙ্কুচিত হয়েছিলাম কেন এসব বলতে!

—সেটাও ভুল,—এর সবটাই পাশবিক নয়। মনুষ্যোচিত সম্ভোগও আছে। দেখতে বেশ সভ্য, ফরসা জামা কাপড় জুতা টুপী পরা সব মানুষই যেমন মানুষের গৌরবের অধিকারী নয়, পশু পর্য্যায়ে ধরা যায় এমন অনেক মানুষই তো সমাজের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তেমনি এই নরনারীর সম্ভোগের বিষয়েও দেখা যাবে মানুষ হলেও তাদের সম্ভোগ ঠিক পশুর মতই। এবার আসল কথায় এসো,—কান দিয়ে শোনো। আর হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করো। ঐ যে প্রবল উন্মাদনার প্রতিক্রিয়ায় দেহ নিয়ে সঙ্গম, এইটাই আসল মিলনের অন্তরায়। ঐ বাহ্য ইন্দ্রিয়সুখের প্রেরণাতেই আসল মিলনের হানি ঘটে। আর তার ফলে প্রায়ই হয়ে যায় জীবসৃষ্টি। কাজেই এই সৃষ্টিটাই হোলো আসল মিলনে বিফলতার সাক্ষী। এখন বলো তো কি বুঝলে ?

আমি বলিলাম, এ ব্যাপার অসাধারণ,—তা ছাড়া আমি এখানে এমন আরও একটি তত্ত্বের আভাস পাচ্চি যা পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করিনি। মনে করুন এই যে আত্মিক বা সত্তায় মিলনের কথা বললেন,—যার মূল উদ্দেশ্য অবাধ প্রেমের মিলন প্রথমেই যেটা ভাব রূপে আমার মধ্যে ভাবনা, প্রেরণা দিয়েচে, কায়িক মিলন বা সঙ্গমটা যার ব্যতিক্রম বলছেন, আমার মধ্যে তার কোন নির্দ্দেশ নেই যে! তা আমি এ সম্বন্ধে কি বলতে পারি, বলুন ?

—তা যখন তোমার বুদ্ধিতে এলো না তাহলে আমায় সবটাই খুলে বলতে হবে তোমার মধ্যে নিশ্চিত ধারণা এনে দিতে। অথচ এতটা সময়, এমন কি গোড়া থেকেই প্রাণপণে তুমি সেটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করে এসেচো। আচ্ছা, এখন বলো তো, তুমি যখন তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে কায়িক মিলনেই ঝাঁপিয়ে পড়লে, তখন কোন বিষয়টা বা কোন ভাবটা বলবৎ ক্রিয়া করলে তোমার মধ্যে ?

সর্ব্বনাশ! আমি এ মানুষের কাছে কোনটা এড়াইতে চাহিতেছি ? আমি নির্ব্বাক, তখন তিনি নিজেই বলিতেছেন,—ঐ সঙ্গমের কাজে দুই শরীরের ব্যবধান লোপ, এইটিই কি তখনকার ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য ছিল না ? ঐ যে বললে আত্মসাৎ করার কথা, এখানে এই ভাবটাই কি তার স্থূল প্রকাশ নয় ?

অস্বীকারের কোন প্রশ্নই নাই ঠিক, সত্য সত্যই এই ভাবটাই চরমপ্রাপ্তি। চণ্ডীদাসের, দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও, কথাটা সার্থক। আরও বুঝিলাম, এটা কথার কথা নয়,

এর মূলে জীবন্তভাবই সত্য একটি তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে বিশ্বাস করি। এবার আবার তিনি বলিলেন,

—আচ্ছা, আরও একটা বিষয়,—দুটি পৃথক স্থূলদেহ কখনও নিঃশেষে মিলে এক হয়ে যেতে পারে কি? এই অসম্ভাবনা সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান সত্ত্বেও এই ভাবে কায়িক মিলনের মধ্যে দিয়ে তবুও এক হবার উদ্দাম প্রবৃত্তি কি ভাবে হোলো, কোথা থেকে এলো? ভেবে দেখো তা হলে প্রত্যেক দেহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অথবা কারণ রূপে এমন-ই এক সত্তা বর্ত্তমান,—যা প্রত্যেকে দেহের পার্থক্য সত্ত্বেও এবং পৃথক দেহের গুণে তাকে পৃথক মনে হলেও অপর দেহস্থিত যে কোন সত্তার সঙ্গে নিঃশেষে মিলে এক হয়ে যাবার সম্ভাবনা রাখে। কেমন, এইটা কি প্রমাণ করে না যে এই স্থূল কায়িক মিলনসূত্রে সম্ভোগের উন্মাদনায় তারই প্রভাব বর্ত্তমান? নরনারীর মধ্যে ঐ যে সত্তা তা চেতন এবং সকল দেহের কারণ রূপে বর্ত্তমান। তাকে পুরুষ বলো, আত্মা বলো, জীবাত্মা বলো,—যা খুশি বলো না কেন, যার পক্ষে ইচ্ছা-মাত্র অপর এক দেহস্থ সত্তার সঙ্গে নিঃশেষে যুক্ত হবার প্রবণত আছে।



নিজের মত সত্তা সৃষ্টি বা উৎপন্নও করতে পারে। সেই উৎপন্ন সত্তারও ঠিক সেই সেই গুণ ও অন্তঃকরণাদি উপাদান অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার;—শুধু তা নয়, যতগুলি কোষ আছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ সুদ্ধ তার ইচ্ছায় আস্ত একটি জীব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তোমার কি মনে হয়, যা শুনলে তা অবান্তর?

—তা কেন হবে,—প্রসঙ্গত ঐ সত্তা বা আত্মার গুণাগুণও এক্ষেত্রে জানবার বিশেষ দরকারও ছিল তো?

—ও সব তো তোমার জানা ছিল, তুমি তো বৈদান্তিক ?

—তা হয়তো ছিল, কিন্তু তা ভাসা ভাসা জানা ছিল মাত্র। এখন আপনার মুখে এ ভাবে শুনবার পর জ্ঞানে পরিণত হোলো, শুধু তা নয়, অনুভূত সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখনও একটা বিষয়ে আমার কতক ধোঁকা আছে। মনে করুন, জগৎসুদ্ধ লোক ঐ ইন্দ্রিয় সুখের পিছনে কায় মন ও প্রাণপণে ছুটেছে মিলনের নামে কিন্তু সত্য আনন্দ, আভাসে কতকটা পেলেও পূর্ণভাবে কখনই পায় না। তা ছাড়া একেবারে ইন্দ্রিয় দেহমন নিয়ে রমণের স্ফূর্তিই চরম হয়ে আছে সাধারণ মানুষের কাছে। তার সঙ্গে কোথায় বিদেহ সত্ত্বা বা চেতন আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনের কোন অজ্ঞাত স্বাদহীন কল্পনাতীত যোগাযোগ,—যার সঙ্গে বিশেষ যোগী বা সাধক ব্যতীত আর কারও কোন সম্পর্ক নেই, এই দু'য়ের সামঞ্জস্য কোথায়, বা করা যায় কি করে ?

—আচ্ছা তোমার এই সামঞ্জস্যের কথা পরে হবে, শুধু তা নয়, তোমার নিজের সকল কথা নিয়েও সকল কিছু রহস্যভেদ করতে হবে—এখন যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম তা শেষ করে নি, কেমন ? এখন সত্তায় সত্তায় মিলে এক হয়ে যাবার কথা যা বলেছি তা ঐ ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও কিন্তু পুঞ্জীভূত পরমাণু নিয়ে, নানা ধাতুতে গঠিত জীবন্ত শক্তিমান এই যে প্রাকৃত দেহ যার মধ্যে জন্মাবধি মন, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের খেলাই নিরন্তর চলেছে, সেই স্থূল দেহরাজ্যে দুইটি দেহ এক হয়ে মিলে যাওয়া অসম্ভব অথচ মিলনের সংস্কারটি সহজ এবং প্রবলভাবেই আছে আমাদের সত্তার মধ্যে কারণ মূলেই সে মিলনধর্ম্মী, তাই মিলনের উপর তার আজীবন একটা সহজ প্রবণতা আছে—মানুষের বাল্য কৈশোর যৌবন বার্দ্ধক্য সকল বয়সেরই। এই যে মিলন তা দুই ভাবেই ক্রিয়াশীল হয়,—মিত্রভাবেও হয়, শত্রুভাবেও হতে পারে। এখন মিত্র বা প্রেমের মিলন নিয়েই কথা আমাদের।

৪

যোগি-স্বামীর সঙ্গ

সে রাত্রে আর কথা হইল না, পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আজ এই পর্য্যন্তই থাক আর বাকিটা কাল রাত্রেই হবে। কিন্তু আজ যে এটা শেষ হোলো না সে জন্য তোমাকেই দোষ দেওয়া যাবে। যদি এতটা সঙ্কোচ না করতে তাহলে সহজেই কাজ শেষ হোতো, এতটা সময় লাগবে কেন। উঠে দাঁড়িয়ে একটু আলস্য ত্যাগ করলেন, মুখে কথা নেই। খানিক এদিক ওদিক করে তিনি যেন একটু বেশ চঞ্চল হয়ে বেড়ালেন, দেখলাম, শেষে কি হোলো তাঁর ? সেই কথাই ভাবছিলাম। যখন আবার কথা বললেন

তখন বেশ সহজ ভাব আবার।

আমি তো তোমায় বলেচি,—আসলে জাগরণ-সুপ্ত অবস্থা যত কাল থাকবে ততকালটা কেবল ছটফটানি, কোন তত্ত্বের অন্তঃপ্রবেশ ঘটবে না, আর বাপ-মা ছেড়ে যখন বাইরে এসেছ তোমার বিপদ থেকে কে তোমায় রক্ষা করবে? আজই তুমি চলে যেতেও পারতে। যখন তা হোলো না তখন বুঝতে হবে এখানে তোমার অন্নজল মাপা আছে আর বিধাতা পুরুষের কিছু বিশেষ বিধানও আছে—দেখো না আসচে রাত্রে কি কাণ্ড হয়।

আমিও বলিলাম,—ভয় পাইয়ে দিচ্চেন, আর আমি ভয় পাচ্চি না, সব ভয় ও সঙ্কোচ কেটে গিয়েচে নিশ্চয়ই জানবেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ভয় আমি পাওয়াতে যাবো কেন, যিনি ভয় পাওয়াবেন তিনি আসছেন, আজই খানিক পরে আসচেন, দেখবে তখন রূপে গুণে মনোহর কাকে বলে। আরও দেখবে একজন সিদ্ধযোগী পুরুষ। সকৌতূহলেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তিনি?—উত্তরে তিনি বলিলেন, যিনি আমায় একেবারেই খেয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। কতকটা খেয়েও এনেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হোলো না, অর্দ্ধাশনের পর উগ্‌রে ফেললেন। যাই আমি স্নানে, গঙ্গা থেকে আসি, তুমি প্রাতঃকৃত্য করো, যা খুসী তাই করো।

সত্য সত্যই বেলা আন্দাজ যখন ন'টা একজন আসিলেন, ঘাড়ে একটা মোট, ভারি, সেটা বেদীর উপর নামাইয়া রাখিলেন। মূর্ত্তিখানি বিশাল, সাড়ে ছয়ফুট হইবে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুগোল মাথাটা ঘন কাঁচাপাকা চুলে ভরা, বেশ মোচার মত গোঁফ, দাড়ি কয়দিন কামানো হয় নাই। বুকের ছাতি বিশাল, দীর্ঘ বাহুদ্বয়, কুচকুচে কালো ঘন ভ্রূ, তার নীচে বেশ মানানসই অতি কোমল, করুণা মাখানো চক্ষু দুটি। শক্তিশালী পুরুষ, প্রৌঢবয়স্ক, রূপের আকর্ষণ নাই বটে কিন্তু মূর্ত্তিখানির আকর্ষণ আছে। তাঁহাকে অনেকটা মামার বাড়ির গ্রামের উমাচরণ মোড়লের মত দেখিতে। অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া, তাঁহার মোটের বাঁধন খুলিলেন, তারপর ভিতরের মাল বাহির করিয়া ঐ বেদীর উপরেই রাখিতে লাগিলেন। প্রথমেই বাহির হইল দুইটি বোতল। মনে করিয়াছিলাম কারণ বাহির হইবে কিন্তু ভৈরবী আসিবামাত্র আগেই সহর্ষে একটি বোতল ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া লইলেন, বলিলেন, কি ভাগ্যি এবারে ভোলোনি,—ছিপি খুলিয়া ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, তেলটা খাঁটি মনে হচ্চে। ইতিমধ্যে বাহির হইল আট-দশখানি মোটা মোটা ভাল বাঁধানো গ্রন্থ; ছোট ছোট বইও কয়েকখানি ছিল। এবারে আমায় দেখিয়া ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁকে চিনতে পারলাম না তো। উত্তরে তিনি বলিলেন, এর মধ্যেই চিনবে ওঁকে? তবেই হয়েছে,—আমি বলে সারারাত মাথা ফাটাফাটি করেও চিনতে পারলাম না। তবে তোমার স্বজাতি বোলে পারো তো চেষ্টা দেখো। আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, বপুখানি দেখচো? বলিলাম,—সত্যই বলেছিলেন—আদর্শ বটে। এবার আমার

দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না হলে আমার মত এত বড় দেহটা একেবারেই খেয়ে ফেলবার ক্ষুধা যে সে মানুষের আছে নাকি? পুরুষটি ভৈরবীকে বলিলেন, এখন এগুলো ভিতরে গুছিয়ে রাখো, বিকালে আবার আমাদের যেতে হবে, কাজ এখনও মেটেনি। যদি কাল কাজ মেটে তবে কাল না হলে পরশু।

—আবার পরশু? হাসিয়া ভৈরবী বলিলেন, আমায একা একা শ্মশানে রাত কাটাতে হবে? শুনিয়া স্বামী কহিলেন, একা কেন, এই তো একজনকে বেশ ধরেচো।

-উনি তো ঝড়ের পথিক, ঝড-ঝাপটার ভযে এসে পডেছিলেন। ওঁর থাকার কিছু ঠিক আছে নাকি? চৌধুরীপাটের ফেরত এসে কাল রাতে দেখি, বসে আছেন। ক্ষুধার্ত্ত, আহা, পেটের ক্ষুধার কথা নয়,—সে কথা বলিনি, অধ্যাত্ম-ক্ষুধা,—বলিযা চলিয়া গেলেন নিজ কর্ম্মে, আর দাঁড়াইলেন না। দেখিলাম, এই শ্মশানেও চমৎকার এক সংস্কার-বন্ধনহীন মুক্তপ্রাণ দম্পতি বাস করিতেছেন,—এ কথা আমাদের নগরবাসী সাধারণের অগোচর। চমৎকার, কিন্তু লাল রং-এর কাপড় নাই কারো।

কতক্ষণ পর নবাগত স্বামী আমায়,—তুমি কোথাকার? জিজ্ঞাসা করিলেন। কলিকাতার মানুষ শুনিয়াই বলিলেন, শহর বড জটিল, এক উপার্জ্জনের পক্ষেই ভালো, না হলে বাস করবার পক্ষে মহা অশান্তিকর জাযগা, নয কি? বলিলাম, না হলে আর বাইরে আসবো কেন? যতটা সময বাইরে থাকি ততক্ষণই ভালো, আমার মোটেই থাকতে ইচ্ছা হয় না শহরে, বিশেষ করে ঐ কলকাতায।

দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি ভৈরবী স্নান করিয়া লইতে বলিলেন।—চলো একত্রই যাই, সুতরাং একত্রই আমরা স্নানে গেলাম। ইতিমধ্যে দেখিলাম ইনি আমায় একেবারেই আপন করিয়া ফেলিযাছেন, অথচ বেশি কথাবার্ত্তা বা ব্যবহার কিছুই হয নাই। এমনটা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

জলে নামিয়া আর এক কাণ্ড। শিব, শিব, বলিতে বলিতে, জলে নামিয়াই ডুব দিলেন। প্রায় তিন মিনিট উঠিলেন না। তারপর বুড় বুড় করিয়া কয়েকটি বুদ্বুদ উঠিল, ভাবিলাম এইবারে উঠিবেন কারণ আমারও দুই হইতে তিন মিনিট ডুবিয়া থাকা অভ্যাস আছে। ইনিও হয়তো সেইরূপই করিবেন। কিন্তু ইনি যা করিলেন তাহা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। প্রায় পনেরো মিনিট কাল উঠিলেন না। তাহাতে বুঝিলাম ইনি প্রাণায়াম-সিদ্ধ যোগী, ইচ্ছা করিলে আরও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন। কুম্ভকের কাল দীর্ঘতর করা অত্যন্ত স্থিরচিত্ত নির্ম্মল শরীর ব্যতীত সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা হউক এবার উঠিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে, চিদানন্দ শিবস্তোত্র পাঠ গুনগুন স্বরে আরম্ভ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের ভারতবিখ্যাত স্তোত্র,—'মনো-বুদ্ধ্যহংকার চিত্তাদিনাহং' ইত্যাদি শুনিয়া আমার মনে হইল ইনি বৈদান্তিকও বটেন, না হইলে এমন শুদ্ধ উচ্চারণ,

মর্ম্মস্পর্শী সুর ও ছন্দে আবৃত্তি, সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

স্নানের পর গঙ্গা হইতে আসিয়া যখন বসিলাম, তিনি আমাকে একটু বিশেষভাবেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ নয় উহা সরল দৃষ্টি, তাহাতে আমার মনে হইল তিনি আমার অন্তরের পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন। আমি কিছু এমনই আশা করিতেছিলাম যে হয়তো এইবার কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া একই ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আজই আবার চলে যাবেন?

এবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, হাঁ, আমায় যেতেই হবে। আমি তো ঘুরেই বেড়াই, উনিই এখানে থাকেন শ্মশান জাগিয়ে। আবার দরকার হলে ওঁকে যেতে হয়। খানিকটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে গঙ্গার ধারেই, সেটা রেজেষ্ট্রি হয়ে গেলেই ঘর বেঁধে বাস করবো মনে করচি। কেন বল তো আমার যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করচো। আমি বলিলাম, আজ কয়েক বৎসর এইভাবেই আমি ঘুরচি সাধুসঙ্গের লোভে। আজ রাত কাটলে তিন রাত্র হবে আমার এখানে। কিন্তু আজ আপনাকে দেখে অবধি আপনার সঙ্গ আমার অন্তরের কামনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি জানি একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা—

তিনি। সবচেয়ে বড় সাধুসঙ্গ হোলো—বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বগ্রন্থগুলি যেমন পঞ্চদশী, নারদ পঞ্চরাত্র, উপনিষদ আর তার সঙ্গে তোমার নিজের যোগ,—এই সাধুসঙ্গটা যদি ধরে নিতে পারো তাহলে অন্য সাধুসঙ্গের ছটফটানিটা আর থাকবে না। বর্ত্তমানে তোমার অবস্থাটা একটু চঞ্চল কিনা তাই কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারচো না। তাই তো দেখছিলাম এখন তোমার মুখে!

তাঁর চক্ষে একটা করুণা, যেন আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার কল্যাণের জন্যই বলিতেছেন এই ভাবটাই প্রকট হইয়া উঠিল তাঁহার মধ্যে। তিনি বলিলেন, দেখ, তোমার জাগ্রত সত্তা তার মধ্যে যে বস্তু পেয়ে গিয়েছে, এখন দেশে দেশে ঘুরে নানা নদীর জল খেয়ে, নানা সমাজে নানা সঙ্গের মাঝে তাকে মিলিয়ে এক করে নিতে পারলে তবেই তোমার শান্তি। এখন সাধুসঙ্গের যে অদম্য তৃষ্ণা তোমায় নানা স্থানে নানা জলের পিছনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেটা তখনই শান্ত হবে। শক্তিশালী মন্ত্রের গুণেই এরকম হয়। এটা বুঝেছ কি? আমি স্বীকার করিলাম। তখন তিনি আমার গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাবা মুক্তিনাথের নামই করিলাম। তিনি বলিলেন, জানি, ওরা কালিকানন্দের শিষ্য, বিখ্যাত কৌলগুরু,—তাঁর তো শেষে মহাব্যাধি হয়েছিল না? আমিও ঐরূপ শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, গুরুর অভিশাপে হয়েছিল। আমরা একই ঘরের সন্তান কিনা তাই জানি। যাই হোক তোমার অদৃষ্ট ভালো তাই ঐ সিদ্ধ বীজ পেয়েছ, এখন কাজ করো যত পারো। যখন মন্ত্র পেলে তখন তুমি তো বিবাহিত? বলিলাম, হাঁ, কিন্তু মন্ত্র পাবার পর আর ঘরে থাকতে পারিনি। শুনিয়া তিনি বলিলেন,

তা তো হবেই। তিনি কি বলেছিলেন ?

আমি। তিনি তো বোলেছিলেন যে, ঘরেই থেকো, ঘরে থেকে করলে সবই পাবে। কিন্তু আমি থাকতে পারিনি কিছুতেই।

তিনি। তিনি তো তাই বোলবেন, না হলে তোমাব আত্মীয়স্বজন তাঁকে যে দোষ দেবেন শেষে, মনে মনে জানতেন যা হবে। তবে এটাও ঠিক, কয়েক বৎসর পর তোমায় গৃহবাসী হতে হবে। তোমার গাঁটছড়া বাঁধা আছে কিনা !

এখন তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে আমাব অনুসন্ধিৎসার কথা বলিলাম। তিনি বুঝিলেন আমি কি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। বলিলেন, তখনকাব দিনে প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তান্ত্রিকদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন, তাবপর ইদানীং পশ্চিমে দয়ানন্দ সরস্বতী আর বাঙ্গলায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব,—এই দুজনে উত্তব ভাবত থেকে তন্ত্রমতের জটিলতা ভেঙেচুরে ধর্ম্মেব পথ সহজ আব পরিষ্কাব করে দিয়ে গিয়েছেন। বেদান্ত ধর্ম্মকেই সবার উপর ধরে অন্যান্য অসার ধর্ম্মের পাচিল ভেঙে চূর্ণ করেছেন। কাজেই এখন ধর্ম্মের পথে আর কঠিন দুঃসাধ্য তপস্যার কোন প্রয়োজন নেই,—মনটি শুদ্ধ, নির্ম্মল, জটিলতা-বর্জ্জিত করতে পারলেই পথ সবার পক্ষেই সহজ হয়েই আছে। কিন্তু ঐ যে বক্ষণশীল এক দল, যারা পুরানো সাধনপদ্ধতিগুলি আঁকড়ে আছে তাদের নিয়েই যত কিছু বিপদ। তাদেব নিজেদের অগ্রগতির পথ বন্ধ তাই উদারপ্রাণ সরলবুদ্ধি সাধাবণের পিছনে বাধা সৃষ্টি করাই যেন তাদের কাজ দাঁড়িয়েছে।

তাঁহার কথায় আমি অনেকটাই ভরসা পাইয়া বলিলাম, পুরাতন সাধনপদ্ধতি তো সবগুলিই একেবাবে ছাড়বার নয়, তার মধ্যেও তো,—

তিনি বাধা দিয়াই বলিলেন, না না নিশ্চয়ই তা নয়—আসল কথা এই যে পুরাতন সাধনপদ্ধতির মধ্যে এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আছে যা সর্ব্বকালের জন্যই,—যেমন রাজযোগের অষ্টাঙ্গ,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি এই যে আবিষ্কার ধর্ম্মরাজ্যে এগুলি সবই শিবের দান,—সর্ব্বকালেব জন্যই। ঐসব যৌগিক নিয়মগুলি একজনের মধ্যে উপযুক্ত সময়ে প্রাকৃত নিয়মে স্বতঃই স্ফুরিত হয়, তার নিজ স্বভাবের মধ্যে দিয়ে, তার প্রবৃত্তিরূপে তাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে। অপরের দেখাদেখি বা অপরের উপদেশে অসময়ে বিশেষ কোন ধর্ম্মসাধনা বা অনুষ্ঠান করতে গেলে শেষে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘুরপাক খেতে হয়। বুঝেছো তো ?

বাকী তন্ত্রমতে যে সব সাধন, যথার্থ আধার বা পাত্রের অভাবেই একালে তার উপযোগিতা নেই। কারনটা তার এই যে, ইংরাজী সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ বুদ্ধি প্রবল হয়েছে, সর্ব্ব বিষয়েই এবং ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রেই বিচারহীন কোন কাজই চলবে না, যেহেতু নির্ব্বিচারে অন্ধ ভক্তি নিয়ে কিছু করা সমাজের

শিক্ষিত এক দল যাঁরা শিক্ষার গৌরবেই মেতে আছেন, তাঁরা ভাল চক্ষে দেখেন না। আর তারা এটাও বুঝেন না যে, বিশ্বসংসারে বিশাল এক শ্রেণীর মধ্যে এখনও ওর উপযোগিতা আছে। আর তা থাকবেও চিরকাল,—একেবারেই সব একই রকম, একই সমাজের মধ্যে, একই ধারায় চলবে, এ কখনও সম্ভব হবে না। তাঁরা জানেন না যে এই অন্ধ বিশ্বাসের ধারা ইংরাজ বা ইউরোপীয় সকল জাতির মধ্যেও প্রবল। এটা সমাজ সংস্কার ধর্ম্মী যাঁরা, এখনকার দিনে সমাজের আমূল সংস্কার চান তাঁরা বুঝবেন না,—তাদের মধ্যে এ গলদটা থাকবেই, ওটা না থাকলে তারা কাজ করতেই পারবেন না।

আমি বলিলাম, তাহলে তন্ত্রমতে সাধনার কোন উপযোগিতাই কি নেই এখনকার দিনে, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে? তিনি বলিলেন, এ যুগে আগেকার মত পাশমুক্তি সাধনা, ধরো শবের উপর আসন করে শ্মশানক্ষেত্রে ঘোর অমাবস্যার রাত্রে, অথবা শক্তিলাভের জন্য ভৈরবীচক্রে বসে, অসাম্প্রদায়িক চরিত্রহীনা নারী নিয়ে নির্বিচারে সাধনা অথবা ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি শক্তিসিদ্ধির সাধক কোথা? মজা দেখবার কৌতূহল নিয়ে হয়তো কেউ কেউ খানিকটা এ সবের মধ্যে নামতে পারবে তারপর কতটুকুই যাবে বা যেতে পারবে? সহজ বুদ্ধিতেই আমরা কি দেখতে পাই না যে এ সকল সাধনার উপর এখনকার সমাজের সাধারণ মানুষে প্রত্যয় হারিয়েছে অথবা বিশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এখন রাজযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাধ্য।

আমি বলিলাম, সত্যই, এখন কালের প্রভাবেই তন্ত্রের সাধন ক্ষীণ হয়েছে এটা তো সহজেই বুঝা যায়। তিনি আবার তখনই বলিলেন, তখনই গাদা গাদা সিদ্ধ হোতো নাকি তন্ত্রের সাধনায়, এখন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর বছর ছেলেরা পাস করে? তন্ত্রধর্ম্ম যখন প্রবল তখনকার দিনেও হাজারের মধ্যে একজন কি দুজন ঐ সকল ভয়াবহ শক্তিসাধনায় সিদ্ধির আস্বাদ পেতো, এবং পূর্ণভাবেই ফলভোগী হোতো। বাকী নশো অষ্টনব্বই পথের প্রথমাংশ, না হয় মাঝামাঝি, না হয় সাধনের তৃতীয় পাদে এসে উন্মাদ, না হয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত, না হয় কঠিন বিপাকে পড়ে নানা ভাবে সাধনভ্রষ্ট হয়ে যেতো। এ বিষয়ে আমার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আমি বলিলাম, ঠিক এই ভাবের কথাই আমি কয়েকটি শ্রদ্ধেয় গুরুস্থানীয় যারা এমনই মহাত্মার মুখে শুনেছি।

তিনি বলিলেন, দেখো, এদেশে এক এক যুগে অর্থাৎ দেশের সমাজের অবস্থা-বৈচিত্র্য ধর্ম্মসঙ্কটকালে এক এক ধর্ম্ম আসে, সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তিমান করে,—তারপর তার কাজ হয়ে গেলে এই রকমই ক্ষীণ হয়ে যায়। তবে তার মধ্যেও শাশ্বত, মৌলিক ভাবের এমন কিছু রেখে যায়, যে সত্য কোনকালেই ম্লান বা ক্ষীণ হয় না। বাহ্য আকার বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলি,—তার দেহটা চলে যায়, যেমন আমাদের অল্পমেয়াদি দেহটা মরে কিন্তু যাঁরা মহান, ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর তাঁদের প্রভাব, কর্ম্ম, উপলব্ধ জ্ঞান

প্রভৃতি দীর্ঘকাল থেকে যায়, তাঁদের প্রভাব কাজ করে সমাজের মধ্যে। এও ঠিক সেই রকম, ধর্ম্মের উৎপত্তি ও লয়ের কথা,—তাও দেখো এই মানুষকে ধরেই ঘটে এ সব। তন্ত্রের আবির্ভাব উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পূর্ণ পরিণতি এ সবই ঐ মহাপ্রাণ নশ্বর দেহযুক্ত মানুষের মধ্যে দিয়েই ক্রিয়া করেছে মানুষসমাজে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি স্থির হইলেন। আমায় যেন বুঝিবার অবকাশ দিলেন। কতক্ষণ পর আমি তন্ত্রসাধনের ফলাফল সম্বন্ধে এবং কেন এতটা পতনের আশঙ্কা তাহাই জানিতে চাহিলাম।

—প্রথম আরম্ভ হতে এই শক্তিসাধনায় এত শীঘ্রই আত্মশক্তি স্ফুরণে সচেতন করে দেয় যার ফলে, কাঁচা আধার হলে যা হয়,—খানিক যেতে যেতেই চঞ্চল স্বভাব, অধৈর্য্য—সাধককে পূর্ণমাত্রায় চঞ্চল করে তোলে, স্থির থাকতেই দেয় না। সে অবস্থা এমনই অদ্ভুত রকমের যে তার পরিচয় দিতে যাওয়া আর এক জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, সহজে সাধারণের বুদ্ধিগত করাই মুশকিল। শুধু এইটুকু বুঝে দেখ তুমি, যারা নিরীহ, আত্মাভিমানশূন্য সরলবুদ্ধি, শান্ত প্রকৃতির মানুষ তাদেরও বিপরীতভাবে ভাবিত করে তাদের নিজ সাধন-লব্ধ শক্তি। ওটা এমনই জিনিস,—একটা নেশা, মদের মত, অধিকাংশ সাধককেই পাগল করে তোলে। সুতরাং প্রকৃত আত্মাভিমানশূন্য ধীর স্থির ও সংযত স্বভাব না হলে শক্তি সাধনায় সিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নেই। শেষদিকে পতনের কারন এই হয়, যার যেথা দুর্ব্বলতা তার অধিগত শক্তিই সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে প্রসারিত করে দেয় সেই দুর্ব্বলতার ক্ষেত্র, ফলে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে, ঠিক যেন আচম্বিতে নামিয়ে আনে গভীর অতলে যেখান থেকে ওঠবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না তার। সহজে বলতে এই কথাটিই সার কথা যে, শক্তিসাধনায় অতিরিক্ত শক্তিলাভই সাধককে বিপন্ন করে যদি তার সঙ্গে সংযম ও জ্ঞানের সহযোগ তথা গুরু-শক্তির সহযোগ না থাকে। সেই জন্য সিদ্ধগুরু সঙ্গে না থাকলে কিছুতেই সিদ্ধির সম্ভাবনা নেই, আর হাজারে নয় শত নিরানব্বই জনের ভাগ্যেই ঘটে না তা। প্রথম কারণ গুরু-শিষ্যে সাধারণতঃ দেখাদেখি থাকে না প্রথম দীক্ষার পর থেকে, বড় জোর মাত্র পুরশ্চারণ কালবধি। কটা সাধকের গুরুর সঙ্গে থাকবার মন থাকে আর জীবনপণ করে সিদ্ধিলাভের মত মনই বা কটা লোকের থাকে? দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধগুরু কয়টিই বা হয়? প্রত্যেক তিনশত বৎসরে দেশের বিভিন্ন অংশে দুই থেকে বড় জোর চারটি সম্ভব। বেশীর ভাগ তান্ত্রিক গুরু যারা, মধ্যপথে পতিত হয়ে গুরুগিরি করচে। একালেও যেমন, সেকালেও গুরু পাওয়া সহজ ছিল না। সিদ্ধ গুরু পাওয়া এত সহজ নয়।

তারপর আবার কতক্ষণ চুপচাপ,—

—এ যুগে পরমহংসদেবের মত সর্ব্বতন্ত্রে সাধনের সিদ্ধি এবংনিরপেক্ষ জ্ঞান আর কারো দেখা যায় না। তিনি যেমন এই শক্তিসাধনার ভিতর-বারসব দিক দেখেছিলেন, তাঁর পূর্ব্বে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ এমন দেখেননি। সেই জন্য এ সম্বন্ধে তিনি পুনঃপুনঃ এ পথে যেতে

নিষেধই করে দিয়েছেন। সহজ সরল ভক্তি, তা যদি না থাকে তবে বিবেকবুদ্ধি নিয়ে জ্ঞানের সাহায্যে যার যেমন অধিকার সেই পথ নেওয়াই ভালো। তিনি সব জায়গায় সবার কাছে, পাত্র অপাত্র ভেবে খুলে সব কথা বলেন নি, কিন্তু বরাবর সকল রকম তন্ত্রমতে শক্তি বা বিভূতি লাভের পথে যেতে দৃঢ়ভাবেই নিষেধ করেছেন। আরও যারা ঐ শক্তি এবং বিভূতির পক্ষপাতী তাদেব মনে ঐ সাধনের অসারতা প্রতিপন্ন করতে, ঘৃণা উৎপাদনের জন্য অনেক ঘৃণ্য বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমন কি তাঁর নিজের যে সিদ্ধি ছিল তা তিনি কাকেও দেন নি, সহসা বাইরে প্রকাশও করেন নি,—ব্যবহার পর্য্যন্ত করেন নি বাইরে, পাছে কোন রকমে তার প্রভাব কাকেও উদ্বুদ্ধ করে।

এ যুগে রামকৃষ্ণের জীবন ও চরিত্র আলোচনার ফল অসাধারণ,—তিনি বলিলেন, একজন সত্যসন্ধ চিন্তাশীল লোকের সারাজীবনের খোরাক।

আমি বলিলাম, আমার জীবনে প্রথম ধর্ম্ম-উন্মাদনাই তাঁর কথামৃত থেকেই, এমন সহজ মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি—বালক অবস্থাতেই আমায় আকৃষ্ট করেছিল।

তিনি বলিলেন, যখনই মানুষ পথ হারায় তখনই পথ দেখাতে তাঁরা আসেন, আর পথভ্রান্তদের ডেকে ডেকে পথ দেখিয়ে দেন নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে। ধর্ম্ম বস্তু যে কি, তা তিনি ঐ সময়ে এসেই দেখিয়েছিলেন। তারপর, এই তন্ত্রমতে সাধনের উদ্দেশ্য যে কি, তিনিই শিক্ষিত সাধারণের সামনে ধরে দিয়েছিলেন। তখনও শিক্ষিত সাধারণের কাছে তন্ত্রধর্ম্ম হীনমার্গের সাধনা, হেয় এবং নিতান্তই মূঢ়-চিত্ত লোকের ধর্ম্ম বলেই ধারণা হয়ে গিয়েছিল। এত বড় একটি বিরাট ধর্ম্ম বা সাধনতত্ত্ব, যার মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর জীবের অবলম্বন হতে পারে এমনই উপযুক্ত পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, এসব কিছুই সাধারণের জানা ছিল না।

আমি বলিলাম, শুনেছি রাজা রামমোহন রায় তখনকার একজন দিকপাল,—সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ একজন বিরাট শক্তিশালী সামাজিক পুরুষ, তিনিও তো তান্ত্রিক, মহাশাক্ত ছিলেন—শেষে আবার কত বড় বৈদান্তিক হয়েছিলেন।

শুনিয়া তিনি বলিলেন,—ওঁরা বংশপরম্পরায় তান্ত্রিক। তিনি তন্ত্রধর্ম্মের সাধনার মধ্যে দিয়েই প্রথম পশ্বাচার থেকে শুরু করে, বীরাচার, শেষে দিব্যাচারী হয়ে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বে পৌছেছিলেন। তবে গৃহস্থাশ্রমে ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর পথ ছিল বলে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেন নি।—ত্যাগ ছিল না তাঁর, স্থূল-সূক্ষ্ম, সকল ভাবে গ্রহণেই ছিল তাঁর সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি। সেই জন্য মাত্র নিজ জ্ঞানটুকুই তাঁর সম্বল ;—বিস্তৃত সমাজব্যাপী তাঁর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, সম্প্রদায়গত মুক্তির সাধনায় সফল হতে পারে নি, যে কোন সিদ্ধ গুরুর কর্ম্ম, লোকপরম্পরায় যেমন আমরা দেখতে পাই। আমি বলিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হলে বোধ হয়,—বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, চমৎকার মিলে

যেত তুলনায়,—কোন গোলমালই হোতো না,—তবে রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের মিলন সম্ভব হয় নি, তা হবার নয়। কারণ শেষাবস্থায় রামমোহনের যে জ্ঞান, অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব, মাত্র সেইটির সঙ্গে তাঁর নিছক সম্বন্ধ। জ্ঞানমার্গের মানুষ তিনি, আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ, আত্মা বা ব্রহ্মতত্ত্বেরই উপাসক। আর তাঁর সিদ্ধাবস্থা না আসায় শক্তি বা পরমাপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় নি, এবং সেই জন্যই পরমহংসদেবকে চিনতে পারেন নি, যদিও তিনি ধরা দিতেই গিয়েছিলেন। রামমোহনের ভাব স্বতন্ত্র,—ইদানীং রামমোহনের মতো ধর্ম্ম ও কর্ম্মশক্তি একাধারে আর দেখা যায় নি। যৌবনে তাঁর শৈবভাব, পরে শক্তিধর্ম্মের সাধনের প্রভাবে সিদ্ধির চরম ফল অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বে তাঁর অধিকার হয়েছিল। সমাজের দিক থেকে তাই তাঁকে আমরা নির্ভীক, অটল, শক্তিশালী পুরুষ বলেই দেখতে পাই। এ পর্য্যন্ত কেউ তাঁকে নিজ উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট করতে পারে নি। তিনি বরাবরই একক, পুরাতন সমাজের সংস্কার নিয়ে দ্বন্দ্বে একেশ্বর রথীর মতই গতি তাঁর—বিপক্ষ দল কোনক্রমেই তাঁর জয়যাত্রাকে খর্ব্ব করতে পারে নি। এটা তাঁর মহাশক্তির সাধনালব্ধ শক্তি,—ভোগৈশ্বর্যের সঙ্গে তাঁর যে জ্ঞান, একাধারে এ বস্তু সর্ব্বকালেই দুর্লভ। তিনি বিষয় এবং ভোগ থেকে জ্ঞানকে পৃথক করেন নি। সংসারের সবটা নিয়েই তাঁর সাধনা ছিল—বর্জ্জনের নামগন্ধও ছিল না তাঁর জীবনে। গুরুশক্তি প্রবল, বরাবর সিদ্ধগুরু একজন অবধূত আবার হরিহরানন্দ কৌল সহায় ছিলেন তাঁর।

আমি ইহার পরেই মনে মনে স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভাবিতেছিলাম—বোধ হয় এই কথাই তখন আমার মনে আন্দোলিত হইতেছিল যে, স্বামীজীকে আর শক্তিসাধনা, তান্ত্রিক মতে কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় নাই। এই ভাবটি আমার মধ্যে ঠিক বুঝিয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি তারপরই বলিলেন,--তারপর বিবেকানন্দ এলেন। আমি বলিলাম, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। তিনি বলিলেন, তাকে আলাদা শক্তিসাধনা করতে হোলো না, গুরুর শক্তিসাধনার সমস্ত ফলটি করায়ত্ত করে, তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই উদ্দিষ্ট কর্ম্মে নামলেন। এ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, আমার গুরুদেব বলতেন,—তার কাছেই শুনেছি যে, এমন ভাবে গুরুর সমস্ত শক্তিসাধনার ফলভোগী হওয়া এর আগে খুবই কম দেখা যায়—হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বেদ পুরাণ-ছাড়া ব্যাপার,—সাধারণের এসব জানবার কথা নয়। রামকৃষ্ণের সব কিছুই, তাঁর প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠান, তাঁর সাধন সিদ্ধি,—উত্তরকালে শিষ্য-সেবকদের সঙ্গে ব্যবহার—সকল কিছুই এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এমন পূর্ব্বাপর শোনা যায় নি শ্রীচৈতন্যদেবের পর।

আমি দেখিয়াছি, যখনই শ্রীগৌরাঙ্গ বা রামকৃষ্ণদেবের কথা হয় কোনও উপযুক্ত ক্ষেত্রে, একটা তন্ময়তা এমন ভাবে আসিয়া পড়ে যে সহজে তা ছাড়া যায় না, একটা নেশা লাগিয়া যায়। আমাদের এক্ষেত্রে বক্তারও সেই ভাবটি লক্ষ্য করিলাম। তিনি মিতভাষী

হইলেও এর পর যাহা বলিলেন, পূর্ব্বে আর কোথাও তাহা শুনি নাই—এমন কি শ্রীম, মহেন্দ্র গুপ্ত, মাস্টার মহাশয়ের কাছেও নয়। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি কারো মুখেই শুনি নাই। সেটা অবশ্য উপযুক্ত ক্ষেত্র বা সুযোগের অভাবেও হইতে পারে। যাই হোক এখন তিনি বলিতেছিলেন,—পরমহংসদেবের প্রত্যেক ব্যবহারেই অসাধারণ সংযমের পরিচয় বোধ হয় প্রত্যেকেই তখন পেয়েছেন। সকল দিকে, সকলের সঙ্গে সকল বিষয়েই এমন সংযত ব্যবহার কোথাও পূর্ব্বে দেখা যায় নি। তাঁর কোন ভক্ত বা শিষ্য কোনপ্রকার অসংযত ব্যবহার করে তার গোচরে তো নয়ই, তাঁর অগোচরেও পরিত্রাণ পায় নি। আবার সাধনের ব্যাপারে,—বৃথা কোন সাধনায় সময় নষ্ট না করে একজনের জীবনে ঠিক যেটুকু দরকার সেইটুকু মাত্র নির্দ্দেশ করেছেন, আর তাহাতেই তাঁর সাধন-জীবন সার্থক হয়ে গিয়েছে। একটা বাজে, অবাস্তব কথা নেই, আদর্শ, —অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর। অতটা শক্তি ও সিদ্ধির অধিকারী হয়ে, যা এ যুগে আর কারো ছিল না, তিনি কাকেও তন্ত্র-সাধনের পথে যেতে দেন নি। তবে, কোন কোন বিশেষ পাত্রের সংস্কারগত প্রবৃত্তি এবং গতি লক্ষ্য করে, তার নিজ বিশ্বাসের জন্য, কিছু কিছু সাধন করিয়ে নিয়েছেন তার প্রিয় অন্তরঙ্গ গৃহী ভক্তদের দিয়ে, নিজের সামনে।

আমি বলিলাম,—নরেন্দ্র এতটা বৈদান্তিক ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বোলেই বোধ হয় তাঁর পক্ষে শক্তিসাধনার প্রয়োজন হয় নি,—অথচ ঠাকুরের শক্তি-সাধনার পূর্ণ ফলভাগী হয়েছিলেন। অবশ্য একথাও তিনি অনেক ক্ষেত্রে বলেছেন, যে তাঁর মত অত বড় আধার আর হয় নি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ঐখানেই তো রহস্য, ব্যাপারটা যে ধারণার অতীত, অতি অল্প লোকেই এ তত্ত্ব জানে যে অত বড় একজন সিদ্ধশক্তি গুরুর শিষ্য হয়ে কি জন্য নরেন্দ্রকে শক্তিসাধনা করতে হয় নি। প্রধানতঃ শক্তিসাধনায় খানিকটা নারীর সহায়তা দরকার অথচ আকুমার ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রকে নারী থেকে দূরে রাখতেই হবে, না হলে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তারপর নরেন্দ্রকে শক্তিমন্ত্র দেওয়া মানেই ঐ তান্ত্রিক সাধনের আগাগোড়া অনুষ্ঠান তাকে করতেই হবে, তা না করে সে ছাড়বার পাত্র নয়। শেষ পর্য্যন্ত সামলানো দায়,—কারণ ঐ সিদ্ধ বীজ পেলেই তার উদ্‌যাপনের ব্যাপারও আছে,—সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির পর সেই মন্ত্র একজন উপযুক্ত শিষ্যকে দিয়ে যেতেই হবে, এটা সনাতন—গুরুপরম্পরাগত ব্যবহার। আরও একটি কারণ, নরেন্দ্রকে শক্তিমন্ত্র দিলে তন্ত্রধর্ম্মের সাধন নিয়ে যে কাণ্ড হবে, ঐ ধারা পুনঃপ্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা, যা তিনি চান না। কারণ ওটা প্রকৃতি আপনিই সরিয়ে দিচ্ছেন সমাজ থেকে, তাই তো তাঁর আবির্ভাব এ যুগে, সহজ, সরল, সর্ব্বপ্রকার জটিলতাবর্জ্জিত জ্ঞান ও ভক্তির পথ, উদার রাজপথ দেখাতে। তিনি তো তন্ত্র-ধর্ম্মকেই পুনরুজ্জীবিত করতে আসেন নি। কাজেই ও পথে তিনি তাকে যেতে দিলেন না, নিজ শক্তি সাধনার মুখ্যফল তাকে সমর্পণ করে তার নিজ

সাধন ও কর্ম্মক্ষেত্রের পথ চিরকালের জন্যেই বাধামুক্ত করে দিলেন। তিনি নিজে প্রচলিত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়গত মূল তত্ত্বগুলি অধিগত কবে তার সত্যটুকু এমন ভাবেই বুঝে নিয়ে-ছিলেন যে, কার পক্ষে কোন্ পথ ধরতে হবে,—তা তিনি দেখিয়ে দিতেন। সেদিকে তাঁর ব্যবহার লক্ষ্য করলে আশ্চর্য্য হতে হয়। শ্রেষ্ঠ আচার্য্য বা গুরু যাঁরা ঐটি ঠিক তাঁদেরই কাজ। এ কাজ সাধারণ গুরু বা দীক্ষাদাতা কুলগুরু দ্বারা হবার নয। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গেই ধর্ম্মানুভূতিব সম্বন্ধ কিনা।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ। যেন তন্ময়তা আসিয়া ডুবাইয়া দিল আমাদের। কতক্ষণ পর আমাদের ভোজনের আহ্বান আসিল। আহারাদির পব তিনি বটতলায় একখানি গ্রন্থ লইয়া বসিলেন। আমাকেও একখানি দিলেন। খুলিয়া দেখি, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওখানা দেখা আছে বুঝি? তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য আমার উত্তরের অপেক্ষা না কবিয়াই বলিলেন,—বুদ্ধদেবেব নির্ব্বাণকে, বেদান্তমতেব ব্রহ্মস্বরূপে লয়-এর ছাঁচে ঢেলেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের রচনা আর সেটা তন্ত্রের ধাঁচায় বলা আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে যে প্রভাব বিস্তাব কবেছিল সেই প্রস্তাবেরই ফলে পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণেরা একটা সমন্বয়েব পথে যেতে চেয়েছিলেন,—তারই ফল এই সকল গ্রন্থ, আসলে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি বা প্রকবণের সঙ্গে এব কোন সম্বন্ধই নেই। এ সম্বন্ধে আর বেশী কোন কথা হইল না। তিনি কিছুক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ করিবার পর বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ উঠিলেন, আমায় বলিলেন, এখন আমায় যেতে হবে, আমার সংসাব-অধিষ্ঠাত্রী রইলেন, আবার কাল না হয পবশু আসবো, তিনি জানেন। বলিয়া চলিয়া গেলেন যেমন হঠাৎ আসিয়াছিলেন। একবাব স্ত্রী বা ঘরণী বা ভৈরবীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কিছুই করিলেন না, দেখিলাম লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া হন হন করিয়া দুয়েব বাহির হইয়া গেলেন।

আমায় একটু ভাবাইয়া গেলেন। এই যে মানুষটি, নিঃসঙ্কোচ, সব রকম ব্যবহারেই যেন তটস্থ আর ঠাকুবের সম্পর্কে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যে অনুভূতি, মনে হয় বই পড়িয়া ওটা হয় নাই। এই যে ভক্তগণেব প্রতি রামকৃষ্ণের স্নেহ, প্রেম এবং কল্যাণময় পথনির্দ্দেশ তার মধ্যে তন্ত্রধর্ম্মের সাধন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ ভাব, অথচ ঠিক নিরুৎসাহও নয়, কারণ প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট বা দৃঢ় প্রতিবাদ মোটেই নয়,—কেবল সহজ ভাবেই পথনির্দ্দেশে সহায়তার ভিতর দিয়া তন্ত্র-ধর্ম্মের অন্তর্গত শক্তিসাধনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে রক্ষা করা, যেন বিপথের বিপদ হইতে আগলাইয়া রাখা—এ সকল বিষয় সাধারণ ভক্তগণ হয়তো বুঝিবেন না। কিন্তু এটা সত্যই, এতটা গভীর লক্ষ্য সাধারণের হইবার নয়, অথবা বাইরের কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়িবার বিষয়ও নয়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান রামকৃষ্ণের চিন্তায় কাটিল, তারপর গঙ্গার ধারে খানিক

বসিলাম।—সেখান হইতে পরপারে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির কল্পনায় যেন দেখা যায়,—যে দক্ষিণেশ্বরে একসময় তিনি কত কত ভক্ত লইয়া কত লীলাই করিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় এখনও আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা তো দূরের কথা,—ঠাকুরকে আমরা, আমাদের অধিকার সামান্য বলিয়াই—অতি অল্পই ধরিতে পারিয়াছি। বোধ হয় যে মহৎপ্রাণ কিশোর অথবা যুবক ভক্তগণ তাঁর শেষজীবনের সঙ্গের সাথী হইয়া দিবারাত্র কাটাইয়াছেন, তাঁহারাও তাহার স্নেহে মুগ্ধ হইয়াই ছিলেন; গভীর জ্ঞান ও বুদ্ধির হিসাবে তাহার আসল ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রতিভার পূর্ণ ভাবটি ধরিতে পারেন নাই। পারিবার কথাও নয়,—কারণ তাহার অধ্যাত্ম জ্যোতির মধ্যে তাঁহারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের সৌভাগ্য লইয়া জর্জ্জরিতই ছিলেন। তাঁর অদর্শনের পর উপযুক্ত কর্ণধার বিবেকানন্দের নির্ব্বাচিত কর্ম্মধারায় আত্মসমর্পণ। তারপর বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের সূচনা;—কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারণ—তার মধ্যে স্মৃতিপূজার আবরণে শ্রীরামকৃষ্ণের তাত্ত্বিক অবলুপ্তি।

তাঁর রূপটি যেন মূর্ত্তিমান ধ্যান ও সমাধি, ঐ রূপটি মনে মনে ধরিতে পারিলেই ধ্যান ত... না আসে,— ধ্যান বা সমাধির ঘন মূর্ত্তি সম্মুখেই প্রকট।

৫

যুক্ত-সধানের শেষ কথা

আজ কি সারারাতটাই গঙ্গার ধারে কাটবে নাকি? ভৈরবী পিছনে আসিয়া কখন দাড়াইয়াছেন দেখি নাই। ধীরে ধীরে চাঁদ উঠিয়াছে পূর্ব্বাকাশে। আমরা সেখান হইতে আসিয়া এবার বেদীর উপরে বসিলাম। কেমন হঠাৎ মুখ হইতে একটি কথা বাহির হইয়া গেল,—কিন্তু তাঁর (স্বামীর) যাবার সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হোলো না তো, কোথায় ছিলেন আপনি?—তিনি যেন আশ্চর্য হইয়াই বলিলেন,—আমি তখন গ্রামের মধ্যে গিয়েছিলাম লণ্ঠনের জন্য একটু তেলের যোগাড়ে। কেন?—একি তাঁর কোন বিদেশযাত্রা? এ তো আমাদের দৈনন্দিন কাণ্ড। এত দেখাশুনা, বিদায় নেবার কি আছে এর মধ্যে?

বুঝিলাম, আর এ সম্বন্ধে কোন কথা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। স্থির হইয়া জোড় করে বসিয়া পক্ষে? অ রহিলাম। তিনিও স্থির রহিলেন কতক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরেই বলিলেন,—র প্রেরণায় উপভোগগুণে একেবারেই জর্জ্জরিত অবস্থা যে, এখন কি আমাদের পূর্ব্ব বিষ... তিনি বলিলেন, আহা এখন আমি বলিলাম, তা হবে না কেন, বরং অনুকূল হবে ...সাবে দেখ কেন, ও প্রবৃত্তিটা, কথাটা সত্য, তোমার মুখ থেকেই যখন বার হয়েছে ...জের কথা কও না। যারা ঐ মোহ ...র কাল শেষদিকে কথাটা কি হয়েছিল মনে

আছে তো?

বলিলাম,—মিলনের কথাই হয়েছিল, —নর-নারীর মিলনের সাধারণ তত্ত্বটি। তিনি বলিলেন,—না সাধারণ নয়, অসাধারণ তত্ত্বটি। সাধারণভাবে যা মনে হয় বা কাজে করা হয় সে তো স্থূল,—সুতরাং তার তত্ত্ব বড় একটা কারো বিচারের বিষয় নয়,—তত্ত্বটি তো ধারণা হয়েছে? দুটি নর শরীরধারী জীব অথবা দুটি নারী শরীরধারিণী জীবে এভাবে সম্ভোগের প্রশ্ন ওঠে না,—নর ও নারী পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যেই সম্ভোগের অবকাশ কেন্দ্র বা মিলনের তত্ত্ব নিয়েই আমাদের কথা। এখন তোমার বিবাহের কুশণ্ডিকার সময় একটা মন্ত্রের কথা বলছি, তোমার হয়ত মনে নেই, আর তা ছাড়া সেটা তোমার অর্থবোধ না হলেও তোমায় শুনতে হয়েছে মনে করে দেখো দেখি, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, যার নাম যোনি, তার কথায় মন্ত্রে "প্রজাপতে দ্বিতীয় মুখ" অর্থে সৃষ্টিকর্ত্তা বা স্রষ্টার দ্বিতীয় মুখ,—অর্থাৎ দ্বার, ঐখান থেকেই জীব সৃষ্টি হয়ে চলে, কথাটা আছে কিনা। কাজেই ওর সঙ্গে সম্বন্ধটাই সৃষ্টি নিয়ে। তোমার পুরুষ ভাবে সৃষ্টি প্রবৃত্তিটাই কামের গোড়া তো? তাহলে যদি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য অন্তরে বাইরে যথার্থই থাকে, তাহলে স্থূল ইন্দ্রিয়সুখের ব্যাপারটি গাধার খাটুনির মত তোমার মধ্যে প্রবৃত্তি বোঝা হয়েই চেপে রইলো যতদিন না বয়স কালে মোহটা কাটবার সময় আসে। সাধারণ ভারবাহী পশুরা তো সহজে নিষ্কৃতি পাবে না, যতক্ষণ গাধার শরীর শক্ত ভারবহনক্ষম থাকবে। বুঝেছ তো? কোন সৌভাগ্যের প্রভাবে যদি যৌবন থাকতে থাকতেই ঐ সৃষ্টির মোহ কাটে, যদি ঐ ভোগ তুচ্ছ, যথার্থই জ্ঞান হয়ে যায়, যথার্থ শব্দটাই বলছি মনে থাকে যেন, কাল্পনিক বলি নি, কারো দেখাদেখি নয়, সত্য সত্যই ভিতর থেকে তুচ্ছ বলে ধারণা হয়ে যায়, তবেই এই সস্ত্রীক সাধনের মুখ্য ফল লাভ হবে। আমি বলিলাম—কথাটা সহজেই আপনি বলে ফেললেন, কিন্তু এ অবস্থায় একজনের পক্ষে কতটা শক্ত,—কতটা দুঃসাধ্য ব্যাপার তা ভেবেছেন কি? এতদিনের সংস্কার—তাকে জ্ঞানের শক্তিতে অস্বীকার করলেও শরীর ও ইন্দ্রিয়, স্নায়ুগুচ্ছ, রক্ত-মাংস শরীর ধর্ম্ম মানবে কেন? এতটাই কি সহজ?

তিনি বলিলেন,—তুমি কি চাও সব কিছু সহজ হয়ে যাক আর হাল্কা গায়ে সিদ্ধিটা নিয়ে স্ফূর্ত্তি করতে থাকো? এ ব্যাপারে তোমার সকল কিছুই লাভজনক সুলভ হোক, কিছুই পরিশ্রম না হয় কোন কাজে, কেমন? ও আমার আদরের গোপাল গো! হ্যাঁ বাছা, যাও দুদু খেয়ে খেলা করোগে, যাও। ...সীম হইতে ;

আমি বলিলাম, দেখুন, খেলার কথাটা যা বলেছেন এটা ...সাধারণ ভক্তগণ হয়তো

কি রকম? ...র্ণের হইবার নয়, অথবা বাইরে

আমি বলিলাম, বৃন্দাবনে বাহাউল্লা দলের এক

চমৎকার মুক্তির উপায় আছে, যা কিছু তুমি...র চিন্তায় কাটিল, তারপর গঙ্গার ধারে খানি

পারো। হিন্দুরা যেমন বলে এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের খেলা, লীলা,—ঠিক তেমনি এসব ব্যাপার অতটা ফিলসফাইস্ না করে শুধু খেলার চক্ষে দেখা অভ্যাস করতে হবে। তাহলে ক্রমে ক্রমে এখানকার কোন ভোগ বা উপভোগের উপর আকর্ষণ থাকবে না। জীবন কর্ম্ম সহজ হয়ে আসবে। শুনিয়া ভৈরবীমাতা বলিলেন,—বেশ তো, এ একরকম মন্দ নয় বটে। খেলার দোহাই দিয়ে গেরস্থের বউ-ঝি বার করা, লুটপাট করা—এসব ঐ বাহাদুর উল্লা না কি বললে তাদেরই সাজে।

আমি বলিলাম, বাহাদুর নয় বাহাউল্লা, এক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা, ঐ নামেই পরিচিত; এক ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শুনিয়া তিনি বলিলেন, তারা আসলে মুসলমান তো? বলিলাম, নামটা শুনে তাই মনে হয় বটে কিন্তু তারা এদেশের মুসলমানের মত নয়,— তাদের নীতি উদার,—যুক্তিবাদী তারা, মনের পবিত্রতা সকল জাতকে ভাইয়ের মত দেখা কারো স্বার্থে আঘাত না করা ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করে। তারা বলে ভগবান সকল-কারই এক।

তিনি বলিলেন, তা বলুক, ওটা তাদের শখের কথা। যারা ওদের চেনে না তাদের কাছে বলবার জন্য ঐসব চোকা-চোকা কথা ঠিক করা আছে, হরি হরি, রাম রাম,— কি সব নামই আনলে, যাক এখন আমাদের যে কথাটা হচ্ছিল সেই কথাই হোক;—এখন তারপর শোনো,—

তাই ভালো, বলুন, বলিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। দেখলাম এবারে তাঁর ভাবটা পরিবর্ত্তিত, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম তাঁহার বাক্যালাপের বিষয়টাও অন্যরকম, যেন ধারাটাই বদলাইয়া গেল। প্রথমে যাহা বলিলেন, তাহা এখানে বলিবার নয়, কারণ উহা জটিল তো বটেই, তাহার উপর সাধারণের পক্ষে তার ভাবগ্রহণ করাও দুরূহ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ নারী-প্রকৃতির বৈচিত্র্য লইয়াই তাঁর কথা, তাহা তন্ত্র-ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতেই উদ্ভূত কিন্তু পরবর্ত্তী সাধকের হাতে বিকৃত, উহা দেখাতেই ঐ প্রসঙ্গ অবতারণা, অন্ততঃ আমি এই রকম বুঝিলাম। তারপর বলিলেন এ কথাটা যদি তোমার মধ্যে প্রত্যয় হয়ে গিয়ে থাকে যে, যৌবনে নারীসঙ্গের মূল উদ্দেশ্যই জীবসৃষ্টি, এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই নেই, তা হলে মাত্র ইন্দ্রিয়সুখের উদ্দেশ্যে নারী ঘাটার কোন সার্থকতা থাকে কি, অন্ততঃ তোমাদের মত যারা যোগধর্ম্ম অবলম্বনে জীবনে উর্দ্ধগতি চায়, সৃষ্টি বাড়াতে চায় না, তাদের পক্ষে? আমি বলিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তো সন্তান চায় না, কিন্তু ঐ সুখের প্রেরণায় উপভোগটা পূর্ণ মাত্রায় চায় তো? এইটাই যৌবনের অদম্য পিপাসা!

তিনি বলিলেন, আহা এখন আবার ওটাকে সাধারণ মানুষ বা জীবের সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবে দেখ কেন, ও প্রবৃত্তিটা তুচ্ছ বোধ হয়েছে যাদের তাদের কথা কও, তোমার নিজের কথা কও না। যারা ঐ মোহ থেকে মুক্তি চায় এমনও তো আছে একদল। কাজেই

আমাদের এখানকার বিষয়টা যতক্ষণ সম্পূর্ণ বলা না হয়ে যায় ততক্ষণ তুমি আর এভাবের বিক্ষেপ এনো না।

এইভাবে একটি ধমক দিয়া তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, তাহলে এটা বুঝেছ তো সাত্ত্বিক মানবের গতি দেবযান পথে? শুনিবার পরও আমার আবার দুর্ম্মতি হইল, একটা অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম, আচ্ছা, ঐ উপভোগ সম্বন্ধে স্রষ্টার অভিপ্রায় কি জানতে ইচ্ছা করে। বলিয়াই অন্তরে বিক্ষিপ্ত হইলাম,—ভাবিলাম নিশ্চয়ই এবার আমার অদৃষ্টে কঠিন দণ্ড আছে। কিন্তু দয়াময়ী শান্তভাবেই বলিলেন, তোমার কাছ থেকে এ প্রশ্ন আশা করি নি। স্রষ্টার অভিপ্রায় এখনও বুঝে উঠতে পারো নি বোলচ তুমি, অথচ প্রতিপদে যা করচো, তাঁর অভিপ্রায় মনে করেই তো করছো?

সত্য বলতে কি, তাই মনে করে করচি বটে, কিন্তু অন্তরে তার অস্পষ্ট নির্দ্দেশ বা ইঙ্গিত পাই না সব সময়ে, ঠিক করতে পারি না, তাই আপনার কাছে শুনে মিলিয়ে নেবো— যেটা তাঁর নির্দ্দেশ মনে করি তার মধ্যে সত্যই তার নির্দ্দেশ আছে কিনা। তিনি বলিলেন, তাঁর সৃষ্ট স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে যা কিছু বর্ত্তমান, তা সবই এখানকার জীবের ভোগের জন্যই, তার কি কিছু আপত্তি বা অনিচ্ছা আছে, না থাকতে পারে? তুমি যদি যৌবনের সংস্কার মত কখনও ঐ ইন্দ্রিয় সুখ কামনার গতিতে আনন্দ-মনে ধেয়ে যেতে চাও তা হলে তিনি বলিবেন, বেশ বেশ তাই করো। শুধু বলা নয়, তিনি তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ঐ ভোগের বস্তু যুগিয়েও দেবেন। আবার তুমি যখন বিতৃষ্ণ হয়ে ঐ বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে চাও আর তাইতেই আনন্দ পাও তখন তিনি বলবেন, বেশ বেশ, তাই তো ভালো, বোলে ঐ মোহ ত্যাগে সহায়তা করবেন, শক্তি যোগাবেন। ধনলোভে লুণ্ঠনকারীরা তাঁকে পূজা করে যখন ধনবানের বাড়ি লুট করতে যায় তখন তাদের জয় দেন, আবার রাজ-অনুচরের কৌশলে, ধরা পড়ে যখন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডভাগী হয়েছে, তখনও বলবেন এমন কাজ কেন করলে বাপু,—যাতে এই ফল হয়? তাঁর এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে সরল সহজ কতকগুলি নিয়ম করা আছে, তার ব্যতিক্রমের যোটি নেই। এ সংসারের হাটে খরিদ্দার, ব্যাপারীরা নিজ নিজ কর্ম্ম, মর্ম্ম ও ধর্ম্মগত সংস্কারের মধ্যে দিয়েই ব্যাপার করচে সহজ-ভাবেই তাঁর ঐ নিয়ম মেনে নিয়ে; এ হাটে যিনিই আসবেন তাঁকে সেই নিয়ম মেনে চলতেই হবে। আবার ব্যতিক্রমের ফলও ব্যতিক্রম; এর চেয়ে আর বেশী তো বলা যাবে না।

আমি বলিলাম, কাজ নেই বলে আর, আমি বুঝেছি। শুনিয়া এবার তিনি আসনে একটু ঘুরিয়া বসিলেন, বলিলেন,—শোনো, আবার বলচি,—যে নারীর সঙ্গে তোমার জীবনের যোগাযোগ ঘটেছে আর আমার স্বজাতি ভেবেই তার প্রতি একটি কল্যাণকর আর শুভ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাধনের যে প্রকরণটা তোমায় বলতে চাইচি সেটা বিধাতা বা জগদম্বার

অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তো নয়ই বরং অনুকূল—যদি তোমার নিজের মধ্যে দৃঢ়-সংকল্প থাকে ঐ পথে চলবার।

আমি বলিলাম, এতটা বুঝেও আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে যে আমি এ সাধনায় আস্থা-শীল নয়,—আপনাব অনুরোধেই ঢেঁকি গেলার মত গেলবার চেষ্টা করচি ?



যোগি-স্বামী—২৮ পৃষ্ঠায।

এবার একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া দৃঢ়ভাবেই তিনি বলিলেন,—কি জানি তোমার এখনকার ভাব দেখে তাই তো মনে হচ্চে, এমন সব কথা আজ এখন এনে ফেলচ কেন ? যা-ই তুমি ভাবো না কেন, যখন আরম্ভ করেচি অন্তত বিষয়টি সম্পূর্ণ তোমার বুদ্ধিতে ধরবার মত করে প্রকাশ করে দেবো, তারপর তুমি যা ইচ্ছা তাহাই করবে, এ স্বাধীনতা তো আগেই দেওয়া আছে। কেমন নয় কি ?

—এখন তোমাদের দুই-জনেব মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কটাই আসল ধরে নিয়ে আরম্ভ কবা যাক। এখন ইন্দ্রিয়সুখের অসারতা তোমার জ্ঞানে এসেচে, মনে তো এসেছেই, এমন কি সেই ভোগের উদ্দেশ্য ও খুঁটিনাটি সব কিছুই জানা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু স্থূল শরীরক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে সংযমের পূর্ণ ফল হাতে আসে নি। কেমন, এই তো তোমাদের উভয়ের অবস্থা ?

শুনিয়া আমি বলিলাম, আমার কথা আমি বলিতে পারি, তার কথা জানি না, একথা বললে কি অন্যায় হবে ? তিনি বলিলেন, খুলে বলো। আমি খুলিয়া বলিলাম, যেহেতু আমার অভিজ্ঞতা, সাধনা, নিজ পথ নির্ব্বাচন করে কতক অগ্রগতি, তার সেটা নেই, তারপর আমার সংযম-সিদ্ধি তো নেই,—সাধনকালে তার সংযম থাকবে কিনা এ সন্দেহ তো আমার আছেই,—তার উপর,—আপনার অভিপ্রায় যা বুঝেছি তাতে মনে হয়

আমার সংযম দিয়ে তাকে প্রভাবিত করেই সাধনে এগিয়ে দিতে চান, কিন্তু তাতেও আমার সন্দেহ আছে, এতদিনের অভাব, স্বামীসঙ্গের আকাঙ্ক্ষার গভীরতা যে কতটা তা আপনি জানেন, যদি তার প্রভাব আমার সংযমকে টলিয়ে দেয়, যা খুবই স্বাভাবিক, তখন আমার এতদিনের তপস্যার ফল নষ্ট হবে, এই সকল ভেবেই আমি কথাটা বলেছি।

তিনি বলিলেন,—তুমি সন্দেহের কথা এখন আনচো কেন , আগে তো এসব বলোনি। আমি বলিলাম, আপনি তো এবার যুক্ত সাধনার প্রকরণ উপদেশ দিতে চলেছেন আমরা প্রস্তুত এই ভেবে,—কাজেই এমন অবস্থায় আমি আমার কথা বলতে পারি, তার কথা কেমন করে বলবো বলুন? শুনিয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন তারপর দৃঢ়স্বরে আমায় অভিভূত করিয়া বলিলেন,—আগে তোমার সংযমের উপর তোমার বিশ্বাস তো ছিল, এখন তার ব্যতিক্রম দেখছি,—তা সত্ত্বেও বলছি শোনো,—এই পর্যন্ত বলিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন। আমি তাহার মধ্যে অসাধারণ প্রভু ভাব দেখিলাম, এমন ভাবেই দেখিলাম যাহাতে আমার হৃদয় কাঁপাইয়া দিল। তার কথা সহজ কথা মাত্র নয়, উহা আজ্ঞা,—যাহার অন্যথা করিবার সাধ্য আমার নাই, এমনভাবেই বলিলেন,—তোমার নিজের যদি সম্ভোগের দিকে আকর্ষণ না থাকে ও কাজে বিতৃষ্ণা বুদ্ধিগত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সময় যাতে তার (সঙ্গিনীর) দুর্ব্বলতায় তোমার দুর্ব্বলতা না আসে আর যদিই বা আসে তাহলে কেমন করে ঐ অবস্থা সহজে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারো সে উপায় আমি বলে দেবো। কেমন, আর কিছু কথা আছে?

যন্ত্রবৎ বলিয়া ফেলিলাম, না।—তা হলে এখন মনস্থির করে শুনে নাও, কেমন করে আরম্ভ করবে। এটা প্রতি রাত্রে অভ্যাস করতে হবে, অন্ততঃ তিনটি মাস। তার মধ্যেই তুমি যে ফল প্রত্যক্ষ করবে অর্থাৎ যে শক্তি পাবে, উভয়তই বলছি, তাতে সকল কিছু বাধাই উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারবে।

প্রথম চাই নির্জ্জন স্থান অর্থাৎ ঘর,—পরিষ্কার দুখানি সুকোমল আসন। একধারে একটি পর্য্যাপ্ত তেলভরা প্রদীপ থাকবে একটু তফাতে, যেন নিভে না যায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। অন্য কোন উজ্জ্বল আলো চলবে না,—মাটির হোক, পিতলের হোক— প্রদীপই চলবে। তার পর তুমি বস্ত্র ও উপবীত ত্যাগ করে আপন আসনে বসবে, তিনিও বিবস্ত্র হয়ে বসবেন। উভয়ত সঙ্কোচ কাটাতে আমি একদিনই যথেষ্ট মনে করি। এখানে তোমার প্রভাবই কার্য্যকরী হবে আমার বিশ্বাস। তার কথা আরও একটু আছে। গায়ের যা কিছু গহনা সবই খুলতে হবে। হার গলাতে থাকবে না, হাতে বালা-চুড়ি কিছুই থাকবে না। আঙ্গুলে আংটিও না। লোহাটিও খুললে ভাল হয় কিন্তু তা সে খুলবে না, তাই সেটা থাক। সেটা প্রায়ই অঙ্গে মিশে থাকে, তাতে কোন ক্ষতিই হবে না। তারপর,—নিঃসঙ্কোচ এবং শরীর স্থির হয়ে এলে, শরীর ও মনে, যে প্রকরণে প্রাণায়াম করে জপের

সাহায্যে মনকে কূটস্থ করতে হয় তোমার জানা আছে,—তাকেও সে উপায় শিখিয়ে নেবে। সাতদিন যথেষ্ট সময়। তার মধ্যে সে ঠিক ধরে ফেলবে, আমি আশা করচি।

এগুলি প্রাথমিক। এইটি অভ্যাসের সময়েই যা কিছু উভয়ের ইন্দ্রিয়সুখের সংস্কার মাথা তুলবে বা তুলতে পারে। যদি দেখ তোমার মধ্যে চাঞ্চল্য, তখন তুমি তার অস্তিত্ব সেখানে মন থেকে অস্বীকার করবে। চাঞ্চল্য ইন্দ্রিয়ে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই তাকে লোপ করা দরকার, কারণ ইন্দ্রিয়ে এসে পৌঁছে যাবার পর তাকে সংযত করায় শারীরিক বা শরীর-যন্ত্রের ক্ষতির সম্ভাবনা, তাই তোমাকে বিষেশভাবে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে।

তারপর একটি তিন অক্ষরের মন্ত্র বলিলেন,—এই মন্ত্র নিরবচ্ছিন্ন জপ। দেখবে পনেরো-বিশ মিনিটকাল জপ করলেই একেবারে হাওয়া বদলে গিয়েছে। বুঝেছ? এ সবই প্রথমকার অনুষ্ঠান, আসল কর্ম্ম এখনও বলা হয় নি,—এগুলি ভাল করে হৃদ্গত হলে তারপর বলচি, এখন তোমায় মানসচক্ষে এগুলি ঠিক ঠিক ধরে নিতে হবে।

আমি বলিলাম, একটা কথা ভাবছিলাম। তিনি বলিলেন, কি কথা? বলিলাম, সে ব্যক্তি খুব সহজেই আলোর সামনে,—বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, দেখো, কারণটা তার সামনে ধরে দিতে পারলেই সে আর আপত্তি করবে না। তাকে বুঝিয়ে বলবে বিবস্ত্র হবার গূঢ় কারণ আছে। তার পর হোলো লজ্জা আর সঙ্কোচ ত্যাগ। ঐ ত্যাগে অর্দ্ধেক সিদ্ধির কাজ হয়ে যাবে। আমি বলিলাম, এটা তো হোলো সাধারণ কারণ, গূঢ় কারণটা না শুনতে পেলে আমার—। তিনি বলিলেন, থামো, থামো, অত কৌতূহল ভাল নয়। গূঢ় কারণ শোনবার আগে আর একটা সহজ কারণ, যেটা মনের ক্রিয়াফল রূপেই তোমাদের ফল দেবে সেটা শোনো। প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাবে, আলোর মাঝে ঐ উলঙ্গ অবস্থাটাই দুজনের কাছে দুজনের মন থেকে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যত সুখের স্মৃতি মুছে যেতে সাহায্য করবে, শেষে আর মাথা তুলতেই পারবে না। তবে এক-দুদিনেই হবে না, ধাত অনুসারে হয় কিনা, যারা দুর্ব্বল তাদের দিন লাগে। দুর্ব্বল বলতে কি মানে করচ? অন্তরে ঐ আপাত সুখের মোহ কাটাতে এবং ঘোচাতেই হবে; এ সংকল্প যদি দৃঢ় থাকে তবে তার শরীরটা বাগানো খুব শক্ত নয়। উপায়ও তো রইলো হাতে, জপের মধ্যে।

আমি বলিলাম, তারপর বলুন। তিনি বলিলেন, তোমার ফরমাস মত বললে হবে না তো, এখনও ঐ অবস্থায় ক্রিয়াকর্ম্ম কিছু আছে, সেগুলি যথাযথ জেনেশুনে নাও, তারপর তার পরের কথা। ঐ যে দুজনের মনস্থির করে বসা, তার শুভ ফলটা যদি শীঘ্র পেতে চাও তাহলে তোমার মনের মধ্যে এই ভাবটিকে স্থির রাখতে হবে যে এখানে তোমার 'অহম্'—আমি ব্যতীত আর কেউ নেই। প্রথম ধাপে তোমায় একেবারেই তোমার মধ্যে ডুবে যেতে হবে ঐ জপের সাহায্যে। অর্থাৎ তুমি আছ, আর তোমার মন্ত্র

একমাত্র অবলম্বন হয়ে আছে,—কালের সংজ্ঞা থাকবে না, বুঝেছ ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার ওদিকে খানিক ভ্রমণ করা আছে তাই বুঝলাম,—কিন্তু তার কিভাবে হবে ?

বড় দরদ যে দেখতে পাই, আগে নিজের গতি ঠিক হোক তারপর তার কথা। কিছু ভাবনা নেই, তারও ঐ পথেই গতি হবে। ক্রমেই বগড় দেখবে, তোমার যা যা হবে তারও ঠিক তাই হবে। সে কথায় আসচি পরে, এখন জেনে রাখো ওখানে দুখানা আসনে দুটি শরীর বসে আছে বটে কিন্তু তুমি জানবে একলাই আছ আর কেউ নেই সেখানে। এইভাবে আপনার মধ্যে এখন ডুবে গেলে, কেমন ? এই অবধি তোমার নিজের লাইনেই চলেছ, তাই আপত্তির কোন কারণই নেই তোমার কাছে—।

তারপর যেটা, সেইটাই একটু,—ঐ ভাবে ধর একটা মাস অভ্যাসের ফলে যখন ঐ অবস্থাটা একেবারেই সহজ হয়ে এসেছে তখন আসনের একটু তারতম্য করতে হবে অর্থাৎ দুজনে বসতে হবে এমন ভাবে যাতে স্পর্শ লাগে দুই গায়ে। একটু ঠেকলেই হোলো, আর সব একই রকম। এখানে মন চঞ্চল হবার একটা সম্ভাবনা আছে,—তবে তোমাদের সেটা নাও হতে পারে। যদিও হয়, ইন্দ্রিয়ে পৌঁছিবার আগেই ঐ মন্ত্র জপ শুরু করে দেবে আর ঐ ভাবেই মনকে বাগিয়ে নেবে, কেমন ? তারপরে ঐ ভাবটা সহজ হয়ে এলে তখন তার ডান হাতখানি তোমার কাঁধে থাকবে। তারপর ঐ ভাবেই চলবে কিছুদিন। সেটা সহজ হয়ে গেলে তারপর যা করতে হবে, শুনে চমকে যাবে না তো ?

কতক অনুমান করতে পারচি যেন মনে হয়—

তাই নাকি ? বলো তো কি মনে হয় তোমার ?

বলিলাম, এর পরে তাকে কোলে বসিয়ে নিতে বলবেন তো ?

তুমি একটি ঘুঘু ছেলে, যন্ত্রটা আগাগোড়াই ছকে নিয়েছ ভিতরে ভিতরে দেখচি। বেশ বেশ। গোড়ায় আমার একটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে বলেই ন তোমার সঙ্গে এতটা মাথা কাটাচ্ছি। যাক, এখন একবার আগাগোড়া যতটা হয়েচে পড়াটা দিয়ে ফেলো তো, তারপর নিশ্চিন্ত হয়েই শেষটা বলে দেবো।

অবশ্য এটা ঢের সহজ। এখন তাঁকে তোমার বাঁ কোলে নিয়ে, দুজনেই অল্পক্ষণে স্থির হলে পর, জপে ডুবে যেতে দেরি হবে না। এর পরই যেটি সেইটিই যথার্থ কঠিন সংযমের বিষয়। সে আসন আমি দেখিয়ে দিচ্চি, তাঁকেও ঐভাবে নিয়েই কাজ করবে। শেষ বলে এই অবস্থার কথাই কঠিন, কারণ তার পরই সিদ্ধির অবস্থা।

এখানে তিনি বিশেষ করে আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে ঐ অবস্থায় নারীপ্রকৃতি ঠিক থাকতে পারে, মরদেরই বিপদ। কারণ এইটাই প্রকৃতির শেষ কামড় কিনা, পুরুষত্ব-অভিমানী মরদের উপর—স্রষ্টার অভিমানটা তাদের বড় বেশী কিনা; আর তখনই সেটা

এমনই মাথা তোলে, তাইতেই পড়বার সম্ভাবনা থাকে। তুমি কতটা সংযতাত্মা, অর্থাৎ আত্মশক্তিকে কতটা সংযমে লাগাতে পেরেচ তারই পরীক্ষা হয়ে যাবে, এটাকে তাই চরম বলচি। এটা পার হতে পারলেই তোমাদের জন্ম-জীবন সার্থক, জগৎ-সংসারের গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ হয়ে যাবে,—অচ্যুত আনন্দময় জীবনই এর চরম লাভ।

তবে আরও একটু হদিশ দিয়ে দিচ্চি,—প্রথম থেকে যে-ক্রমে এই সাধনা আরম্ভ করেচ যদি ধারাটি তার ঠিক ঠিক অভ্যস্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সেটা তোমার প্রকৃতিগত, যার নাম ধাতস্থ হয়ে যায়, তাহলে তারই প্রভাবে তোমার সামলানো সহজ হবে। তারপর তোমার একার শক্তিতে হবার নয় তাই—তোমাদের ঐ দুটি প্রাণকে একযোগে যুক্ত হতে হবে, হয়ে একযোগেই ঐ একই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এখন ফলাফলের কথা নয়,—কেবল একটা কথা মনে থাকে,—এ সমস্তই গুহ্য এবং গোপনীয়—একথা তোমরা দুটি ব্যতীত আর কেউ জানবে না এ জগৎসংসারে। এই ভাবেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হবে। ইতিমধ্যে, ক্রমে ক্রমে এতকাল স্ত্রী-পুরুষ-ভাবে, যে ব্যবহার বা সম্বন্ধ সংস্কারগত হয়ে গিয়েছে তোমাদের মধ্যে, দেখবে তার সঙ্গে পরবর্ত্তী অবস্থার কোনো সাদৃশ্যই নেই। এক নূতন জগৎ আর নূতন সম্বন্ধ,—অপরিবর্ত্তনীয়, পবিত্র এবং যুক্ত সম্বন্ধ। এখন সে কথা বলবার নয়, আপন অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় আপনি-আপনিই জানবে।

এরপর আর কথা নয়, যেভাবে আসনের পর আসন, তারপর প্রাণায়াম হইতে শুরু, শরীর-মন স্থির হলে জপে তন্ময়তা,—কেবল সব শেষের আসনটি ছাড়া আর সকল আসনের ক্রিয়া,—তিনি ঠিক ঐভাবে আমায় বসাইয়া, আপনি বামে ঠিক সেই ভাবে বসিয়া সব কিছুই,—যেমন করিয়া রিহারস্থাল দেওয়া হয় তেমনি সকল কিছু ঠিক ঠিক দেখাইয়া দিলেন; তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ, এইভাবে নিখুঁত এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দিলেন সকল ক্রিয়া-কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। তারপর, কেমন, সব ঠিক ঠিক ধরে নিতে পেরেচ তো,—কিছু খুঁৎ রইল না তো? বলিয়া আমার উপর কটাক্ষ করিলেন। ঠিক যেন বলিলেন—এরপর যা কিছু সবটুকু তোমারই দায়িত্বের কথা—আমার ত্রুটি নেই। শুনিয়াই বলিলাম,—এরপর যা কিছু আমারই দায়িত্ব—অক্ষমতা আমারই প্রতিপন্ন হবে যদি সিদ্ধি-লাভ না ঘটে।

তিনি বলিলেন,—বেশ, রাত এখন প্রায় চারটে হয়েছে। যদি ইচ্ছা কর একটু শুয়ে নিতে পারো। কিন্তু ঘুম তো নেই তোমার চোখে, ভিতরের দেবতা জেগে রয়েছেন, এখন ঘুম আর হবে না।—তা তোমার যা ইচ্ছা করো,—আমার কাজ আছে, আমি যাচ্চি। প্রভাত হলে চলে যেও, দেখা করে বিদায় নিতে হবে না, লৌকিক ঢং দেখিয়ে বিদায় আদায় করে নেবার দরকার নেই। কৃত্রিম সৌজন্যতা আমাদের সমাজে নেই। জেনে রেখো—আমি কিছুই বাকি রাখি নি, সবই ঢেলে দিয়েছি,—অতএব,—বলিয়া, আমার

দাড়িতে কযটি আঙ্গুল ঠেকাইযা, যাও খোকা ঘবে যাও, বলিয়া সেই আঙ্গুল নিজের ঠোঁটে ঠেকাইয়া চুমু খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই পর্য্যন্ত কি চমৎকাব গাম্ভীর্য্য, স্নেহ এবং সরলতা-পূর্ণ ব্যবহার, গুরুভাবের দৃঢ় অভিব্যক্তি। তিনি চলিযা গেলেন তাঁব কুটিরেব মধ্যে,—আমি প্রভাতকালের অপেক্ষায় বসিয়া বহিলাম। কতক্ষণ পব যখন পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়াছে, এবার যাইবার জন্যই উঠিলাম। ঠিক ঐ সময জননী গামছা কাঁধে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। আমি ফিরিয়া দেখিয়া একবাব নমস্কাব কবিব কিনা ভাবিতেছি,—তিনি বলিলেন,—কি বন্ধু! আমাব এতদিনের তপস্যাব ফল, সহজেই আত্মসাৎ কবে এখন সবে পডচো?

এ যেন এক ঘা চাবুকেব আঘাত। এ আবার কোন্ মানুষ? এ কি সেই লোক, এক ঘণ্টা আগে কর্ত্তব্য শেষ কবিয়া যিনি কুটিবেব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন?

কথাটায় যে বেশ একটু আঘাত পাইলাম, তাহা তিনি যে বুঝিলেন না এমন নয়, তবুও বলিলাম, দেখুন, সত্য সত্যই এতটা অপদার্থ মনে করলে আপনি কখনই আমায় এতটা অনুগ্রহ করতেন না। এটাও আপনি বুঝেচেন, আমি এতে ঠিকমত উত্তীর্ণ হতে না পারি কিন্তু পবীক্ষা আমি নিশ্চযই কোরবো।

ঐখানেই তো আমাব আপত্তি, পবীক্ষা শব্দটাই যে অনিশ্চিত সূচনা করে। ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহ তো ঐখানেই।

কেন, জননী? তিনি বলিলেন,—তোমার মধ্যে সাধনার একটা ছাঁচ তৈরী হয়ে গেছে আগে থেকে, তার সঙ্গে এই প্রকবণটি মিলিযে জীবন-সাধনায় সিদ্ধিকে সহজ করে নিতে পাববে এবং সঙ্গে সঙ্গে আব একজনের জীবনকেও উন্নত করবে এই আশা আর উদ্দেশ্যেই না তোমায এতটা খুলে সব কথা বলে দিয়েছি,—এখন দেখচি, যেভাবে তোমাব উপকাব কবতে চাইলাম তুমি ঐগুলি পরীক্ষা হিসাবে করবে বলেই অমূল্য সাধন প্রকরণটি মূলেই তুচ্ছ করলে। দৃঢ সঙ্কল্প না হলে সিদ্ধির সম্ভাবনা কোথা? পরীক্ষা করে দেখবে বলে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নামলে মনেব দৃঢ়তা থাকবে না, ফলাফলেও নিঃসংশয় হতে পারবে না।

আমি বলিলাম,—এখানে আগাগোডা যদি সবটাই আমার নিজ কর্ত্তৃত্বের বিষয় হোতো তাহলে সাফল্য বা বিফলতাব সকল দায়িত্ব আমারই স্বীকার করি, কিন্তু এখানে আরো একজনের সহযোগ রয়েছে, সে ব্যক্তি আমার পথের কিম্বা আমার পথের মানুষ নয় সেটা তো ঠিক হয় নি এখনও, তাই মনে হয় তাব দিক থেকেও তো সাফল্যে বাধা আসতে পারে?

তিনি, যেন একটু চিন্তিত হইলেন, ক্ষণিক পরেই বলিলেন, ওগো, আমি নিজে নারী, আমি নারী-প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। যে ক্রমে আমি করেছি এবং পেয়েছি সেই

ক্রমটাই তোমায় বলেছি। আমি এটাও জানি যে, আমার সাথী যদি যথার্থই প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে মনেপ্রাণে এ কাজে আমাকে এক করে নিতে চান, আর সেইটাই আমাদের এই জীবনের চরম সার্থকতা, এই ধারণাটুকু ভিতরে ঠিক বদ্ধমূল থাকে, সিদ্ধিতে প্রতিবন্ধক থাকতে পারে না। প্রথমে তোমারই উপর ঐ উদ্দেশ্য ও সিদ্ধির মূল ভাবটি নির্ভর করচে, এটা তুমি এড়াতে পারবে না। আসলে তোমার নিজেরই উদ্দেশ্যের গোড়া যে শিথিল।

আমি স্বীকার করিলাম, অনেক দিন হইতেই আমার নিজ পথ পৃথক এবং সেই ভাবেই চলে আসার জন্য, এভাবে তার সঙ্গে এক হয়ে চলা কতটা সম্ভব হবে এ সংশয় কিছুতেই কাটাতে পারচি না। তিনি বলিলেন, হয় তুমি তার সঙ্গে এতটা মিশেও তার ধাত বুঝতে পারো নি, না হয় তুমি ঐ হাবাতে কাঠের মত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থপর, নিজের লাভটিই দেখতে অভ্যস্ত,—এছাড়া আব তৃতীয় লক্ষণ তো পাইনে তোমার মধ্যে।

শেষে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—আমি যাই হই, সর্ব্বান্তঃকরণে যখন আপনার উপদেশ গ্রহণ করেছি তখন আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই চেষ্টা করবো। তিনি কিভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন জানি না, কেবল এইটুকু মাত্র বলিলেন,—ঐ যে, চেষ্টা করবো, ঐ কথাটাই তোমার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে রইলো, তোমাদের সিদ্ধির পথে। যুক্ত-সাধন বড়ই সহজ পথ কিন্তু সিদ্ধিটা, চেষ্টাব চেয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের বলেই আয়ত্ত হয়, এই আমার বিশ্বাস।

এই যে সাধনের উপদেশ, আমি প্রথমটা ঔষধ পানের মতই গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম কিন্তু উপদেশের মধ্যাবস্থায় আসিয়া উহার গুরুত্ব বুঝিলাম। আরও বুঝিলাম এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক সত্য যদি পাইলাম তবে যুক্ত দাম্পত্যজীবনে সাধন করিতে ক্ষতি কি? এ সিদ্ধিতে আর কিছু না হোক গৃহী সাধারণের কতকাংশেরও কল্যাণ তো নিশ্চয়ই করা যায়। যে দুটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত ইনি দেখাইলেন কোনটাই ফেলবার নয়। তবে সন্দেহ এইটুকু লইয়া গেলাম, তিনি অর্থাৎ আমার সহধর্ম্মিণী কি সত্যই এতটা গুরুত্ব বুঝিবেন এবং সহযোগী উত্তর-সাধিকার স্তরে উঠিতে পারিবেন। অবশ্য ইহার মধ্যে আমার দিকে কোন-প্রকার গরিমা-গ্রন্থি যে ছিল না একথা সত্যই বলিতে পারি।

যাহা হউক এখান হইতেই গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। এই পরীক্ষাই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

৬

ঘরণীর কর্ম্ম-রহস্য, অতঃপর—

গৃহে আসিয়া দেখিলাম গৃহিণী আমার ষোলোকলায় পূর্ণ সপ্তদশী, ঘর-গৃহস্থালী আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রভাতে উঠিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত সংসারে রান্নাঘরের সঙ্গে বাঁধা,

—সন্ধ্যার দিকে বাত্র সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত অন্যান্য কাজের বোঝা স্বচ্ছন্দে বহন করিতেছেন পুরস্কারও আছে , যথা,—নানাপ্রকাব মন্তব্যেব মধ্যে, ছোটলোকের ঘরের মেয়ে, এই কথাট শোনা, সকালে ঘুম ভাঙিতে দৈবাৎ বিলম্ব ঘটিলে, অথবা পিত্রালয়ের কেহ আসিলে কথা বার্ত্তার জন্য কিছু সময় করিয়া লইলে, লাঞ্ছনার ত্রুটি নাই। এমনই অনেক কিছু দেখিলাম তিনটি দিন ছিলাম—তাহার মধ্যে আমি যে এতদিন পরে ঘরে আসিয়াছি তাহাতে তাহাব নিত্য সৌভাগ্যের কোন ব্যতিক্রম হইতে দেখিলাম না। উপরন্তু আমার মধ্যে একটি প্রশ্ন অনিবার্য্যরূপে দেখা দিল, কি সুখে অথবা কোন্ উজ্জ্বল আদর্শ লক্ষ্য কবিয়া এ মানুষটি মুখ বুজিয়া এই কঠিন বৈবীভূমিতে বাস কবিতেছে? স্বামী সম্পর্কেব যাঁরা শ্বশুর, শাশুড়ী দেবর ও ননদ ইহাদের কাবো কাছে একদিনও একটি মিষ্ট বাক্য বা সহানুভূতি পায় না অথচ তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোজনেব সর্ব্ব-কর্ম্ম তাহাকেই কবিতে হয়। অতীব চমৎকার ব্যাপার।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি বাহিবে বৈঠকখানা ঘবে শুইতাম, এবাব তাহাব সঙ্গে কথা কহিতে হইবে বলিয়া একত্র শয়নের, এক ঘবে অবশ্য পৃথক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। সে তাহাতেই মহাসুখী হইল, দেখিলাম। ইহাব মধ্যে যে অদ্ভুত সদানন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিতেছি কোন কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম নাই। কিন্তু আঘাত পাইলাম যখন দেখিলাম আমার এই আগমনে আমাদের সংসাবে কাবো কোন ভাবের ব্যতিক্রম হইল না , কেবল মা একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কবে আর কতদিন ঘুরে বেড়াবি? চাকরি-বাকরি কর্, ঘরবাসী হ,—এ কি হচ্চে,—এই বেশে দেশবিদেশ ঘুরে লাভ কি? ইত্যাদি।

রাত্রে যখন সদানন্দময়ীর সঙ্গে দেখা হইল তখন প্রশ্নোত্তরে যা কিছু জানিয়া লইলাম তাহা মোটামুটি এই যে, এ সংসারে পয়সার এখন বড় টান এবং আমি যে বুড়ো বয়সেও উপার্জ্জন করি না এইটাই এখানে সবচেয়ে বড অপরাধ। একটি ঝি, তার নাম হেমের মা, সে-ই রাত্রে তাহার কাছে শয়ন কবে, এবং সে-ই তাহার অভিভাবক এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু। আর, ভিন্ন সংসারের হইলেও কাকীমা, পিসিমা এবং ঠাকুরমা, এঁরা যত্ন করেন, সহানুভূতি প্রকাশ কবেন, আহা, এই ভরা জোয়ান বয়সে বৌটা স্বামী-সংসর্গে বঞ্চিতা বলিয়া, নানাভাবে পীড়িত হওয়ার জন্য আক্ষেপোক্তি করেন। তার কাছে ইতি-মধ্যে সংসারে আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া, গৃহিণীকে তাহাদের প্রতি অনুরক্তই দেখিলাম। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু দেখিলাম ও শুনিলাম। ইহার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব বার্ত্তা এবং আত্মরক্ষার্থ তাহার যে ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুষ্ঠান দেখিলাম তাহাতে তৃতীয় দিনে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া এবং তাহাকে ইষ্টের চরণে সমর্পণ করিয়া যাত্রা করিলাম আপন পথে। সে ব্যাপারটা এই যে,—

আজ দ্বিতীয় দিন, গোপনে আমি আপন শয়নকক্ষে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চুপি চুপি

গিয়াছি, তখনও কোথাও দীপ জ্বালা হয় নাই। জানি, প্রভাতে উঠিয়া তাহাকে সবার আগে বাহিরে যাইতে হয় তাই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন তাহার ঘরে বিছানা পাতা, কাপড় কাচা, গা ধোয়া ইত্যাদি হইয়া যায় তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক তাহার অবসর থাকে। তাহার পর, রান্নাঘরে, বিধবা অচলা পিসিমার কাজ হইয়া গেলে ডাক আসে, তখন যাইয়া আবার লাগিতে হয় সংসারের কাজে। কাজেই তাহার এই অবসর সময়টাই আমার পক্ষে শেষ কথাটা বলার চমৎকার সুযোগ। তাই আজ যখন তিনি কলতলায় গা ধুইতে গিয়াছিলেন সেই সময় গিয়া একটা কোণে সবার অগোচরেই চুপচাপ বসিলাম এবং অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার হইয়া গেল। ভাবিলাম ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিলেই আমায় দেখিতে পাইবেন তখনই কথা আরম্ভ করা যাইবে। বসিয়া বসিয়া যা বলিব একবার বেশ ঝালাইয়া লইতেছি। শব্দ পাইলাম, তিনি আসিতেছেন। আমি কোন প্রকার নড়চড়া-রহিত, স্থির বসিয়া আছি, আলো জ্বালিলেই স্বরূপ প্রকাশ পাইবে,—সুতরাং এখন করিবার কিছুই নাই। দেখিলাম, তিনি চুপচাপ ঢুকিয়া দরজা বন্ধ এবং খিল লাগাইয়া দিলেন। আমার আসাটা টের পাইয়াছেন নাকি? দেখা যাক, ব্যাপার কি দাঁড়ায়। আমি যে কোণে আছি সেখানে কারো কোন প্রয়োজন নাই, জানিতাম। নড়াচড়া শুনিতেছি এবং দেখিতেছি, কিন্তু আলো ত জ্বলিলই না বরং উত্তর দিকে যে দেওয়ালে আমার আঁকা এক-খানি ঠাকুরের ছবি ছিল ঠিক তাহার সামনেই আসন পাতার মত একটা কোমল শব্দ বা গতি শুনিলাম। আরও কিছু শুনিলাম যাহাতে মনে হইল তিনি বসিয়াছেন। আশ্চর্য্যবৎ আরও কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। পাঁচ-সাত মিনিট একেবারে সব স্থির। হরি হরি, তার পর এ কি শুনিলাম? প্রাণায়ামের পূরকের শব্দ,—এ ভাবের শ্বাস, প্রাণায়াম ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। এঁকে প্রাণায়াম শিখাইল কে, কোথা হইতে ইনি এ পথ আবিষ্কার করিলেন? আমার সব কিছুই তালগোল পাকাইয়া গেল। পনেরো হইতে বিশ মিনিট কাল প্রাণায়াম চলিল, তারপর নিঃশব্দে কোন কাজ চলিতে লাগিল,—বোধ হয় জপ, সেও প্রায় আধ ঘণ্টা অবাধেই চলিল,—এমনই সময়,—ও বৌমা, আমার হয়ে গেছে এবার তুমি এসো না, উনুন কামাই যাচ্চে যে।

কিন্তু বৌমা তখনই উঠিলেন না বা কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া নিজ কর্ম্মে স্থির। ইহাতে ভাবিলাম এইবার বুঝি একটা অপ্রিয় কিছু ঘটিয়া যায়। ইতিমধ্যে তিনি ধীরে ধীরে নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া লইলেন, তারপর ধীরে ধীরে দরজার হুড়কোটি খুলিয়াছেন এমনই সময় উষ্মাপূর্ণ দ্বিতীয় ডাক। আমার আর সাড়া দিবার প্রয়োজন হইল না,—তিনিও চলিয়া গেলেন। তারপর রাত্রে দেখা হইল শয়নের সময়। তখন আমি অবশ্য সন্ধ্যায় যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি সে সবই খুলিয়া বলিলাম, এবং প্রকৃত ব্যাপার কি জানিতে কৌতূহলী হইলে তিনি যে ইতিহাস উদ্গীরণ করিলেন তাহা এই ;—গত

বৎসর যখন আমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঘুরিতেছিলাম, তখন স্বামী কেশবানন্দ, দূর সম্পর্কে দাদামশাই, তাঁহাদের বাড়ী আসেন। আমার গৃহত্যাগের বিবরণ শুনিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ না করিয়া শাশুড়ীকে বলেন—ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আমার স্ত্রীকে গোপনে ডাকিয়া দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন ও বলেন, সে গিয়াছে তার কাজে, তুমিও তোমার কাজটা বুঝে নাও, তাহলে আক্ষেপের কিছুই থাকবে না। আমার গিন্নি অকূলে যেন কূল পাইলেন এবং সেই সময়েই, শুভদিনে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথে বিপুল অধ্যবসায় সহকারে চলিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে দাদামশাই কেশবানন্দই তাঁর সুখ ও শান্তির পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বুঝিলাম—আজ প্রায় দেড় বা দুই বৎসর হইতে তিনিও এ সদনুষ্ঠানে মনেপ্রাণেই লাগিয়া গিয়াছেন এবং যেহেতু ইহাতে তিনি শান্তি পাইয়াছেন, আনন্দ পাইয়াছেন তাই কখনও বন্ধ যায় নাই। কোনো সু বা দুর্য্যোগে নিত্য-কর্ম্মের ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। এখন বুঝিলাম চমৎকার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এ সকল ব্যাপার উভয়েরই অনুকূল বলিয়াই আমার ধারণা হইল। কিন্তু পরিস্থিতি লইয়াই যত কিছু অসুবিধা। এতক্ষণে বুঝিলাম,—সরল নির্ম্মলক্ষেত্রে এই দীক্ষার ফল শুভই হইয়াছে,—আরও বুঝিলাম,—কেন এই সদানন্দময়ী সর্ব্ব বিষয়েই তটস্থ,—লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সবই সত্যসত্যই হাসিমুখে গ্রহণ করিতেছেন, —যখন এরা আমায় ছোটলোকের মেয়ে আরও আরও সব কত কথা বলে, সত্য বলচি হাসিতে আমার পেট গুলিয়ে ওঠে, সময় সময় সে হাসি চাপতে পারি না, হেসে ফেলি,—তখন একেবারেই আগুন হয়ে যায়, বলে, লজ্জা নেই আবার হাসি আসে তোর, ঘেন্না হয় না ?—এই সব কথা। কোন দিকে অসাবধানতা নাই,—এ এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার। এখন আমার যেজন্য আসা তাহাকে সরল এবং অকপট ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলাম এবং এখন ঐ নিয়মে যুগ্ম বা যুক্তভাবে সাধন সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যাহা বলিলেন, জানি না উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুক্তিপূর্ণ উত্তর এক্ষেত্রে আর কারো দ্বারা সম্ভব হইত কিনা। এমন মুখচোরা সেই বালিকা কোথা হইতে এই শক্তি লাভ করিয়াছে এটা বুঝিলাম, এ একটা বিস্ময় আর,—যাহা হইয়াছে আমার গৃহত্যাগের পরে,—ইতিমধ্যেই ঘটিয়াছে অর্থাৎ গত তিন-চার বৎসরের মধ্যেই এই অধিকার তাহার হইয়াছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায়ই বলিলেন, তোমাদের এখানে থাকতে ওসব কিছুই সম্ভব নয়, বিরুদ্ধ হাওয়ায় এখানকার সর্ব্বস্থান পূর্ণ। যদি এই গারদ-খানা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি কখনও, তাহলে যথা উপযুক্ত স্থানে ঐভাবে সাধন সম্ভব। এখন তুমি তো চলে যাবে, তারপর আমার উপর যে একচোট ঝড় আসবে সে আমিই বুঝচি, কিন্তু তুমি কি আমায় এখান থেকে কিছু দিন ওখানে (বাপের বাড়িতে) থাকবার ব্যবস্থা করতে পার ? তাহলে মনের সাধে যেগুলি দাদামশাই দেখিয়ে দিয়েছেন সেগুলি ভাল করে অভ্যাস করি, যতদিন না দুজনে আবার একত্র হবার সুযোগ হয়। তাহাই হইল।

পরদিন আমি একখানা গাড়ি আনাইয়া তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলাম। অবশ্য কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া,—বাবা অফিস চলিয়া গেলে পরই কাজটি করিলাম। তারপর বাহির হইলাম পথে,—আর ঐ বাড়িতে যাই নাই।

তবে এখানে এটুকু বলিয়া রাখি যে, ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে বন্ধুবর মদনমোহনের কাশীপুরের বাগানে সস্ত্রীক দীর্ঘকাল বাস করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তখনই ঐ ভাবের সাধনের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

এ এক বড বিচিত্র ব্যাপাব ঘটিয়াছিল আমাদের দাম্পত্যজীবনে। যাহা হউক কেহ জানিলও না, আমি এখন কি জন্য বাড়িতে আসিয়াছিলাম আর দুটি রাত্র গৃহবাস করিবার পব তৃতীয় রাত্রের পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। যাবার আগে যে কাজটা করিয়া গেলাম তাহাতে বাবা বোধ হয় অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন, মা চক্ষের জল ফেলিয়াই বলিলেন, এমন ভাবে আসাই বা কেন, যদি থাকতেই পারবে না! পিসিরা বলিলেন, গাঁয়ের কুঁড়ে ওটা চিরকাল। কাজ-কর্ম্ম কিছু না, কেবল ফূর্ত্তি করে ঘুরে ঘুরেই বেড়াবো, দেখবো—এমন করে কতদিন চলে। ঐ বৌটার শাঁপ লাগবে না, তুই কি সুখী হবি কখনও,—কোথাও সুখে থাকতে পারবি? ঠাকুমা বলিলেন, এত যত্ন করে এত বড়টা করলাম, শেষে তুই বৌ থাকতে এমনি করে বাওণ্ডুলে হয়ে বেড়াবি? তোর ঠাকুদ্দা যে বলতেন, দেখো গিন্নি, ও ছেলে বংশের সেরা হবে,—তাই তুই এই হলি র‍্যা? তারপর বাডির বাব হবার সময় এক পিসতুত ভাই, শিশুকাল থেকেই যারা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, সাথী বাল্যে খেলার একজন, এখন সে হাইকোর্টের কেরানী,—বিবাহ হয়েছে, সন্তানও বুঝি একটি হয়েছে, সে হাসিতে হাসিতে গায়ে ঠেলা দিয়া বলিল, এ কি ঢং হচ্চে বাবা, মাঝে মাঝে একবার এসে ডুবে ডুবে জল খেয়ে যাওয়া,—আমরা কি বুঝি না কিছুই ইত্যাদি ইত্যাদি—

মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দূরে কোথাও, না নিকটে কোথাও যেতে চাও, মন আমার! ভিতরে ভিতরে এমনই অবসন্ন ভাব, যেন দীর্ঘকাল কতই কঠোর, কত ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করিয়াছি, তার ফলেই ক্লান্তি, একটু বিশ্রামপ্রার্থী হইয়া প্রাণ আমার যেন কোথাও একেবারেই শুইয়া পড়িতে চাহে। কিন্তু আর একদিকে কি চাঞ্চল্য!

উঠিলাম, ধীরে ধীরে আবার হাঁটিতে শুরু করিলাম, হাওড়ার স্টেশন হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে। হাওড়ার পুল পার হইয়া যখন বাঁদিকে ফুটপাথ ধরিয়া হাঁটা শুরু করিলাম, গঙ্গার উপর মুক্ত বাতাসে প্রাণ স্নিগ্ধ হইল, তখন আরও ধীরে ধীরে ঐ প্রাণশক্তি-সঞ্চারী বাতাস আরও উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছি। ওপারে ডান দিকের ফুটপাথ হইতে যেন কে আমার নাম ধরিয়া ডাকে, শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি ফটিকদা,—সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ঠেলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছেন, দেখিলাম,—আমার দিকেই আসিতেছেন।

এসেই একেবারে জড়াইয়া ধরা, বুকে চাপ, আর কানে কানে, বাবা মুক্তিনাথ তোকে আজ ক'দিন বড্ড খুঁজচেন, আমার কাছে পরশু নিজে এসেছিলেন, বিষ্ণুকে একবার করে রোজই পাঠাচ্ছেন। আশ্চর্য্য, তিনি আজই বলে গেলেন, প্রমোদ দুই-এক দিনের মধ্যে আসছে, বাড়িতে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বদরীকাশ্রমে যাবে বলে। তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলবে। নিশ্চয় সে আসবে, কিম্বা এসেচে ইতিমধ্যে। আমায় একবাব বাড়িতে খোঁজ নিতেও বললেন। তাই আজ অফিসের পর তোদের বাডিতে গেলাম, শুনলাম, দুদিন বাডিতে ছিলি, আজই বেরিয়ে দুপুরে গিয়েছিস বৌমাকে তাঁর বাপের বাডিতে থাকাব ব্যবস্থা করে দিতে। আরও আশ্চর্য কি জানিস ? আমি আনমনে হাওডার স্টেশনের দিকেই আসছিলাম, দেখ, তাঁর ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল। চল যাই ?—কোথা ? আয় না, বলিয়া হাতটি ধরিলেন।



বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা রাজেনদার বৈঠকখানায় হাজির। অবশ্যই জানেন তিনি আমার সব কথা। বছর দুই আগে তাঁর দুই মাষ্টারের দুখানা ওয়াটারকলারের ছবি করে দিয়েছিলাম। তিনি থিওসফিষ্ট, তাঁর পরিচয় 'প্রাণকুমারের জীবনকথা'র মধ্যে বিশেষভাবেই দেওয়া আছে। মাষ্টার এম, (মরু ঋষি) ও মাষ্টার কে এইচ—এই দুই মূর্ত্তি প্রত্যহ পূজা করেন। ঐ ছবি আঁকা সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। তাঁর ধারণা এই যে, আমার যা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বৈরাগ্য, ঘরণী স্ত্রী প্রভৃতি প্রিয়তম আপন জন ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া, সব কিছু ঐ দুই মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টির ফলেই হইয়াছে। তখন তিনি, বাবা মুক্তিনাথের কাছে আমার দীক্ষিত হওয়ার কথা কিছুই জানিতেন না। শেষে জানিয়াছিলেন, তা সত্ত্বেও বলিয়াছিলেন, তা হোক, যা কিছু যোগাযোগ দেখচো, সব

কিছুই ঐ প্রভুদের কৃপাতেই হইয়াছে, আর কিছু নয়।

এতটা ক্লান্তি, এতটা অবসন্ন ভাব, রাজেনদার* কাছে আসিয়াই কোথায় যেন উড়িয়া গেল,—ভিতরে একটা শান্ত শক্তিমত্তা অনুভব করিয়া রাজেনদার কথায় অভিনিবিষ্ট হইলাম। তিনি আগে শুইয়াছিলেন, এখন উঠিয়া বসিলেন, চলিতেছিল আমাদের যোগ-ধর্ম্মের পরে,—তিনি যাজ্ঞবল্ক্য যোগী ঋষির কথাই বলিতেছিলেন; এখন সেই প্রসঙ্গেই বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের অর্দ্ধেক সিদ্ধি তাঁর স্ত্রীর সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল,—ওদের সঙ্গে যে স্ত্রার যোগাযোগ, সেই সহায় না পেলে কখনই সোজা যোগধর্ম্মের এতটা অন্তরে প্রবিষ্ট হতে পারতেন না।

আজ প্রায় দশ বছর হইল ফটিকদার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল, এখন তার সংসারে একটি কন্যা মাত্র অবলম্বন। বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যার স্ত্রী নেই, তার যোগসিদ্ধি সম্ভব কিনা? রাজেনদা বলিলেন, কেন সম্ভব হবে না, তবে যেটা সহজে বা অবলীলাক্রমে হোতো তা গভীর অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়ে করে তুলতে হবে। আর এই কারণেই তন্ত্রে অপর স্ত্রী গ্রহণের উপযোগিতাও দেখিয়েছেন।

তাতে আবার ফটিকদা বলিলেন, যদি সে মনোমত না হয়। একটু হাসিয়া, রাজেনদা উত্তরে বলিলেন,—যখন অপর স্ত্রী গ্রহণের কথা তখন নিশ্চয়ই পরীক্ষার পর অর্থাৎ রীতি-মত পরীক্ষা করে, কৃতনিশ্চয় হয়ে তবেই না গ্রহণ। তখন আবার প্রশ্ন হইল, এই যে রীতিমত বললেন, সে রীতিটা কি? উত্তর হোলো, রীতি এই যে তার সঙ্গে কিছু দিন বসবাস করে তবে জেনে, বুঝে, নিশ্চিত হয়ে। ফটিকদা বলিলেন, বসবাসে তো ব্যভিচার-সম্ভাবনা আছে? বাধা দিয়ে রাজেনদা বলিলেন,—হবে না, বসবাসে ঐ নারীর প্রকৃতি নির্ণয় করারই কথা, তার মধ্যে ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা মোটে থাকবে না। যে তা পারবে না, যোগমার্গ তার জন্য নয়। এই কথা বলেই রাজেনদা পন্থার একটি প্রবন্ধের উপর লক্ষ্য করতে ইঙ্গিত করলেন। সেটা বোধ হয় ১৯১৪ সালের জুলাই বা আগস্ট হবে,—ঠিক স্মরণ নাই।

তিনি বললেন, আমরা এখন ওটাকে যতই দুর্ব্বিষহ মনে করি না তখনকার ঐ সব যোগধর্ম্মের দিকপাল যাঁরা, তাঁদের মনে ঐ সব ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় সুখাদির প্রবৃত্তি প্রশ্রয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাঁদের সংযমই এমন ছিল। তাঁদের সময়ে ঐ শ্রেণীর মধ্যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে, শিশু থেকেই জীবন এমন ভাবেই গঠিত হোতো যাতে অসময়ে অসঙ্গত বা সংযম-বিরোধী কোন ভাবেরই মাথা তোলবার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই জীবনপথে

* শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, পন্থা সম্পাদক। তখনকার ধর্ম্মবিজ্ঞান, দার্শনিক, মাসিক পত্রিকা, এক সময়ে বহুল প্রচার ছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রতি সংখ্যায় একটি করিয়া তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ থাকিত।

প্রবল বাধা সৃষ্টি করেনি। বাল্যেই তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এমন কি আবহাওয়াটা পর্য্যন্ত ছিল আলাদা—আমাদের সঙ্গে এতটাই পার্থক্য। আমাদের পক্ষে ঐ সকল বৃত্তি, সংযমের শক্তিকেও আয়ত্ত করাই কঠিন কিন্তু তাদের এমনই সৎভাবের অভ্যাস যে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও সকল কখনই মাথা তুলতে পারে না। একটা ব্যাপার বুঝেই দেখ না, আমাদের এখনকার সমাজ যতই সভ্য হোক, বিষ্ঠার পোকার মত আমরা গায়ে গায়ে সংসার পেতে বাস করচি, স্থানাভাব, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, তারপর আত্মীয়স্বজন ঘেঁষাঘেঁষি করে, যত সৎ অসৎ প্রবৃত্তি এবং তার ক্রিয়া ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে বাস করি, প্রত্যেকের আয়ুষ্কালও কতকটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। এই যে শরীরের ঘেঁষাঘেঁষি তার চেয়ে ভয়ানক হোলো ভাব, বৃত্তি বা প্রবৃত্তির এমন ঘেঁষাঘেঁষি, এইটাই তো সংযম অধিকারে প্রবল বাধা, সেই কারণেই অসংযম, প্রবৃত্তির ব্যভিচার, হীনতা, স্বার্থপরতা, সত্যের উপর মিথ্যার প্রলেপ লাগানোর প্রবৃত্তি, ফলে সত্যের বিকৃতি, এসব তো সহজ, নিত্য ব্যবহার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তখনকার সমাজে যৎসামান্য প্রাকৃতিক নিয়মেই, ব্যতিক্রম থাকলেও সমাজ-শরীর এমন স্বাস্থ্যহীন তো ছিল না। সমাজের মধ্যে মূলে সংযমের ভিত্তিটা দৃঢ় ছিল, নারীসঙ্গ বা বিবাহটা যে প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশেই আর এটাই ফাণ্ডামেণ্ট্যাল ল, সমাজের সর্ব্বাবস্থার এই জ্ঞানটি বিধির কাজ করতো। কাজেই তাঁদের সময়ে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, সরল প্রকৃতির নিয়মানুগ সমাজ ও পারিবারিক পরিস্থিতির গুণে যে সব প্রবৃত্তি স্ফুরণের কাজটা সহজ ভাবেই হোতো এখনকার দিনে তার কথা ভাবাই যাবে না।

এখন ফটিকদা জিজ্ঞাসা করিলেন, ধরুন অপর স্ত্রী গ্রহণের সামাজিক কোন অন্তরায় হয়তো সে সমাজে ছিল না, নিজ নিজ মার্গে যাবার অপরাপর বাধা তো আছে?

রাজেনদা বলিলেন, বলো না, কথাটা খুলে ভাল করেই বলো।

—যোগধর্ম্মের অন্যান্য বাধাও তো আছে? কি? সে বাধা নিজের শরীর মন থেকেই না হোক ভাগ্যের দিক থেকেও আসতে পারে তো? রাজেনদা জিজ্ঞাসা করিলেন, কঠিন অবস্থা বা রোগ বা শারীরিক কিছুর বাধা বলছ কি? উত্তরে ফটিকদা বলিলেন, দৈব বাধা মানুষের শক্তি দিয়ে এড়ানো যায় না, যেমন ধরো উপযুক্ত স্ত্রী আছে—পুরুষের আপন মার্গের প্রতি নিষ্ঠাও আছে যোগ-মার্গে যাবার, তা সত্ত্বেও তো দৈব বাধা আসতে পারে এবং উদ্দেশ্য বিফল করে দিতে পারে নাকি? আমি সেই দৈব বাধার কথাই বলচি।

একটু হেসে রাজেনদা বলিলেন, ফটিক, কথাটা খুলেই বলো না, তোমার নিজের কথাই বলচ তো? দেখো কথা হচ্চে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের এবং তাঁদের সময়ে, তাঁদের সমাজের পরিস্থিতির কথা, তুমি সেখানে থেকে এখনকার বর্ত্তমান কুসংস্কার-দুষ্ট, জটিল, ঘন ঘন জীবনদ্বন্দ্বে পরাজিত, অধীন, এই অশান্তিকর সমাজে তোমার মত একটা সাধারণ মানুষের

কথা আনচো কি বলে ? বাজে প্রশ্ন করো না, তোমার স্ত্রী নেই, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু, তার উপর ধনসম্পত্তি প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাকের কথা এনে ফেলচো কেন ? তাঁদের পুরুষার্থ, তোমার আমার এখানকার অল্পশক্তি-বিশিষ্ট মানুষের পুরুষার্থ নয়,—তাঁদের সিদ্ধির জীবন, —অন্ততঃ ঐ সকল মহাপুরুষ যোগধর্ম্মের অধিকারে যাঁরা আদর্শ এবং ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক, তাঁদের জীবনকে নিশ্চয়ই বিশেষ স্থান দিতে হবে। এই সকল বচন রাজেনদার মুখ থেকে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফটিকদার মাথাটি নীচু হইয়া গেল এবং ম্লান হইল, তাঁর মুখখানি যা দেখিয়া রাজেনদাও স্থির হইয়া যা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আর বলিতেই পারিলেন না। তিনি আবার ফটিকদাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন,—

—দেখ ফটিক, আসলে তুমি যোগমার্গের মানুষ নও ; তোমার মন, বুদ্ধির গঠন বা অন্তরের উপাদান ভক্তির। তোমার স্ত্রীর দেহত্যাগের পর তুমি বিষয় ছাড়তে পারোনি সংসারে একমাত্র তুমিই কর্ণধার বলে, কাজেই ঐ ভক্তি নিয়েই তোমায় থাকতে হবে। তার মানে, —এটা ঠিক নয় যদি মনে করে থাকো যে আজ এখানে যোগের কথা চলচে বোলে যোগ-টাই উচ্চ আর ভক্তি-ভাব যা তোমার অধিকার সেটা নীচু, তা হলে আমি বলব ওটা তোমার অহঙ্কারের বিকৃতি। অধ্যাত্ম রাজ্যের যা কিছু, কোনটাই কোনটার সঙ্গে তুলনা করার নয়, ছোট বড় এ সকল অধ্যাত্ম-দর্শন রাজ্যে হেয় কথা। ভেবে দেখো তোমার মনের জগৎ আর একজনের সঙ্গে এক নয়। প্রত্যেক মানুষের ভাবই আলাদা, শুধু চেহারা নয়, গড়ন রং রূপেও সবাই আলাদা। এখানে ভুলেও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের প্রশ্ন এলো না। যদি একান্তই বিচার না করে থাকতে না পারো তা হলে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথাটা নাও। তিনিই বলেছেন, ভগবানে বিশ্বাসহীন, ভক্তিহীন জীবই নিকৃষ্ট, তার যতই ধন-জন নানা গুণ থাক না কেন,—আর যার সেটা আছে সেই শ্রেষ্ঠ। যখন তোমার ভক্তি আছে, তাঁতে বিশ্বাসও আছে, তখন নাই বা হোলো তোমার যোগশাস্ত্রে প্রবেশ,—তোমার এতে ভাবনারই কি আছে ?

এবার কথাটা তাঁর মনের মত হওয়ায় ফটিকদা স্থির হইয়া গেলেন ! রাজেনদা যা বলিতেছিলেন তা বলিতে লাগিলেন।—গার্গী ব্রহ্মবাদিনী, সেটা কি, কি ভাবের মানুষটা ? তাঁর এই যে অধিকার, কতটা গভীর যোগসাধনার ফলে হয়েছিল, তা শুনলে এখনকার দিনে অবাক হবারই কথা। কারণ তখনকার দিনে নর-নারীর সম্বন্ধ যে ভাবের ছিল সে আমরা ধারণাই করতে পারবো না।—উপনিষদের ইঙ্গিত আছে—কিন্তু সেদিকের সাধারণের লক্ষ্যই নেই। পুরুষেরা তখন নারীর স্বামী হয়ে এখনকার মত তাদের তাঁবেদার হিসাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেনি। সংসারে প্রয়োজনীয় বস্তু নারীও সংগ্রহ করতো, সংসারের দায়িত্ব নরনারী সমান অংশেই ঘাড়ে নিতে কোন সঙ্কোচ ছিল না। ধর্ম্ম এতটা কুসংস্কারের প্রভাবমুক্ত ছিল যে, স্বামীর ধর্ম্ম স্ত্রীর কাছে সহজ না হলে স্বচ্ছন্দে তার মনো-

মত ধর্ম্মের আচার পালনে কোন বাধাই ছিল না। এই যোগধর্ম্ম তখনকার দিনে সাধারণের মধ্যে তত প্রচার ছিল না, বিশেষতঃ জপ-যোগের সহজতম প্রণালী একেবারে প্রথম ধাপ বলেই প্রচলিত, শিব যখন এই সহজ প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন, বহুকাল পরে আর্য্য-ঋষিরা এর আশ্চর্য্য উপকারিতা বুঝতে পেরে তবে গ্রহণ করেছিলেন। আজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর ধরে এই প্রণালীর কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয়ে এসেছে, কিন্তু আমাদের অন্যায় সংস্কারের কথাই ছেড়ে দিচ্ছি, ব্রাহ্মণের ঘরেই এর প্রতি উপেক্ষার অন্ত নেই।

ফটিকদা প্রতিবাদ করিলেন, উপেক্ষা বলতে পারো না। রাজেনদা বলিলেন, তবে কি বলবো? অক্ষমতা? ফটিকদা তবুও বলিলেন,—আমাদের ঘরে উপনয়নের সময় থেকেই আমরা জপ শিখি তো।—

– কিছুই শেখো না, যখন গায়ত্রী মন্ত্র পাও তখন কি ভাবে পেয়েছিলে? মানে ব্যাখ্যার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, জপের প্রাথমিক নিয়ম যে মাত্র, সে মাত্রার সঙ্গে জপের প্রকরণ ভট্টাচার্য্য শিখিয়েছিলেন কি? ছন্দজ্ঞান না থাকলে গায়ত্রী মন্ত্র জপ কি ভাবে আরম্ভ করবে, জপের ফলই বা পাবে? জপে অধিকার কোথা? হড়বড় করে শব্দগুলি উচ্চারণ করে গেলেই হোলো কি? সেকালে গুরু কিংবা গুরুস্থানীয় কারো কাছে, উপনয়নের পূর্ব্বে জপের নিয়ম ও ছন্দ প্রকরণ শিখতে হোত। আমাদের উপনয়নের আগেও দেখেছি, ঠাকুর মশাই না, ঐ মন্ত্র কেবল ওকার বাদ দিয়ে সমস্ত মন্ত্রটি মুখস্থ করিয়েছেন। তবে ছন্দ জ্ঞান তাদেরও ছিল না বোধ হয়, কারণ জপের ধারাটি শেখাতে পারেননি। দ্বাদশ অথবা দশ-বার মাত্র জপ করলেই হোলো,—খুব বেশী তো একশো আটবার জপ, তাহলেই হোলো, এই তো শিক্ষা, এতে কি করে জপের উপকারিতা সে বুঝবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি ফটিকদার মুখের দিকে দেখিলেন তারপর বলিলেন, কি ভাবচ ফটিক?

—ভাবচি, আগাগোড়াই তাহলে ভুল শিখেচি বলো?

—ভুল বলতে চাও বলো, উপনয়নের সময় ভুল বা গোলেমালে চণ্ডীপাঠ যা হয় একটা হোলো বটে কিন্তু দীক্ষার সময় তো সে গোলমাল হবে না? ফটিকদা বলিলেন, সে তো মন্ত্রই আলাদা। সহজ উচ্চারণ, সংখ্যা ধরে জপের নিয়ম। রাজেনদা বলিলেন, উপনয়নের সময় যে গায়ত্রী জপ সেইটিই কঠিন,—আর জেনে রাখো গায়ত্রী জপ যদি বিশুদ্ধভাবে করা যায় তাহলেই সব কাজ হয়ে যায়, তাহলেই ইষ্টলাভ অবশ্যম্ভাবী। শুনে ফটিকদা বলিল, উঃ—আমরা এতকাল যা করলাম তার কি হোলো? হায় ভগবান—রাজেনদার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে এতদিন আমাদের যে উপনয়ন সংস্কার হয়ে এসেছে, তার মধ্যে সন্ধ্যাহ্নিক না হয় ভাল করে মুখস্থ করলেই হয়ে যায়, কিন্তু ঐ গায়ত্রী জপের বেলায় তো সবারই ভুল শেখা হয়?

—তা তো হয়,—কারণ শেখাবে কে? যদি বলি সেটা অর্থাৎ প্রকরণটা তার জানা

নেই যে শেখাবে, তা হলে কি রকম শোনায় ? এখন উপনয়ন সংস্কারটা তো আগাগোড়াই ফাঁকি, ছেলেরা যে ফাঁকি দেবে এ তো জানা কথা, ইংরাজী হলেও ভাল মুখস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, বাঙ্গলা মন্ত্র হলেও বা কথা ছিল, কিন্তু ক'টা ছেলে ঐ বেদের ভাষাটা—শুদ্ধ উচ্চারণটা ছেড়েই দিচ্চি—অশুদ্ধ উচ্চারণ করেও সবটা মুখস্থ করে ?—তারপর নিয়ম করে এক বৎসর করার গৌরব, ব্যাস, তারপর না কর দোষ নেই এই মনোভাবটাই কি সব কাজটার উপর ভস্মে ঘি ঢালা নয় ? এই যে উপনয়ন, এটা কি সংস্কার ? বিধিমত যদি না হয়ে এইভাবেই হয়ে থাকে, তাহলে ফলে ভণ্ডভাবেই দক্ষ হতে থাকবে না বংশধরেরা ? দ্বিজ ব্রাহ্মণ, এ সকল কথার অর্থ হয় কি, এই কি দ্বিতীয় জন্ম ?

এখন রাজেনদার এখান থেকে আমায় উঠিতে হইবে, যদিও এখানকার এই সং আলোচনা আমার অনাবশ্যক বা বাজে কথা মনে হয় নাই। বিশেষতঃ যখন যোগী যাজ্ঞবল্ক্য হইতে প্রথমেই কথা শুরু হইয়াছিল তখন আশা করিয়াছিলাম অনেই কিছুই,—ভাবিয়াছিলাম আজ এখানে বিশেষ কিছু পাওয়া যাইবে। শুধু ফটিকদার অসঙ্গত প্রশ্নেই ভালো করিয়া প্রসঙ্গটা হইতে দিল না। যাই হোক, এখন প্রাণটা বাবা মুক্তিনাথের পানেই টানিতেছে।

—আজ তাহলে আসি বলিয়াই রাজেনদাকে নমস্কার পূর্ব্বক উঠিলাম আর বাবা মুক্তিনাথের আশ্রমের পথেই চলিলাম। ফটিকদা এখানেই রহিলেন, কি জানি কেন মুক্তিনাথের উপর তাঁর শ্রদ্ধা নাই।

সন্ধ্যায় দীপ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিনাথের ঘরের সামনে উপস্থিত,—ভাগ্যে তিনি ঘরেই ছিলেন। ভিতরে যাবার আগেই ভেজানো দরজায় টোকা দিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাহিরে আসিলেন, কে ? প্রমোদ ? সঙ্গে সঙ্গে আমায় দেখিয়া আনন্দে আহ্বান করিলেন, এসো, তোমাকেই আমি আজ আশা করছিলাম। এসো, বোসো। আমি প্রণাম পূর্ব্বক প্রবেশ এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই উপবেশন করিলাম।

—তুমি,—তুমি কি জানতে আমি একবার তোমাকে দেখবার জন্য বড়ই ছটফট করছিলাম। তুমি আমার কথা ইতিমধ্যে স্মরণ করেছিলে কি ?

—আজ সকালে একবার মাত্র আপনার কথা প্রবলভাবেই আমার মনে হয়েছিল ; এই বলিয়াই আমি আমার স্ত্রীসংক্রান্ত কথা, কেশবানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা লইয়া বেশ নিজের পথ ধরিয়াছেন, মাত্র এই কথাটুকু বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, শোনো, তোমার স্ত্রী ভাগ্যবতী, নিজের পথ করে নিয়েছেন, সুখের কথা,—তোমারও তাতে সুবিধা এই হোলো যে, তোমার উপর তাঁর দমটা খানিক হালকা হোলো। এখন তার মন যতটা ঐ দিকে থাকে ততই ভালো। এদিকে তোমার চারদিক ঘুরে যা কিছু দেখে-শুনে করে-কর্ম্মে নেবার সুবিধাই হবে, তারপর যখন চরম টান আসবে তখন তো আর কথাই নেই—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চবম টান বললেন—কার চরম টান? তিনি বলিলেন, যার ঐ বিভক্ত টানের সুযোগে এখন নিজের মনোমত পথে যেতে পারচো, সোজা কথায় তোমায় যেতে দিচ্ছে, তারই টান তো। আমি বলিলাম, আপনি কি আশঙ্কা করেন ভবিষ্যতে তার কাছ থেকেই আবার টান আসতে পাবে যাতে আমায় আবার সাধারণ সংসারীর মত সংসার করতে হবে স্ত্রী নিয়ে? তিনি বলিলেন, ও সব ভবিষ্যতেব কথা এখন থাক—বর্ত্তমানে আমি যে তোমায় খুঁজেছিলাম সেই কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে যে, সেটা শুনবে না?—আমি তোমাদের কাছে বিদায় চাইচি, আমাব কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, এখন এখানকাব কাজ সেরে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

আমি কিছুই বলিলাম না, চুপ করিয়াই রহিলাম। তাই দেখিয়া তিনি পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া একখানা মোটা একসারসাইজ খাতা বা বই বাহিব কবিলেন এবং শুধাইলেন, এটা কি দেখেছ? বলিলাম, একদিন, একবাব একটু দেখিয়েছিলেন।

তিনি বলিলেন, আজ আমি আবার তোমায় এটা দেখাচ্চি,—এখন এটাকে ছাপাতে চাই, এই বইখানাই হবে আমাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। তুমি বইখানা ছাপানোর বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পাববে? আমি বলিলাম, বর্ত্তমান অবস্থায় ওটা আমাব পক্ষে সম্ভব হবে কি? তিনি বলিলেন, আমি এটা চাই না যে তুমি বইখানা নিযে ঘুবে প্রেসের অধিকাবীদের সঙ্গে অথবা প্রকাশকদের দবজায মাথা ফাটাফাটি করো—কেউ বলবে কাটছাট করে আনো, কেউ বলবে নেবো না—এই সব নিয়ে মাথা ঘামাতে বলিনি। ঐ বিষ্টু আর সুশীল, দুজনে সব কাজ করবার ভাব নিয়েছে, এখন চাই টাকা, তুমি কিছু টাকা যোগাড় করে দাও না, বইখানা ছাপানো হয়ে যাক—দেখবে কি রকম শীঘ্র শীঘ্র একটা এডিশান শেষ হয়ে যাবে। আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে, আমি টাকা কোথায় যোগাড় করতে যাবো?

ওস্তাদ মানুষ,—আমি হাঁ করিতেই তিনি বলিলেন, আহা, তোমায় আমি বলবো কেন, তোমার বড়লোক বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁদের দিয়েও তো কিছু করতে পারো? ভাবিলাম, দেনেওয়ালা বড়লোক বন্ধু কে আছেন—হাতের কাছে—এক মদনমোহন আব চুনীলাল বর্ম্মণ আছেন—বলিলাম, আচ্ছা চেষ্টা করবো। শেষে মদনের কাছে একশো, চুনীলালের কাছে একশো,—এই দুশো টাকার যোগাড় হইয়াছিল। তারা যথার্থই সুকৃতিবান, এভাবের কাজ তাদের অনেক করতে হয়। তারপর বইখানি শেষ পর্য্যন্ত ছাপা হয়েছিল কিনা জানি না। তিনি তিন মাসের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। যাই হোক এখন উঠে আসবার আগে—তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ স্ত্রীর সম্বন্ধে কথাটা। সেইটাই আমার প্রয়োজন, শেষ করিতেই হইবে, অর্থাৎ তিনি যেটা চাপা দিয়াছিলেন এখন সেটা খুলিতেই হইবে। তিনি বলিলেন,—এখন কেবল এইটুকুই ভালমতে জেনে রাখো; স্বামী কেশবানন্দ

তোমার একজন বড় বন্ধুর কাজ করেছেন। কি করে জানলেন? ঐ যে তুমিই বললে, তোমার স্ত্রীকে ইতিমধ্যে দীক্ষা দিয়েছেন। হাঁ, তাই তো শুনেছি তাঁর কাছে। মুক্তিনাথ বাবা বলিলেন, ঠিক পরম বন্ধুর কাজই করেছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারোনি ঠিক, তাই এখনও এ বিষয়ে মনস্থির হচ্চে না। এখন তাহলে খুলেই বলি। তোমার মত একজন বিবাহিত, যুবতী স্ত্রী ফেলে যদি ইষ্টানুসন্ধানে যায়, তার মানে কি জানো? এটা তোমরা তো ভাবতেই পার না, আর আমরাও তোমাদেরই মুখ চেয়েই খুলে কিছু বলতেও পারি না। আসলে বিশ্বপ্রকৃতি, যিনি জগদম্বা, তাঁর বিধিবদ্ধ যে নিয়মে এই সৃষ্টিটা জলের মত চলচে সেটা যদি ভাষায় প্রকাশ করতে হয় তাহলে এই দাঁড়ায় যে, আত্মবিস্মৃত জীবব্রহ্ম, এই সংসার ক্ষেত্রে এসে পড়লে তিনি চান যে ভোগবন্ধনের সুখটা যাতে অটুট থাকে। কারণ জীবের ঐ যে যৌবনে সর্ব্ববিধ ভোগের প্রাপ্তিতে যে আনন্দ তাতে তার প্রাপ্য অংশও কম নয়, অর্থাৎ ওতে তাঁরও ভাগ আছে, অর্থাৎ জীবের সুখে তাঁরও সুখ। সেই জন্য তাঁর প্রধান কর্ম্ম এটাই থাকে, জীবের ভোগ্য বস্তুর যোগাযোগ ঘটানো। ঐ যোগানটা ঠিক থাকাতে তাঁর সংসারসৃষ্টি চলচে ভালো। বুঝেছ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর বলিলেন, এখন এর মধ্যে কেউ যে ভোগের এমন মিষ্ট রস উপেক্ষা করে ত্যাগের পথে, বৈরাগ্যের দিকে লক্ষ্য করবে এটা মহামায়া চান না। মহামায়া বলতে আমি তাঁকেই বলছি যিনি মহামায়া, ভোগে আবদ্ধ করে এখনকার সুখেই চমৎকার এই ভোগের কারখানায়, যার নাম হল আবর্ত্ত তাইতেই আটকে বেখে দিয়েছেন জীবকে। কতটা উন্নত বুদ্ধি হলে তবেই না বুঝতে পারে যে, এসব কর্ম্ম আর ভোগের খেলা সবটাই ভুয়ো! এখন এই ভোগের অধিকারে প্রত্যেক নারী-শরীরধারিণীর মধ্যে জগদম্বার ঐ ইচ্ছা, শক্তি হয়ে চমৎকার ক্রিয়া করচে। বিষাক্ত সাপের বিষ-দাঁতের গোড়ায় বিষপূর্ণ যে পুঁটলি থাকে, সেটা এমন সহজ ভাবেই দেওয়া আছে যাতে যথাকালে ঠিক ব্যবহার করতে পারে; সেইমত ঐশ্বর্য্যময়ী যৌবনোদ্গমে অর্থাৎ সৃষ্টিমুখী অন্তঃশক্তি বিকাশের কালে, তাঁরা অকপটে যাতে ঐ শক্তি ব্যবহার করতে পারেন সে ব্যবস্থা সুচারু ভাবেই তাঁদের প্রকৃতিতে বিধিবদ্ধ আছে;—এসকল ব্যবহার মা-লক্ষ্মী বা ক্ষুদে জগদম্বাদের শেখাতে হয় না,—এতে তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধা। এইভাবেই মহামায়ার খেলাটা ঠিক চলতে থাকে;—কেমন, এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝেচো তো?

বুঝেছিলাম ঠিকই। সেটা বুঝিয়া গুরু আমায় বলিলেন, তাহলে শেষটুকু বুঝতেই বা অসুবিধা কি? আমি বলিলাম, কিছুই নয়। এবার তিনি একটু হাসিয়াই বলিলেন, অপ্রসন্ন হলে? এটা কি তোমাদের হাতে? এই সংসারে ঐ ক্ষুদে জগদম্বারাই তো বলতে গেলে এই জগতের সকল কিছুই চালাচ্ছেন। যখন তোমার হাঁড়িতে তিনি চাল দিয়ে তোমায় কৃতজ্ঞতা-সূত্রে অথবা কর্ত্তব্যের কাছিতে বেঁধেছেন তখন তুমি বৃন্দাবনেই যাও

অথবা ক্যালিফরনিয়া ষ্টেটের কোন দানবাকৃতি গাছের কোটরের মধ্যে গিয়ে ওঠো, আসলে তাতে তাঁর কিছুই এসে যাচ্চে না, যথাসময়ে তোমায় পেলেই হোলো। এখন সময়টা নিয়ে কথা, তারই নাম লগন।

শুনিয়া আমার বাক্যালোপ হইল। এমনই একটা গ্লানি ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল যাহাতে বাবাকে বলিতে হইল,—প্রমোদ, তুমি আমাকেও টলাচ্চ। এখন তুমি কেন এটাকে এতটা বড় করে দেখছো, হয়তো যা বললাম তা তোমাকে কোন ক্ষতিই করবে না। আমার সব কথা এখনও বলা হয়নি। শেষটুকু শুনে অন্ততঃ আমায় রেহাই দাও। বলিলাম, শেষ করুন আপনি, সবটুকুই শোনা হোক।

তখন তিনি বলিলেন,—আগে যখন এ সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল তখন এক-রকম, এখন বয়সে বিবাহের ফলে মহামায়ারা অনেকটা অগ্রসর হয়েই সংসারে নামেন। তবুও তাঁর জীবন-সঙ্গীর ধাত বুঝতে কিছু দিন যায় বৈকি। তারপর তাঁর বিধিদত্ত শক্তি প্রয়োগের কাল আসে, যদি সহজেই পটকে ফেলতে পারলেন, তাহলে তো কোন কথাই নেই, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ,—এইটাই মটো দাড়িয়ে গেল,—জগদম্বা বা জগদ্ধাত্রী অথবা আদ্যাশক্তিও সহায় হয়ে গেলেন,—উদ্যোগীনং পুরুষসিংহ হয়ে লক্ষ্মীলাভের জন্য তপস্যার সব কিছুই আরম্ভ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় ক্ষুদ্র মহামায়ার শক্তি তেমন কাজ করচে না,—তাঁদের যা কিছু অস্ত্র বৃথা প্রযুক্ত হয়েছে,—তখন একটা গভীর চিন্তার ব্যাপার ঘটে যায়। যাকে ধরে তার জীবন-যৌবন সার্থক হবার কথা তার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়ে বিপরীত ব্যাপার ঘটচে, জীবন তরীর কর্ণধার বাগে আসচে না,—তখন তাঁরও বাঁকবার সম্ভাবনা থাকে, যদি কোন লেফটিষ্ট সহায় পাওয়া যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতরে থেকে। কিন্তু এখানে প্রকৃতি দু'রকম আছে,—ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায়, বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি ভেদে দুই প্রকার জানো তো, এখন এটাও বুঝে নেও। ঐ দুই ভেদ আদ্যাশক্তির দ্বিতীয় স্তরেও আছে সেটা জানো তো? দক্ষিণা কালী, আর বামা কালী, দুই শক্তির ক্রিয়া-ভেদ অবশ্যম্ভাবী।

আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, কতক্ষণ পর আবার শুনিতে পাইলাম তাঁর কথা,—কেশবা-নন্দ তোমার বন্ধু, কাজেই তাঁকে ঠিক পথটা ধরিয়ে দিলেন যাতে বামাচারের ভয়টা রইলো না,—অবশ্য জগদম্বার নিজ প্রকৃতিই তাঁকে দক্ষিণা মার্গে যেতে সাহায্য করবে,—অর্থাৎ তাঁকে কিছু দীর্ঘকাল ক্রিয়াবিশেষে মগ্ন রাখবে যতদিন না তাঁর প্রাণ-বান্ধব মহাযোগী শিব-শঙ্কর এসে তাঁর দ্বারে উপস্থিত হন, ভিক্ষাং দেহি বোলে ভিক্ষা পাত্র হাতে।

বলিলাম, এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন তাঁরা বলেন নারী একরকমই হয়। দক্ষিণা বামা, আপনি যা বললেন, শক্তি ভেদে বিদ্যা ও অবিদ্যা ওসব বাজে কথা,—তারা সুযোগের অভাবেই সতী থাকতে পারে—

আঃ হা-হা-হা—জানি, জানি, ও একটা সিদ্ধান্ত আছে, তার জন্মস্থান বিদেশে, যে ভূমিতে তুমি-আমি জন্মেচি সেখানকার কথা নয়। খাইবার পাস থেকে বরাবর চলে যাও, পুরানো আফ্রিকাটা বাদ, যতো যতো সভ্য ভূমি আছে—এমন কি আতলান্ত পার হয়েও সমগ্র নয়া জগৎ পর্য্যন্ত। তাদের ঐ সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য হতে পারবেই না, তাদের দাম্ভিক সভ্যতার দান ঐ তত্ত্বটি। চুলোয় যাক তাদের সিদ্ধান্তের কথা,—আমাদের সংস্কারের কথাই আলাদা। আমাদের শক্তির দ্বৈত খেলা, ঐ একরকম আছে যারা দেহসর্ব্বস্ব, দেহের রূপ, দেহের ভোগ, দেহের সুখ, আত্মসুখসর্ব্বস্ব,—ওটি ছাড়িয়ে ভাব-রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ, নিজ স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে বুদ্ধি যেতে চায় না যাদের, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই তারা তো আজও বলবৎ, দেখো না চেয়ে তোমার আশেপাশে। আর একরকম আছে, তাদের ভাব বড়, বুদ্ধি ও অনুভব সহজ, ধৈর্য্য স্থৈর্য্য পরার্থপরতা তার জীবনের সঙ্গে সহজ হয়ে আছে,—যৌবনে আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তিও তাদের সহজ রকম। আমি শুধাইলাম, আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তিও রকমারী আছে নাকি?

নিশ্চয়, ঐ আত্মসমর্পণের রকম নিয়েই তো ব্যাপার,—একরকম আছে তার কাছে আত্মসমর্পণ,—একেবারেই উৎসর্গ, দ্বিতীয় আত্মসমর্পণ হোলো,—হ্যাঁ আমি তাকে দেবো বৈকি, কিন্তু কতটা পাবো সেটা না জেনে, তার সম্ভাবনা অন্ততঃ আভাসে খানিকটা না বুঝেই বা কি করে দিই, আমার সব সাধ পূর্ণ হবার কতটা সম্ভাবনা, বিবাহ ঘটে গেলেও তার সঙ্গে কতটা মিলন—প্রাণের মিলন ঘটে,—এ সব কি তোমায় আবার খুলে খুঁটিনাটি দেখাতে হবে?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার ধীরে ধীরেই বলিতেছেন,—

ঐ দ্বিতীয় প্রকারের আত্মসমর্পণের নাম বুদ্ধিপূর্ব্বক আদানপ্রদান, এটাই খুব বেশীর ভাগের মধ্যে, তাদের মধ্যে ভালবাসা প্রেম এটা থাকে গৌণ, কামনা নিবৃত্তি, সাধপূর্ণ, কামনা-প্রধান জীবনই তো মুখ্য হয়ে থাকে। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না হলে প্রেমের স্থান হওয়া মুশকিল, এখানে রূপ গুণ সবই গৌণ হয়ে যায়। সেই বিদ্যাশক্তির আত্মসমর্পণ আর অবিদ্যাশক্তির আত্মসমর্পণে এতটাই প্রভেদ আসে। এতে দুর্ভাবনা কিছু নেই, চক্ষু দুটি তোমার একেবারে নারীর উপরে আবদ্ধ রাখলে ঐ রকম দেখে আক্ষেপ আসবে, তাই বলি তোমার ঐ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ওখান থেকে তুলে নিয়ে একবার তোমার স্বজাতি পুরুষের উপরে ফেলো, কি দেখবে বলো তো বাপ?

বলতে বাধ্য হলাম, সেখানেও তো ঐ কথা;—নারীর সতীত্ব সবাই চায়, ঠিক যেন পুরুষের সতীত্বটা তার ধর্ম্মের অন্তর্গত নয়। বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—ওটাও সবটা নয়, আসলে মন বুদ্ধি আর প্রবৃত্তির গড়ন নিয়েই কথা। পুরুষের মধ্যেও তো প্রবৃত্তির ভেদ আছে, প্রকৃতির সৃষ্টিতে নারীর মধ্যেও অবিকল না হোক প্রায়ই ঐ ভেদ বর্ত্তমান।

—প্রায় বলচেন কেন, সম্পূর্ণ ই বা নয় কেন ?

—সেটাও প্রকৃত ব্যাপার যে, পুরুষ বাঘ, সিংহ কুকুর এসব দেখেছো তো ? সদ্যপ্রসূত শাবক সন্ধান করে, দেখলেই তাকে ভোজনে আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি তার,—কিন্তু বাঘিনী, সিংহী, কুকুরী এমন কৌশলে বাচ্চাকে রাখবে যে মদ্দারা কিছুতেই পাত্তা পায় না। এতে কি প্রমাণ করে না, দুটোর মধ্যে মন-বুদ্ধির মৌলিক পার্থক্য আছে। তার পর অপর-দিকে দেখো, যৌবন-ধর্ম্মে পুরুষের প্রেমের ব্যতিক্রম, এক নারীর বন্ধন অপর এক নারীর প্রতি আসক্তির বশে অনায়াসেই কেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার পর আবার ঐ ভাবের পুনরা-বৃত্তি পুরুষের স্বভাবের সঙ্গে কতকটা সহজ হয়ে থাকে। আসলে মহামায়ার মায়ার ব্যাপারে নারীই শক্তিশালিনী, যদিও পুরুষের মধ্যে শক্তির আস্ফালন, বিক্রম, দম্ভ, এ সব কতো বেশী। গায়ের জোরটা যে শক্তির মোটা, স্থূল প্রকাশ,—তাতে পুরুষই প্রবল কিন্তু সৃষ্টি ধারণ ও রক্ষায়, শক্তির ব্যবহারে, সূক্ষ্ম শক্তির সঞ্চারণায় নারীই অগ্রগামিনী, অথচ কি চমৎকার দম্ভশূন্য নিরহংকারা, যার বাইরের রূপটা দুর্ব্বল, যেন অসহায়ের মত দেখায় না কি ?

এর পর আমার একটি প্রশ্ন রহিল, সেটি বলিয়াও ফেলিলাম,—তাহলে আপনিও ঠিক ধরে নিয়েছেন আমি ফিরে এসে আবার ঘরসংসার করবো ? তিনি বলিলেন, রাম, রাম, তা মনে করবো কেন ? আমার মনে করার উপর তো এটা নির্ভর করছে না ?

—কিসের উপরে এটা নির্ভর করচে সেটা আমার জানবার দরকার আছে বলে যদি মনে করেন তো বলবেন ? তিনি বলিলেন, আমি বলি আর নাই বলি, তাতেও কিছু এসে যায় না। আসলে তোমার প্রাপ্তি, তোমার সিদ্ধির উপর নির্ভর করচে, তুমি কতদূর যাবে। তোমার দৌড় নিয়েই কথা। ঐ পথের দৌড় নিয়ে কথা। তোমার সিদ্ধি হলে তাঁরও সিদ্ধি নিশ্চিত, তিনি যদি তোমাতে যথার্থ ই অনুরক্ত থাকেন। আর তা না হলে যতটা উচ্চগতি সম্ভব এ যাত্রায় ততটা পৌঁছে আবার নামতে হবে বৈকি সেইটুকুই পুঁজি করে। এ যাত্রায় প্রারব্ধের প্রভাবেই কর্ম্মক্ষেত্রে যেটা বাকী আছে সেইটুকু শেষ করতে তোমার উমের ভোর কেটে যেতে পারে। তবে প্রাপ্তি তোমার কিছু আছেই এ বিষয়ে যেমন আমার কোন সন্দেহই নেই, তোমারও কোন সংশয় নেই। তারপর তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার আছে এ বিষয়েও কোন সংশয় নেই আমার। তার মানে এ নয় বা একথা বুঝো না যেন সাধারণে যেমন সংসার করে সেরকম একটা কিছু, অসাধারণও হতে পারে।

—সে আবার কি রকম ? তিনি বলিলেন, পাগল হরনাথ বাবার নাম শুনেছ ?

—নিশ্চয়ই। তিনি তো সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, আমাদের দেশে তাঁর নাম প্রায় সবাই তো শুনেছে।

মুক্তিনাথ বলিলেন, তিনিও তো সংসারী ছিলেন, সন্তান ছিল, মেয়ে-জামাই ইত্যাদি

ছিল তো? অসাধারণ নয় কি? এখানে দৃষ্টান্ত সব রকমই আছে, যেটা চাও,—কোন-দিকে কিছুরই অভাব নেই।

এই অদ্বৈত ব্রহ্মের অণ্ডমধ্যে সবই অস্তি, নাস্তি শব্দটা এখানে অজ্ঞাত। এরপর জয় জয় বলিয়া প্রণামান্তর আমি উঠিলাম। মুক্তিনাথের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নাই। এ জীবনে তাঁর সঙ্গে এই শেষ দেখা।

এর পরেই আর কলকাতায় নয়, আমি এলাহাবাদে মাসিমার ঘরেই উপস্থিত হইলাম। ওখানেও আমাব একটি প্রিয় আড্ডা আছে। এবারে কিন্তু গঙ্গাতীরে যোগী সাধু অনুসন্ধানই হইল মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রিয়জনের আড্ডায় অনুপস্থিত বহিলাম।

৭

পুনর্জন্মবাদের নিষ্ফলতা

এলাহাবাদ কর্নেলগঞ্জে তখন বাঙ্গালীদের বেশ বড একটা কলোনীর মতই ছিল এবং এখনও আছে, বরং বিস্তৃত হইয়াছে। কর্নেলগঞ্জটা পার হইয়া লরেন্সগঞ্জেও অনেক বাঙ্গালীব বাস। সেখানে জস্টিস প্রমোদাচরণের বিখ্যাত বাঙ্গলা। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর কাছেই খবর পাওয়া গেল সেখানে ব্রজেন্দ্র শীল মশাই আসিয়াছেন, আরও সব কে কে আছেন। রাজপুতানা, জয়পুর থেকে ব্রহ্মচেতন আসিয়াছেন। জানিতাম তখন অতুল সেন, কনেলগঞ্জেব অতুলদাও—ছিলেন, তিনি এবং আমাদের উভয়তই পরিচিত এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির দুজন বাঙ্গালী প্রোফেসর, তাঁহারা সবাই একায় উঠিয়াছেন, আমি গিয়া উপস্থিত, দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গেই এসো।

বৈঠকখানায় ফরাস পাতা, পূর্ব্ব দিকে দেয়াল ঘেঁষে যিনি বসিয়া আছেন তাঁকে স্বামীজী বলিব কিম্বা ব্রহ্মচেতনবাবু বলিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কারণ পোশাক দেখিয়া ধাঁধা লাগে। অদ্ভুত মূর্ত্তি,—সন্ন্যাসী কি গৃহী কিছুই ঠিক করা যায় না। বর্ণ তাঁর রক্তাভ, গৌর, স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর, লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, মাথাটা খুবই বড় শরীরের তুলনায়, রুক্ষ কোঁকড়ানো চুলের বোঝা নয়, ছাঁটা, বেশ পাট আছে। একটা সেকসপীয়র কলারওয়ালা টুইল সার্ট, গলায় বোতাম নেই, গলার সঙ্গে বুকের কতকটা হাউ হাউ করছে, হাতেরও বোতাম নেই। লোকটি অতিরিক্ত রকম তাম্বুল-বিলাসী, মুখে পান, দুই কস বেয়ে তার ধারা,—শ্রীঅরবিন্দের মত খানিক ছোটখাটো দাড়ি, কাঁচা-পাকা তবে গোঁফের মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। তা থাক, কিন্তু সামনের দাঁত উঁচু অধরোষ্ঠে ঢাকা থাকলেও মনে হয় সব সময়েই যেন হাসছেন, চক্ষু দুটি তীক্ষ্ণ মানানসই এবং উজ্জ্বল জ্রযুগ কুচকুচে কালো—এই রকমই এক মূর্ত্তি বরাসনে, আর তাঁহাকে তিনদিকে

ঘিবিযা আছেন জন দশ বাবো বা পনেবোজন, তার মধ্যে সম্ভ্রান্ত স্যাব প্রমোদচবণ একটি ইজিচেযাবে বসিযা আছেন। আবও আছেন বামানন্দবাবু, যিনি তখন কাযস্থ পাঠশালার প্রিনসিপ্যাল ছিলেন। তিনি ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল মশাই দুজনে ঘনিষ্ঠ ভাবেই কথা



কহিতেছিলেন চুপিচুপি, তাছাড়া তালতলাব নাহাব ফ্যামিলিব পুবাণচাঁদ নাহাব মহাশয়ও আছেন, আব অতুলদা তো আছেনই। আব যাঁবা তাহাদেব আমি চিনি না। না চিনিলেও তাঁবা যে বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতে আব সন্দেহেব অবকাশ নাই। জজসাহেবেব বড ছেলে ললিতমোহনও ওখানে আছেন, একটি তাকিযাব ওপব গোঁতা মেবে ফবাসেব ওপর আধশোযা উপুড হযে বসা। পিন্ ড্রপ সাইলেন্স যাকে বলে, সেইভাবের নিস্তব্ধতা বিরাজ কবিতেছে সেখানে—যখন আমবা প্রবেশ কবিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয এই যে, আমাদের দিকে কেহ চাহিযাও দেখিলেন না। আমাব পরিচিত তাব মধ্যে চারজন ছিলেন—তাঁবাও দেখিলেন বলিযাও মনে হইল না। সে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—ঠিক যেন ভূতুড়ে কাণ্ড। সবাই চুপচাপ, প্রায তিন চার মিনিট,—আমাদের আবির্ভাবের পব। আমার সামনেই স্থিব আসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তিটি, কাঁচাপাকা দাড়িতে একটি হাত মুষ্টিবদ্ধ, নিম্ন-দৃষ্টি, স্থিব, নিষ্কম্প দীপশিখাব মতই, এমন কি দেখিলাম তাঁর নিঃশ্বাসও যেন পড়িতেছে না। তিন-চার মিনিট পর শুনিলাম,—তিনি বলিলেন,—নাঃ, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

আগে এখানে কি কথা হইতেছিল তা তো জানি না,—তবে তাঁর এই নেতিবাচক শব্দ

শুনিয়াই একজন মাতব্বর বলিয়া উঠিলেন,—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, বলচেন ?

শুনিয়া তিনি আপন মনেই যেন বলিলেন,—না, না, কিছুই থাকে না, থাকতে পারেই না তাই থাকে না। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ—এই কথাই বলছি !

সবাই এবার আচার্য্য শীল মশাইয়ের দিকে তাকাইলেন—মনে হইল সবাই আশা করিতেছিল আচার্য্য নিশ্চয়ই প্রতিবাদ স্বরূপ কিছু-না-কিছু বলিবেন। রামানন্দবাবুও দেখিলাম আচার্য্যের দিকেই চাহিয়া আছেন। এটাও দেখিলাম যে তিনিও যেন চিন্তিত, কিন্তু নির্ব্বাকই রহিলেন। শেষে পুরাণচাঁদ নাহার মহাশয় যেন আর থাকিতে পারিলেন না, যদিও, তিনিও যেন আশা করিয়াছিলেন এ কাজটা অন্য কেউ করিবে। শান্ত, স্থির, বিচক্ষণ মানুষ, তার উপর তাঁরা জৈন, আবার হিন্দুশাস্ত্রেও ভাল রকম জ্ঞান আছে। অবশ্য একটু সঙ্কোচ প্রথমটা ছিল, কিন্তু বলিতে বলিতে সেটুকু কাটাইয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—

তাহলে শ্রীমৎভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নিজ মুখের উক্তি—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, ন—বা—নি

—সাট্ আপ ! তীব্র কণ্ঠে কথাটি, ঠিক যেন মহাপুরুষের ভিতর থেকে চাবুকের মতই অকস্মাৎ বাহিরে আসিয়া পড়িল ঐ সভার মধ্যে, তাহাতে শীল মশাই পর্য্যন্ত চমকিত হইলেন। তার পর সেই মহাভাগ বলিলেন,—ওসব শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রবোধ বচন। অজ্ঞান, অশান্ত চিত্ত সাধারণের মনে প্রত্যয় জন্মাতে—একটা অপরিচিত বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের কৌশলমাত্র। শুনিয়া নাহার মহাশয় ধীরে ধীরে বলিলেন,—

—আপনার কথাটা চার্ব্বাক দর্শনের সিদ্ধান্তের মতই মনে হচ্ছে,—ক্ষমা করবেন,—

ব্রহ্মচেতন এবার সবার চৈতন্যকে একটু নাড়া দিয়াই বলিলেন, সত্য হোলো ঐ মৃত্যুটি, —তারপরও আবার জীবনকে ধরে টানাটানি করা কেন ? জীবের অস্তিত্ব তারপরও আছে কিনা সেইটাই তো অনুসন্ধানের বিষয় ! তার কোন মীমাংসা হয়নি এ পর্য্যন্ত। আমি বলি কিছু থাকে না ;—তাতে আমায় চার্ব্বাক বলো আর যাই বলো না কেন।

এক্ষেত্রে দেখিলাম, পুরাণচাঁদবাবুই সাহস করিয়া নিজের কথাটা বলিতে পারিলেন। এবার তিনি বলিলেন,—সেটা তো অনুমানের কথা, আপনার ধরে নেওয়া—নয় কি ?

উত্তরে সাধু বলিলেন,—মরণের পর অস্তিত্বের কথাটা, যা ভগবানের মুখের কথা বলে বলছেন, সেটাও তো অনুমান, কল্পনায় একটা ধরে নেওয়া। যা কখনও প্রমাণিত হবে না, অন্ততঃ এখনও হয়নি তা সবই একটা ধরে নিয়েই তো চলছে। একটি সত্য উদ্ধার করতে প্রথম একটা ধরে নিয়েই খানিক যেতে হবে তো ?

আচার্য্য ব্রজেন্দ্র বলিলেন, যে-ক্রমে একটি সত্য উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হতে হয়, এঁরা —এই বলিয়া একবার নাহার মশাইয়ের দিকে ফিরিয়া,—আপনি তো জানেন, সেই

ভাবেই তো ভাবতে আর বিচার করতে হবে ? নাহার মশাইকে একটু সাহায্য করিতেই তিনি এটা বলিলেন মনে হইল। তারপর স্বামীর দন্তময় মুখের পানে চাহিয়া শুধাইলেন, কেমন, আপনি এইভাবেই তো বলতে চাইছেন, না ? তিনি কিছু বলিবার আগেই আবার পুরাণচাঁদবাবু বলিলেন,—ওটা যে ইউরোপীয়ান পদ্ধতি স্যার,—আমায় মাফ করবেন,—আমরা হিন্দু, আমাদের হিন্দুদর্শন, যার শেষ পরিণতি বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ঐ তাম্বুলবিলাসী ল্যালাখ্যাপা মানুষটি,—তিনি এদের কোন কথা শুনিলেন কিনা জানি না, তাঁর ভাবটা দেখিলাম, সেই দাড়ি মুঠোয ধরা, নিম্নদৃষ্টি, যেন এ রাজ্যের কেউ নয়।

আমার যিনি মুরব্বী, এবাব তিনি চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করে নাহার মশাইকে বলিলেন, আচার্য্য শীলের দিকে ইঙ্গিতে লক্ষ্য করে,—ইনিও কম বৈদান্তিক নন, আপনি কি একে চেনেন না ? এবার সেই অদ্ভুত মানুষটি বলিলেন,—ইউরোপ কি আমেরিকা কি এই ভারত, পৃথিবীব যে কোন দেশের মানুধ, যারা কোন তত্ত্ব নিযে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করে, তাদের উদ্দেশ্য সত্য উদ্ধার ব্যতীত আব কিছু থাকে নাকি !

পুরাণচাঁদবাবু চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, ওরা মেটিরিয়ালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সব কিছুই দেখে কিনা, তাই ওদেব পদ্ধতি আমাদেব সঙ্গে,—বাধা দিয়া এখন উত্তম পুরুষটি বলিলেন, একটি সত্য আগেই বিশ্বাস কবে নিয়েছেন তাই আজ এত ভণ্ডামি মিথ্যাচার হিন্দুসমাজে ভরে উঠচে,—মবণেব পর এত ভূতের উপদ্রব আপনাদের সহ্য করতে হয়, আবার জীবিত অবস্থায়ও কম সহ্য করতে হয় না সেই ভূতের উপদ্রব। আপনি যেভাবে মরণের পরও থাকবেন, বলুন তো সেটাব সম্বন্ধে কি রকম ধারণা ? কি প্রমাণের উপর আপনার বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে, কিম্বা শুয়ে আছে ?

এইবার নাহার মশাই একটু অস্বস্তি বোধ করে ব্রজেনবাবুর মুখের দিকে চাইলেন, শীল মশাই বলিলেন,—আপনি একটু স্থির হয়ে শুনুন, ইনি সাধারণ সাধু নন, ইনি যা বলবেন তা আপ্ত-বাক্য, সত্যই দেখেছেন না এঁর প্রত্যেক কথাটা অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ নিযে আসচে,—তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্র এটা নয়। আচার্য্য শীলের কথায় নাহার বলিলেন, আপনি তো দেখছেন, চার্ব্বাক দর্শনের প্রথম কথাটাই ইনি প্রথমেই এনে ফেললেন, তাতে ঈশ্বর-বিশ্বাসী যারা তাদের প্রাণে আঘাত লাগে না কি ? শুনে শীল মশাই বললেন এখানে তো ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা হচ্ছে না, এখানে দেহত্যাগ হলে আর কিছুই থাকে না। আপনি বিশ্বাস করেন যে আত্মা থাকে এই কথা নয় কি ?

একটু হাসিয়াই এবার ঐ পাগল বা অদ্ভুত তন্ময় মানুষটি বলিলেন, আপনার বিশ্বাস আর প্রাপ্তি এই দুয়ে পার্থক্য আছে কিনা ! পুরাণবাবু বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই আছে।

—এইবার বলুন তো, আপনার বিশ্বাসের মূল কোথায় ?

—ভগবান যখন গীতায় বলেচেন, তখন একথা কি মিথ্যা হতে পারে ?

—তাহলে আপনি ভক্তলোক, আপনার ওদিকে কোন কথা নেই। গোড়াতেই এত বড় একটি গুরু বিষয়ে যখন আপনি বিশ্বাসী, তখন তো পেয়েই গিয়েছেন,—আপনার কোন প্রশ্নই তো আর নেই, আপনি এখানে কেন ?

নাহার মশাই বলিলেন, সাধু দেখতে এসেছিলাম,—এভাবের অসঙ্গত সিদ্ধান্ত শুনে স্থির থাকতে পারিনি, তাই প্রতিবাদ করেছি।

—তাহলে এখন আপনি আর এখানে কেন,—এবার বুঝেচেন তো এখানে পাবার কিছু নেই।

—আপনার কাছে যেটা এইমাত্র শুনলাম, সেটা না বুঝে যেতেও পারচি না।

—কি শুনলেন ? ঐ যে বললেন, বিশ্বাসের মূল কোথায় ? এখন মনে হয় ঐ বিশ্বাসের মূল যে ঐ ভগবৎ বাক্য বলেছি তা ঠিক নয়, ওটা গৌণ, মুখ্য কারণটাই আমি শুনবো তবে যাবো। তিনি বলিলেন, যখন তুমি তোমার নিজ বুদ্ধিতেই ধরেচো যে ওটা গৌণ কারণ, তখন নিজেই বের করে ফেল না মুখ্য কারণটা কি ভাবের হতে পারে ?

এইখানেই পুরাণবাবুকে স্থির করে দিলেন, কিন্তু তিনি তখনও তত্ত্বটি উদ্ধার করিতে পারিলেন না। তখন অত্যন্ত মিনতি আর ভক্তিপূর্ণ ভাবেই বলিলেন, আমার সংশয় আছে, আপনিই আমায় নিঃসংশয় করে দিন।

—আরে ভেইয়া ইয়ে তো বড়ি সহজ বাৎ, আপনে কো নেহি আতি ? জীব মাত্রেই তো তার জীবনকে সম্বল করেই চলেছে এখানে ? জীবন তার কত প্রিয়, সবার বড় প্রিয় বস্তু, মরতে কে চায় ? মনে নেই, বক ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির কি বলেছিলেন, অহণ্যাহণি ভূতানী গচ্ছন্তি যম মন্দিরম,—নয় ? আপন মৃত্যুর কথা সে ভাবতেও চায় না।

কাজেই জীবনতুল্য প্রিয় বস্তুর অবিনাশী অবস্থা, চিরজীবন আমার আছে, যে শাস্ত্র এর সন্ধান দেয় তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকাই তো স্বাভাবিক, মৃত্যুর পরেও আমার জীবনে এ একটা কত বড় স্বস্তি ! তাহলে এর মূল হল অহং জীবের অজর অমর অবস্থার কামনা। আর গীতায় ভগবদ্বাক্যে তার সমর্থন পাওয়া গেল তো আর কথাই নেই। মুখ্য কথাই হল আমার চিরজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নয় কি ? নাহার মশাই এবার বলিলেন, সত্যই তাই। এখন বুঝলাম আমাদের জীবনের উপর এই যে তীব্র টান, দেহত্যাগের পরেও আমার অস্তিত্ব থাকে, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যা কিছু তাই আমার বিশ্বাসের বস্তু। এখন আমি আপনার কথাই শুনবো, আর প্রতিবাদ করবো না। বলে স্থির হইয়া গেলেন ; তাই দেখিয়া আমরা সবাই ভারি স্বস্তি অনুভব করিলাম।

এইবার তিনি বলিলেন, এই তো ভাল কথা, শুনতে দোষ কি, নাই বা রইল আমার

ধারণার সঙ্গে তোমার মিল, কে জানে জীবসমাজের যে অব্যবস্থিত চিত্তের খেলা দেখছি, কতদিনে সেই নিরপেক্ষ সত্য অনুসন্ধিৎসা আসবে। যাই হোক, বলছিলাম কিছুই থাকে না মৃত্যুর পর,—জলবিম্বের মত ভৌতিক পদার্থ, ভৌতিক পদার্থ ভাণ্ডারেই লুপ্ত হয়ে যায়। এখন বুঝে দেখো যে বুদ্ধিমান আছে, যারা বলে, দেহনাশের পর আত্মা অর্থাৎ জীবের যে আমি জ্ঞান সেটি থাকে, তাদের যদি শুধানো যায়, হাঁ ভাই, সেটা কোথায়, কি অবস্থায়, কি ভাবে, কোন্ বস্তু অবলম্বনে থাকে? তার এ পর্য্যন্ত কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি, যদিও কথা অনেকগুলি পাওয়া গিয়েচে, তাতে আমাদের কোন কাজ নেই। আমি বলি কি, এই দুই সিদ্ধান্তই যখন অনুমানের উপর নির্ভর করেচে তখন আমার কথাটা নাকচ করা যাবে না তো, পণ্ডিত কি বলো? এখানে পণ্ডিত বলিয়া শীল মশাইকেই লক্ষ্য করা হইল আমরা বুঝিলাম।

এখন আচার্য্য বলিলেন, আপনার কথা মেনেই নিলেম একটি গূঢ় কারণে, সেটা এই যে, আপনার মুখ থেকে ঐ সিদ্ধান্তেব অনুকূল যুক্তি, আপনার নিজের কথায় শুনবো বলে। না হলে আমি নিশ্চিত জানি এ পর্য্যন্ত চার্ব্বাক দর্শনের স্বপক্ষে আমাদের দেশ এবং ইউ-রোপীয় চিন্তাশীল মনীষীদের এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ফ্রয়েড পর্য্যন্ত যা কিছু অভিমত তা সবই আমার অধ্যয়ন করা আছে, আপনি নিশ্চয়ই সেগুলি পুনরাবৃত্তি করবেন না, তাই আপনার অনুভূত সত্য শুনে ধন্য হব বলেই অপেক্ষা করচি—কোন তর্কের অবতারণা এখানে করা হবে না।

এবার মহাভাগ বলিলেন, যাই হোক, আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি যে বর্ত্তমান জগতের মনুষ্যসমাজ এমনই উদ্‌ভ্রান্ত, বিভ্রান্তও বটে—এমনি একটা অবস্থায় এসে পড়েচে যাতে ঈশ্বরবাদীর আর নিরীশ্বরবাদীর জন্মগত বা ব্যবহারগত কোন তারতম্যই নেই—এমন কি ঐ দুই সিদ্ধান্তের মূল নীতি বা দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, অথচ ঈশ্বরবিশ্বাসী বলে যারা দম্ভ করে, তারা বিশ্বাস করে না—কেবল স্বীকার করে মাত্র। যদি তা সত্য বিশ্বাস করতো, তা হলে তার ফল অন্যরকম হোতো। ধর্ম্মের নামে যারা পশু ভাবে চরে বেড়াচ্ছে তাদের এ ভাবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিই থাকতো না। এখন মৃত্যুর পর জগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকে না, দেহত্যাগেই সব শেষ, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুতর। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই বিষয়টি আরও গুরুতর হয়েছে এই একটি কারণে যে জগতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই প্রবল সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েচে যে দেহত্যাগের পরও আত্মা থাকে স্বর্গ, নরক এই সব ভোগের জন্য। কাজেই মৃত্যুর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায় না। অথচ সত্য কথাটা এই যে দেহনাশের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এই অদ্ভুত পৃথিবী, এখানে একটা মিথ্যা, স্তোক বা ধোঁকা—প্রায় সারা পৃথিবীর লোকই স্বীকার করচে সত্য বলে। সেই জনসমষ্টির স্বীকৃতি যদি যথার্থই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হয়,

তাহলে মিথ্যাও সত্য হয়ে ওঠে ঐ বিশ্বাসকে ধরে। বিশ্বাস তাকেই বলে যেটা বুদ্ধিতে নিশ্চিত বলেই ধারণা হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ সম্প্রদায় এটা ঠিক বিশ্বাস করে না, তার সম্প্রদায়গত ভাববৈশিষ্ট্য দৃঢ় রাখতে কেবল স্বীকার করে মাত্র। সেই জন্যই আশা আছে কোন সময়ে হয়তো সত্যের প্রভাব বিস্তৃত হতে পারবে, সত্য বস্তু আর মিথ্যা স্তোকের পার্থক্য মানব সাধারণে বুঝবে।

কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ধরলে, যারা ঈশ্বর স্বীকার করে, দেহত্যাগের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাদের কর্ম্ম, আর যারা তা স্বীকার করে না তাদের কর্ম্ম, আমি কিছুই প্রভেদ দেখি নি। ঈশ্বরবাদী ধার্ম্মিক যারা এই সংসারে সৎ প্রবৃত্তির বশে যে সকল কর্ম্ম করে জীবনকে লোকসমাজে প্রিয়, উন্নত জীবন বলে সাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করেছে তাদের, আর নিরীশ্বর-বাদী নাস্তিক যাদের বলা যায়, তাদের মধ্যেও লোকসমাজের কল্যাণকারী সৎচরিত্র, পরদুঃখ-কাতর মহামানবের পর্য্যায়ে পড়ে এমন মানুষও আছে আমরা দেখেছি। তারপর যাদের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি, যাদের জীবনীশক্তি প্রবল, ভোগ এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দাম—তারা নিশ্চয়ই কোন ভোগ বা প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম থেকে জন্মান্তরের বা পরলোকের দণ্ডের ভয়ে কখনও নিবৃত্ত হয় না। অথবা ঈশ্বর আছেন, তিনি (তার কৃত কর্ম্মে) দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁর বিচারে দণ্ড পেতে হবে বলেও কেউ প্রবৃত্তিমূলক কোন কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত হয় না। তা ছাড়া ধর্ম্মবিশ্বাসী ঈশ্বর-লীলাবিলাসী হিন্দু সমাজের, অথবা যে কোন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরবিশ্বাসী যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী সমাজের মানুষ—অন্যায়, অধর্ম্ম, পাপ, পাতক, হিংসা, পাশবিকতায় দক্ষ। এমন কি যত কিছু কুকর্ম্ম যা সভ্য সমাজে নিন্দনীয়, ঘৃণার বস্তু বলে সাধারণের ধারণা, ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স ধরা গেলে দেখা যাবে ঐ এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরবিশ্বাসী একেশ্বরবাদীরাই সংখ্যায় বেশী রকমের অপরাধী বা ক্রিমিন্যাল। তারপর জগতের যত সব ভণ্ড ভাব তাও ঐ ধর্ম্মাশ্রিত, বিশিষ্ট ঈশ্বরভক্তির নিম্নমুখী প্রসার থেকেই এসেছে। তার পর যেদিকেই দেখা যাবে, সংসারে যত পাপ ঐ ঈশ্বর-স্বীকৃতির পিছনে পিছনে এসেছে। কাজেই এটি পরিষ্কার দেখা যাচ্চে যে ঐ ঈশ্বর-স্বীকৃতির বোঝা অত্যন্তই ভারী হয়ে জীব-সমাজের একটা মহাবন্ধনের কারণ হয়েচে। এখন ওটিকে ছাড়তে হবে। সম্প্রদায়গত সমষ্টিগত ভাবেই ছাড়তে হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে নয়।

এবার আচার্য্য বলিলেন, ক্ষেত্র প্রস্তুত, এটমোসফিয়ার তৈরী, এখন আপনার কথা—নিজ সিদ্ধান্ত যা শুনতে এতটা কাল দণ্ড দিয়েছি বা পেয়েছি এবারে তা সার্থক করুন।

ব্রহ্মচেতন একেবারেই বলিলেন, জন্মান্তর আছে কি নেই এই যে প্রশ্ন, আমি বলি কি এ নিয়ে এই অল্পমেয়াদি জীবনে এতটা মাথা ফাটাফাটির দরকার কি? যখন থেকে এই প্রশ্ন মানুষের মনে উঠেছে তখন থেকে সবার কাছে এখনও পর্য্যন্ত এর কোন সুমীমাংসাই হয়নি। তাছাড়া অনেকগুলি অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এটাও যেমন সত্য, আবার

কতকটা অনুসন্ধিৎসার ফলে যে জ্ঞান, অবস্থান্তরের কতকটা ধারণা হয়েছে—হিন্দু স্মৃতি-শাস্ত্রের যে সকল সিদ্ধান্ত, যা এতকাল চলে এসেছে গতানুগতিক ভাবে সমাজের মানুষ বিশ্বাস করুক-না-করুক মেনে এসেছে, একথাও সত্য।

আসল কথায় আসা যাক। এখনকার দিনে জন্মান্তরে বিশ্বাসটা এক শ্রেণীর মধ্যে একেবারেই দৃঢ় সংস্কারগত হয়ে গিয়েছে আর সেটা এমন ভাবেই হয়েছে যে তা থেকে নড়া শক্ত। তার গূঢ় কারণই হোলো জীবের আত্মা বলে যে সত্তা—সেটি এক অদ্ভুত বস্তু। প্রথমত, সেটি এমনই পরমাশ্চর্য্য সত্তা আর পর পর এমনই অদ্ভুত পাঁচটি কোষে ঢাকা যে সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐগুলি অতিক্রম করে তার নাগাল পাওয়াই মুশকিল কিন্তু তার ক্রিয়া অবাধ। সহজ ভাবেই আমাদের নিত্য কর্ম্মে, চিন্তায় ঐ আত্মার প্রভাব দেহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যেন এক হয়ে সকল কাজই হয়ে যাচ্ছে, কারো অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন হয় না যে এই ক্রিয়াশীলতা আমাদের মধ্যে চলেছে তা কোন ক্রমে কি ভাবে ঘটছে? যাঁরা এই অনুসন্ধানের পিছনে আছেন তাঁরাই দার্শনিক বা যোগী বলে পরিচিত। কেমন এই তো? এই পর্য্যন্ত কথাটা সহজ, —সবাই মোটামুটি বুঝবে। যেটা এখন সবাই বুঝবে না সেটা এই যে, জীবের ঐ আত্মাতেই আছে মহাশক্তি, চৈতন্য এবং অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তির উৎস। পরবর্ত্তীকালে মানুষ ঈশ্বর বা ভগবানে যে সকল গুণ বা শক্তির আরোপ করে সুখী হয়েছে, তা সবই ঐ আত্মাতে বর্ত্তমান। সাধারণ মানুষের ধারণাই নেই যে, ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপে কি বিপুল শক্তি,— তার মধ্যে শুধুই বর্ত্তমান নয় কর্ম্মাবস্থায় আসবার জন্য চঞ্চল এমন কি তটস্থ হয়ে রয়েছে। একবার সেদিকে লক্ষ্য করলেই তার কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। এ জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন মহৎ বলে, মহাশক্তিশালী বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন—সবই ঐ শক্তিবিকাশের ফলে। কোন ইচ্ছা বা সাধ, একবার উৎপন্ন হলেই তার কাজ আর রুদ্ধ হবার যো থাকে না, এমনই এ শক্তি।

এমনই যে জীব এবং তার আত্মা, জন্মান্তর গ্রহণ তার পক্ষে কিছুই কষ্টকর নয় বা অবাস্তবও নয়। যদি তার ইচ্ছা হয় তাহলে আরও অনেক কিছু, যা আমাদের এখানে চিন্তায় অসম্ভব মনে হয় তাও সম্ভব হয়ে যায়। এখন সে কথা থাক্। আমাদের জগতে অনেক মহাপুরুষ, অবতারকল্প-পুরুষ যাঁদের আমরা বলি, যাঁরা সত্যলাভ করেছেন, জীব-জগতের মূল সত্যটি দেখেছেন,—তাঁরা দেখেছেন যে যতই সুখকর বোধ হোক না কেন এই দুঃখ, রোগ, শোক, জরাপূর্ণ জীবনটা আসলে দুঃখের—আত্মজ্ঞান ব্যতীত নির্ভরযোগ্য সুখ বা শান্তি এখানকার কিছুতেই নেই। তাই তাঁরা জীবনের মধ্যে এই সত্যই বিশেষ করে ফুটিয়ে দিতে চান যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের কাজ শেষ করে একেবারে ওপারে শাশ্বত শান্তিময়, আনন্দময়, অচ্যুত অবস্থায় অধিকারী হবার লক্ষ্যই যেন তোমার একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু এ কথা শুনবে কে? এ জগৎ-সংসার যার ভাল লাগবে না তারই

এ সত্য অনুভূত হবে, নয় কি ? কিন্তু ঐ চরম সত্য কার অনুভূত হবে ? পনেরো আনা তিন পাই লোকের তো নয়ই, সেই পনেরো আনা তিন পাই জন্ম আর মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খেতে হোক বা না হোক, এই সুখ-দুঃখময় জীবনকেই সুন্দর দেখে ও ভালবাসে, সে ভালবাসা অসীমের মতই বোধ হয়। এইটাই লক্ষ্য করবার বিষয়, যে যতই জ্ঞানী হোক, যতই বিদ্যালাভ করুক, যতই ধন মান প্রতিষ্ঠার অধিকারী হোক না কেন, সবাই ঐ পনেরো আনা তিন পাইয়ের মধ্যে আছে , এখানকার ভোগ সম্পর্কে তাদের আকর্ষণ মোটেই সহজ নয়। তারা জন্মান্তর অনুসন্ধান করে কতক জানবার বুঝবার আশায় আর খোঁজে এর চেয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা দেহত্যাগের পর আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে না হয় জন্মান্তর স্বীকার করা যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপার বিচিত্র রহস্যে ঢাকা। সে ঢাকা আজও খোলেনি। যদিও খুলে থাকে, অতি অল্প লোকের কাছেই খুলেছে, আর তারা মানুষ-মনের জটিলতা ভেবে তত্ত্বটি প্রকাশ করতে যাননি।

সভ্য মানুষ সমাজে আজকাল প্রেত-চক্রের অনুষ্ঠান চলচে। দেহত্যাগের পর জীব কি অবস্থায় থাকে বা আছে তাই নিয়ে মহাচর্চ্চা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে,—ও-দেশে এদেশে প্রায় সব দেশেই। তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন নিজে চক্র করে বসে,—পরলোক থেকে তাদের নির্দ্দেশ পাবার জন্য। এ নিয়ে কতজনা অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান করে চলেছেন তার সীমা নেই। দেহত্যাগের পর জীবের অস্তিত্ব যে থাকে তার প্রমাণ আবিষ্কারে তার বিরাম নেই। এইভাবে চলেছেন এক দল ; আবার সন্দিগ্ধ এক দল, তাঁরা ধরে নিয়েচেন যেন দেহত্যাগের পর জীবের অস্তিত্ব বা থাকাটাই একটা ভয়ানক অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

এই যে অনুসন্ধান, এও এক রকমের বৃত্তি, একশ্রেণীর মানুষের (Hobby) হবি হয়েই রইলো—যেমন বই পড়া, দেশভ্রমণ, সমুদ্রভ্রমণ, রত্নসংগ্রহ ইত্যাদি সভ্য সামাজিক জীবের এক শ্রেণীর স্ফূর্ত্তির খোরাক। এর ফলে কি হচ্চে জানো ? যে যেটা কল্পনা করে আরম্ভ করচে, ঠিক সেই কল্পনা অনুসারেই ফল পাচ্ছে।

এই পর্য্যন্ত বলে তিনি যখন চুপ করলেন, তখন শীল মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, জন্মান্তর সম্বন্ধেও কি তাই ?

ব্রহ্মচেতন, —নিশ্চয়ই, এখানে তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? সর্ব্বত্রই তো এই হচ্ছে, প্রথমেই কল্পনা তারপর চিন্তা, তারপর প্রত্যক্ষ, সেটাও ঐ কল্পনা-অনুসারি। জগৎ-সৃষ্টি থেকেই এই সূত্রে কাজ হয়ে আসচে, জীবের সৃষ্টিতে তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? প্রথম যখন জন্মান্তর প্রশ্ন জাগলো জীবের মধ্যে, তখন থেকেই ভেবে দেখো, কল্পনা শুরু হয়ে গেল, আর সেই কল্পনাই সত্য হয়ে নানা মূর্ত্তিতে সামনে পড়তে লাগলো। সে যতকাল পূর্ব্বেই আরম্ভ হোক না কেন, এখনও তাই চলে আসচে ; তার তিলমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি।

পণ্ডিত বলিলেন, ঐ প্রেতমূর্ত্তি, ভয় পাওয়া কত কিছু দেখে নানা রকমের বৈচিত্র্যময় অবস্থায় কথা, মৃত্যুব ভীষণতার কথা যা শোনা যায়—

-ঐ ভয় পাওয়ার মধ্যেও তো বুদ্ধি ও মনেব একটা উপভোগ আছে, সেই ভীষণ একটা কিছু, তাব স্বাক্ষী রূপে থাকা ও দেখা, যদিচ তার মধ্যেও কল্পনাব অবাধ গতাগতি থাকেই, সে কি একটা কম উপভোগেব কথা ? সে-সব ঐভাবে লোকেব গোচবে আনার সার্থকতা নেই মনে কবো ? এর আলোচনা প্রভৃতি সব কিছুই তো আনন্দেব ব্যাপাব, না হলে আজও উঠচে কেন, বল ?

—তাহলে পবলোকেব যা কিছু, আমাদেব কল্পনাতেই তাব অস্তিত্ব ? অর্থাৎ মিথ্যা ? একথা বলিলেন নাহাব মশাই।

—তা ছাড়া আর কোথায় তাব অস্তিত্ব থাকবে বল ? তবে একে মিথ্যা বলাব অধিকার নেই, যতক্ষণ এর মধ্যে সমাজবদ্ধ জীবসমষ্টিব স্বীকৃতি আছে।

—কিন্তু আসলে কল্পনাটা তো মিথ্যা, তাহলে কি বুঝতে হবে না জন্মান্তব এবং পরলোক নিয়ে যা কিছু মানুষেব মন আব বুদ্ধিতে এসেছে, সবই মিথ্যা ?

—হায় হায়, সাতকাণ্ড বামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা ! আসলে আরম্ভটা কল্পনায়, তার পর তোমাব প্রবল ইচ্ছাশক্তিই তো তাকে বাস্তবের ভাবে তোমার কাছে হাজির করলে , তখন তাকে কল্পনা বোলবে কি ?

—এ যে আপনি বেদান্তের অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বেব কথা এনে ফেললেন, এই জন্মান্তরবাদের মধ্যেও কি—

—পণ্ডিত, যদি সর্ব্বকারণকারণাৎ বুঝে থাকো, তা হলে তোমার এটা না বোঝার কথা নয়। অনেকেই এই সূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পেযে গিয়েছে, তবে তারা সাধারণ জীব নয়।

এবার পুরানচাঁদ নাহার মশাই বলিলেন, তা হলে তো বাসাংসি জীর্ণানি, এই নিয়মও সত্য হতে চাইচে ?

—তা হলে আরও খানিক বকতে হবে দেখচি। তুমি রামপ্রসাদের নাম শুনেছ ?

—হাঁ, একজন বাঙ্গালী সাধক ছিলেন, শুনেছি অনেকগুলি দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে গান রচনা করেছিলেন।

শুনেই তিনি বললেন, তাঁকে যা বলতে হয় বলো কিন্তু তাঁর মধ্যে এই বিশ্বতত্ত্বের মীমাংসা চমৎকার হয়েছিল। তাঁর একটা গান আছে, বল দেখি ভাই কি হয় মলে। তার শেষ কথাটা আমাদের দরকার—সেটা এই যে, জলের বিম্ব জলেই উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে। এই মীমাংসা নিতে পার কি ? প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুই দিকেরই এইটা চরম মীমাংসা, নয় কি ?

—তা হলে বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, এ আবার কি ? এটা কি মিথ্যা হয়ে যাবে ?

—তা হলে বলি শোনো, আত্মরূপী স্ফুলিঙ্গ, পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়ে এক চক্র ভ্রমণ সম্পূর্ণ করে আবার পরমাত্মায় লয় হওয়াই রামপ্রসাদের পরম তত্ত্বরূপী এই, 'জলের বিম্ব জলেই উদয় লয় হয়ে সে মিশায় জলে' এই লাইনটির মর্ম্মকথা। ঐ মর্ম্মের এর তাৎপর্য্য। তার মধ্যে যতবার জীবের ইচ্ছা, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। স্বপ্নবৎ মিথ্যা বল, যাই বল,—আসলে এ তো কল্পনাই ঠিক মনে হয়।

এবার পণ্ডিত বলিলেন -

অদ্ভুত এই কথাটা নিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, জীবের জন্মান্তর নিয়ে রামপ্রসাদের কথা, আমরা এতদিনে যে অর্থে বুঝেছিলাম, এখন দেখছি তার তাৎপর্য্য অনেকটাই গভীর। সত্যই কি তিনি এই মর্ম্মেই ঐ ছত্রটি বলে গিয়েছেন ?

—এই দেখো আবার বিচার-ব্যতিক্রম ! দেখতে হবে এখানে তোমার উপলব্ধির বহর কতটা ; এই তো বলছিলে ঐ লাইনটার মর্ম্ম আগে অন্যরকম মনে করেছিলে, এখন তার তাৎপর্য্য কি বুঝলে ! আসলে বোদ্ধার বুদ্ধিই কার্য্যকরী, তাতে তারই লাভ, লোকসান নির্ভর করচে। তত্ত্ব যাই হোক না কেন, তাতে কি এসে যায় ? কি বল ?

পণ্ডিত চিন্তিত।

নাহার মশাই আস্তে আস্তে উঠিলেন, প্রণাম করিয়া বলিলেন, স্বামীজী, আমার মাথায় আজ আর স্থান নেই, আমি উঠলাম। আপনি কি এখানে আজ থাকবেন, তা হলে কাল, যদি অনুমতি দেন, একবার আসবো।

—সেকথা আমাদের ঐ জজ সাহেব জানেন, বলিয়া প্রমোদাবাবুর দিকে দেখাইয়া দিলেন।

প্রমোদাবাবু বলিলেন, যদি সত্যই আমার জানার উপরেই নির্ভর করেন তা হলে আমায় ইনি জানিয়েছেন যে আগামী পরশু এখান থেকে নৈমিষ্যারণ্যে যাবার ইচ্ছা। আর ওঁর ইচ্ছা মানেই যাওয়া।

এবার ব্রহ্মচেতন বাবাজী বা স্বামীজী বলিলেন, মানুষ যখন মানুষের তৈরী আইন-কানুন নিয়ে পড়ে আর সেটা মূলে তার বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়, তা থেকে তখন তার দৃষ্টি ফেরানো সহজ নয়। তার পর যারা বাস্তবপন্থী, কল্পনা বা ভাবাবেশ অথবা ভাব-প্রবণতা-শূন্য, যার নাম প্র্যাকটিক্যাল মন-বুদ্ধি নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান নিয়ে বুঝাপড়ার সম্ভাবনা নেই। নাহার মশাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপনার ভগবদ্বাক্যের—ঐ বাসাংসি জীর্ণানির মীমাংসা হোলো না তো এখনও !

একটু মুচকি হাসিয়া নাহার মশাই বলিলেন, বোধ হয় হয়েচে।

—সত্য কি হয়েচে, তা হলে বলুন, আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হোক ! বলিয়া জোড়হাত করিলেন।

নাহার মশাই আবার বসিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঐ একচক্র আবর্তনের পথে যখন বহুজন্ম ভ্রমণ চলতে থাকে স্বরূপে সংস্থি হবার পূর্ব্ব পর্যন্ত, ততক্ষণ পুনর্জ্জন্মের কথা, কল্পনা হোক সত্য হোক, ও একটা প্রোসেস মাত্র, সর্ব্বঘটেই যে ওটা ঘটবে এমন কোন কথা নেই, আবার ঘটবে না, এ কথাও নেই।

—সাবাশ, বলিয়া স্বামী তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন। তারপর বলিলেন, আবার জমে গেলেন নাকি? আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো সকলকার মনোযোগটা সঙ্গে করে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, এখন অনেকটা সাহস পেলাম

স্বামীর রসিকতা উপভোগ্য। তিনি স্বচ্ছন্দে এই অপরিচিত আজকার সাধুসঙ্গ-কামীদের সঙ্গে এমন ভাবেই ব্যবহার করিলেন যেন আমরা সবাই তাঁহার পরিচিত। তাঁহার কথা বলার ভঙ্গী এমনই সুন্দর, ধমকাবার সময়টি ছাড়া সব সময়ই কথা বলিবেন এত মৃদু,—মনে হয় আমাদের পূর্ণ মনোযোগ না থাকিলে তাঁহার সব কথা শুনিতে পাওয়াও সম্ভব নয়। মৃদুর সঙ্গে মধুর শব্দটি মিলাইয়া যে ভাবটি হয় তাহাই হইল তাঁহার কথা বলিবার রীতি। এর আগে এমনটা কোথাও দেখিনি। শ্রোতার মনযোগ আকর্ষণ করিবার অসাধারণ শক্তি নিঃসন্দেহ এঁর মধ্যে বর্ত্তমান। যাই হোক এখন বলিলেন:—

প্রকৃতির যত কিছু গুহ্য, অর্থাৎ মানুষ সাধারণের যে তত্ত্ব ভেদ করবার সম্ভাবনা নেই, যেমন ধর দেহনাশের পরের অবস্থা, অথবা জন্মান্তর, অথবা প্রকৃতি-তত্ত্ব বা ঈশ্বর-তত্ত্ব,—সাধারণ মানুষ যত ভাবেই চেষ্টা করুক, ফলে তার নিজের মত একটা ধারণা করে নিতে পারলেও সেই বিষয় অপরকে নিশ্চিত ধারণায় এনে দিতে পারবে না। তা ছাড়া নিজেও চিন্তার সাহায্যে যেটুকু বুঝেছে তাও আংশিক, কারণ খণ্ড জ্ঞান নিয়ে কোন তত্ত্বের সম্যক জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

এই কথা শুনিয়া একজন বলিল, ত হলে আপনার সাহায্যেই আমরা বুঝে নেবো,—

—এখানে একজনের ন্যাজ ধরে আর একজনের স্বর্গে উঠা হয় না। আগাগোড়া অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে তোমার কাম্য বস্তু বা তত্ত্বের পানে তোমাকেই পূর্ণ উদ্যমে চলতে হবে। আমি পথের নিশানা একটু দেখাতে পারি, তাও অভ্যাসে,—এ সহায়তা নেবারও উপযুক্ত হওয়া চাই।

—তাহলে তো আমাদের আশা নেই বলুন?

—যে ঠিক ঠিক চাইচে তার আশা থাকবে না কেন? তোমরা এতগুলি এসেছ, যথার্থ কে তত্ত্ব-পিপাসু আছ? সবাই তো গতানুগতিক ব্যাপার ধরে রয়েচো, এই পণ্ডিত মাত্র তত্ত্বের পিছনেই চলচেন—আর সবাই তো কৌতূহল নিয়েই এসেচ খানিক মনোরঞ্জনের জন্য। তা হোক,-এইভাবেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্বমুখী হয়। এতেও খানিকটা লাভ হয় বৈকি।

সবাই চুপচাপ—স্বামীও স্থিব, কোন কথাই বলিতেছেন না কতক্ষণ। সবাই যেন উন্মুখ হইয়া আছে এমনই অবস্থায় তিনি বলিলেন, আমি আভাসে বলতে পাবি, যাবা বুদ্ধিমান তাবা বুঝে নেবে। একটু আগেও কতকটা বলেচি, তোমবা খুঁজে নিযে যে যাব কর্ম্ম কবে যেতে পাববে। সোজা কথায, ধবে নাও, -তোমাবই মধ্যে এমনই এক মহাসত্তা বর্ত্তমান, মহাশক্তি ও জ্ঞানেব উৎস, যাব প্রভাবে তুমি এই বিশ্বতত্ত্ব সম্পূর্ণ জানতে পাবো, আব কর্ম্মক্ষেত্রে যা ইচ্ছা তাইই কবতে পাব। তোমাব সত্তাব সঙ্গেই তাব অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আবও সহজ কবে বলবো? বৈদিক কালেব পববর্ত্তী যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতাদেব উপাসনাব পব জ্ঞান ও ধ্যান বাজ্যে প্রবেশ কবলেন, যখন থেকে আমাদেব ঋষিকল্প পিতৃপুরুষগণ ঈশ্ববমুখী হলেন, স্রষ্টা পাতা, ধাতা রূপে একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব নিযে মশগুল, উপনিষদকালেব ঠিক পূর্ব্বেব কথা,—সেই সময থেকেই তাঁবা কল্পনায ঈশ্ববেব অস্তিত্বে যেসব গুণ আবোপ কবে নিজেবা আনন্দে ভেসে-ছিলেন—প্রত্যেক জীবেব কেন্দ্রস্থ সত্তাব মধ্যে ঐ সকল শক্তি বা গুণ বর্ত্তমান এটা সাধাবণ জীবেব ধাবণা নেই। একটু আগেই এটা আভাসে বলেছিও—বোধ হয তোমাদের মনে আছে।

এই সমযে ঘবখানা এমনই নিস্তব্ধ হইযা গেল, আশ্চর্য্য ব্যাপাব, যেন এক অনুভূতিব মধ্যে আমবা সবাই মগ্ন হইযা গেলাম। এবাব ব্রহ্মচেতন একবাব শীল মশাই-এব দিকে তাকাইলেন, তাব পবেই পণ্ডিত শীল ধীবে ধীবে সংযত কণ্ঠে বলিলেন, এই সূত্রেই আপনি জন্মান্তব থাকা অথবা না থাকা সিদ্ধান্তেব গোড়াটা বেঁধে নিলেন। ঈষৎ হাস্যে স্বামী বলিলেন, পণ্ডিত, এটা তো বুঝেচ যে আত্মাব মধ্যে অফুবন্ত ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানেব উৎস বর্ত্তমান,—তোমাব জন্মান্তব আগে থেকে প্রাকৃত নিযমে বিধিবদ্ধ থাক বা না থাক্, আত্মাব ইচ্ছায জন্মান্তব সম্ভব তো বটেই ববং নিশ্চিত ঘটে যেতেই পাববে। সেই ইচ্ছাই সর্ব্বসৃষ্টিব মূলে বর্ত্তমান বযেচে যে।

—আব ঈশ্বব-তত্ত্ব! আমাদেব মধ্যে কে একজন চট্ কবিযা বলিযা ফেলিল, যেন তার মুখ হইতে বাহিব হইযা গেল। উত্তবে স্বামী কহিলেন, তাব ভিত্তি হোলো বিশ্বাসেব উপব, আবও সহজ করে বললে এই কথাই বলতে হবে, তোমাব সত্তাকে তুমি স্বীকার কবো বা না কবো সেটা তোমাব ইচ্ছা—যেমন এক মাতাল বলেছিল, আমাব পাঁঠা—আমি ন্যাজের দিকেই কাটবো, তাতে কাবো বলবাব কি থাকতে পাবে!

আর কাবো মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীও স্থির, ধ্যানমুখী হইয়া গেলেন, তারপব ধীরে ধীবে বলিলেন, আত্মা বা আসল জীবসত্তার কথাটি প্রকাশ করবার আগে আরও কিছু বলবার আছে। সে-সব কথাও সোজা কিন্তু তোমাদের মনে যে নানা রকমের বিদ্যা-অবিদ্যার জট পাকিয়ে আছে তা ছাডাতে হবে তো, নাহলে

বিশ্বাস আসবে কি করে? একটু বিশ্বাস আনতে অনেকটাই সাধনা করতে হয়, তপস্যায় যে বিশ্বাস আসে তারই প্রভাবে আমাদের মন-বুদ্ধি নির্ম্মল হয়,—সেই বিশ্বাসেই যত কিছু পথের জটিলতা সোজা হয়ে যায়। ঐ বিশ্বাসের সঙ্গে আগাগোড়া প্রাণেরই ক্রিয়াক্রম বাঁধা, ঐ বিশ্বাসই হোলো প্রাণের চরম অভিব্যক্তি। আসলে সবটাই প্রাণের যোগ বা যোগধর্ম্মী আত্মার প্রভাব-সৃষ্ট প্রাণেরই বিকাশ। জীবশ্রেণীর মধ্যে মানুষেই যোগের চরম পরিণতি। অথচ এখানকার মানুষ, যোগ বলতে যেন তার দৈনন্দিন জীবন থেকে পৃথক একটা ধর্ম্ম বা কর্ম্ম সাধনা মনে করে ঐ ভাবটিকে একেবারে নিজ নিজ অস্তিত্ব থেকে দূরেই রেখে দিয়েচে। মানুষ-জীবনের প্রাণের স্বাভাবিক ক্রিয়া থেকেই না শিব যোগমার্গ আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর অন্যান্য যোগীরাও সহজ অনুভূতির পথ, অষ্টাঙ্গ যোগের পথ তারই অনুসরণে নির্দ্ধারণ করে যোগমার্গে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন।

এবার নাহার মশাই একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই যেন বলিলেন, এতটা শোনবার পর আমার মনে যে কথাটা উঠেচে সেটি বলতে যদি অনুমতি দেন—

—হাঁ, হাঁ, বলো, বলবে বৈকি, নাহলে রোগ ধরা পড়বে কি করে, আর তা ধরা না গেলে চিকিৎসাই বা হবে কি করে?

একটু অপ্রতিভের হাসির রেখা দেখা গেল তাঁর মুখে, তিনি বলিলেন, আমার মনে হয় আপনি জন্মান্তরবাদ সমর্থন করচেন।

সবাই হাসিয়া উঠিলেন, স্বামীও প্রথমে হাসিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সংযত ভাবে বলিলেন, যা বলেছ, আমি ভাবচি আর একটি কথা। যারা নিয়তই শাকসব্‌জি ফল খায়, মাছ মাংস স্পর্শও করে না, তাদের ক্যালসিয়ম ডিফিসিয়ানসি* ঘটে কি করে? আমি তো জানি আমি জন্মান্তরবাদ সমর্থন সিদ্ধান্ত বা খণ্ডন কিছুই করিনি, আমি বলছিলাম যেটা প্রমাণ প্রয়োগাদির সাহায্যে সমর্থন করা যাবে না, যেটা প্রকৃতির নিয়মেই অদৃষ্ট হয়ে আছে তাকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? যেখানে অল্প কথায় বুঝানো গেল না সেখানে বেশী কথায় যদি আমার অনুরাগ না থাকে? দোহাই বাবা, তুমি আমায় রক্ষা করো।

সবাই চুপচাপ, আমিও একটু দুঃখ পাইয়াছিলাম—বেশ যোগের কথায় আসছিল, আবার অন্য কথা আসিয়া পড়িল এই ভাবিয়া। স্বামী কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি বলিলেন, একটা কথা জেনে রাখো, একটা ধোঁকা আর একটা ধোঁকার সৃষ্টি করে, এটা প্রকৃতির সহজ নিয়ম। এই যে মানুষের মৃত্যুর পর কি হয়, এটা জানবার প্রবৃত্তি যখনই মানুষের মনে জন্ম নিয়েচে, এটার নিবৃত্তি নেই যতক্ষণ না সেই মানুষের মৃত্যু আসে।

---

* শুনেছিলাম,—বিচার্য্য বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যদি কারো গোঁড়ামি না কাটে—কিম্বা সে যদি গোঁভরে নিজ সিদ্ধান্তই ধরে থাকে, মনস্তাত্বিক চিকিৎসকেরা তাকে ঐভাবেই নির্দ্দেশ করেন।

মৃত্যু,—এই যে একটা নেতি, জীবিত অবস্থায় এটা নিয়ে ঘাঁটার ফলও ঐ আর একটা নেতির সৃষ্টি, ধোঁকার ফলে আর একটা ধোঁকা। একজন যাব মধ্যে এই প্রশ্ন উঠলো তার ধারণা হোলো যে নিশ্চয়ই কিছু আছে মৃত্যুর পব,—তার এই যে ধারণা, সে একটা কিছু সিদ্ধান্ত না করে ছাডবে না। অন্য কথায় বললে এই বলতে হবে, সে একটা পরিণাম দেখতে বদ্ধপরিকর। নাহলে তার শান্তি কোথা? এইখান থেকেই ভূতুড়ে কাণ্ড আরম্ভ হলো—যার আগাগোডা সবটাই কল্পনার বিস্তৃতি। দেহ নেই তো নিশ্চয়ই ভূতকে দেখতে অস্পষ্ট বা আবছা হয়ে থাকে,—দেহত্যাগের পর। এটা আমাদের প্রথম কল্পনা,—চেনা-শোনা লোকেব কাছে ঘোরাফেরা করে, আবার দেখাও দিতে পারে। ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কাপড ঢাকা স্কেলিটন-আকৃতি ভূতের আমদানি হয়েচে। আমাদের দেশী ভূত কথা কহতেও পারে, তবে আওয়াজ খোনা। আমরা হিন্দু, জাতের বিচার আমাদের সমাজে বড কথা, এ জাতের বামুন সবার বড তাই তারা মলে ব্রহ্মদৈত্যই হবে। একালে রিফর্‌মড্ সোসাইটি, বিংশ শতাব্দীর মাঝে সভ্যতার পরিণতি সঙ্গে সঙ্গেই ভূত-প্রেতেরও অবস্থায় পরিবর্তন এনেচে, এখন আব ওভাবের ভূত দেখার কাল নয়, এখন সিঁয়াসে বসে মিডিয়মের ভিতর দিয়ে ভূত আনা হয়, সেই ভূতের নাম স্পিরিট, তারও গুড্-ইভল্ ভেদে ভালো-মন্দ দুরকম আছে।

—প্রেত-অবস্থার কথা বুদ্ধও যে বলেচেন, তার কথা তো নাকচ করা যাবে না? এখন আর একজন এই কথাটা বলিয়া উঠিলেন।

—নাঃ, কি দরকার নাকচ করবার, যত্নপূর্ব্বক রেখে দাও যাতে কোনভাবে ওটা কোন-কালেই নষ্ট না হতে পারে। তত্ত্বদর্শী যাঁরা তাঁরা সাধারণ মানুষকে কিভাবে বোঝাবেন তাঁর উচ্চ অবস্থার অনুভূতির কথা, সেইজন্যই না এই দেশের ধর্ম্ম-সমাজে এত হেঁয়ালি। সহজভাবে তাঁর ভাষায় বললে কে বুঝবে? তিনি যে জন্মান্তর বা দেহনাশের পর ভূত-প্রেতের কথা নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে জাতকের মধ্যে বলেচেন তার আসল তাৎপর্য্য লক্ষ্য করলেই তো সহজে একথা বুঝা যায় যে, জীবনের ধর্ম্ম বা পাতক মানুষকে প্রেত-অবস্থাতেও কত ভাবেই না সুখ-দুঃখ দেয়। সৎকর্ম্মের মহিমা, নৈতিক জীবনের অবশ্যম্ভাবী সুখ ও শান্তিময় অবস্থা, এই সকম কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের দৃষ্টান্ত জাতকের মধ্যে কত ভাবেই না বলা হয়েচে। এই মূলকথা এবং মুখ্যার্থ না দেখে তাঁর বর্ণিত ঐ প্রেত-অবস্থার কথাটাই মুখ্য ধরলে তাকে কি বলা যায়? মৃত্যুর পর অবস্থান্তরের কথা নিয়ে কল্পনার প্রবাহ তো আজ আরম্ভ হয়নি, সেটা কত কাল ধরে মানুষসমাজে চলেচে। চলবেও, যতদিন মানুষ-সমাজে অজ্ঞান থাকবে। আবার যার যেমন দরকার সেই ভাবে তাকে ব্যবহারও করবে

এবার ঐখানকার মিওর কলেজের এক অধ্যাপক একটু সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন,

এতাবৎকাল পরলোক বা ভৌতিক আত্মা যাঁরা পরলোক থেকে অনেক কিছুই বলেচেন এ জগতের মানুষের কাছে, সেসব অনেক ব্যাপার, নানা ভাবের কথা শোনা গিয়েচে, তাহলে সেসব কি ?

—সেসব আদান-প্রদান কি ভাবে সম্ভব হয়েচে তাই জিজ্ঞাসা করচো ? স্বামী অত্যন্ত শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

—তাও করচি, আবার দেহত্যাগের পর আত্মার কি গতি হয় তাও জিজ্ঞাসা করেচি।

এবার স্বামী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতে কার ভার্য্যে,—দেহত্যাগের পর কি অবস্থা অথবা কোন প্রকার অবস্থা আছে কিনা, যাঁর কোন নির্দ্দেশ তুমি পাচ্চ না, যেটা তোমার জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধির অতীত বিষয়, অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রকৃতি যেটা তোমায় জানাতে চায় না তা নিয়ে কেন এত মাথা ফাটাফাটি, তাই না একথা হোলো ! যদি তবুও নিবস্ত না হও, তাহলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হিন্দু স্মৃতির যা নির্দ্দেশ, প্রেতলোক, পিতৃলোক, স্বর্গলোক এ সব আছে, তার উপর কল্পনার অবাধ রাজ্য তোমার মনোজগতে বর্ত্তমান, সোজা চলে যাও তার মধ্যে। তাতে আমি সহায়তা করতে পারবো না।

একথা শুনিয়া সেই ব্যক্তিই আবার বলিলেন, তাহলে পরলোকের যা কিছু খবর এতদিন ধরে আমরা শুনে এসেছি, ভাল ভাল উচ্চ-শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক লোকের মুখে শুনে বিশ্বাস করে এসেচি, সে-সবই কল্পনা ?

—হাঁ গো হাঁ, গীতায় ভগবানের শ্রীমুখের বাণী, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, তারপর বুদ্ধদেবের বাণী ও জাতকের কথা পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে, এখন বাকী এযুগের থিওসপিষ্টদের কথা তো,—বল না তাই কিনা ? তাদের কথা উপেক্ষা করি কি করে, কেমন ? দেখো এ পৃথিবীটা গোল, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য, আমাদের জ্ঞানরাজ্যের চক্রটাও গোল ; এখানে এক জায়গা থেকে সোজা যাত্রা করলে ঘুরে ঠিক সেই জায়গাতেই আসতে হবে ;—সেই রকম মৃত্যুর পরের অবস্থার কথা যতরকমে তুমি যতই বিচার করো না কেন শেষে ঐ কর্ম্মানুসারী গতিতেই আসতে হবে, ইহলোকের সৎ আর অসৎ কর্ম্ম আর তার ফলাফল নিয়েই যা কিছু পরলোকের ব্যাপার, সর্ব্বত্রই এই কথা। কেন বাবা সকল ! এ নিয়ে এত ব্যাপার করো, তোমার প্রকৃতি অনুসারেই তোমার কর্ম্ম, আর তারই ফলাফল ইহ, পর, সব লোকই চলবে ;—এ ছাড়িয়ে তোমার বুদ্ধি হোক, কল্পনা হোক আর কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। যে কাজে তুমি নিজে আনন্দ পাও, আরও পাঁচজনকেও আনন্দ দাও, সেই সকল কর্ম্মই তোমার উচ্চগতি নিয়ন্ত্রিত করে। সেটা তো ইহলোকেও করে, তাই না পরলোকেও সেইরূপ গতির কথা শুনতে পাও ? আর সে-সকল কথা যে তোমায় জানিয়েচে সেও পেয়েচে ঐ সূত্রে কল্পনার প্রসারেই। কল্পনার যে শেষ সেটাও ফিরে

আসবে সেইখানে যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছিল। শেষে স্বামী জোড়হাত করিয়া বলিলেন, দোহাই আমার বাবাগণ, ইহকালের কর্মের উপরেই নির্ভর করতে শেখো, তা হলে সব কিছুই সুখের হবে, এই প্রত্যক্ষ ইহ নিয়ে পরকালের যবনিকার আড়ালে যা আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা কোরো না। তাতে তোমাদের কোন লাভ নাই।

যে ভদ্রলোকটি শেষ প্রশ্নটি করিয়াছিলেন, এবার তিনি জোড়হাত করিয়া বলিলেন, আপনি আমাদের অপরাধী করতে চান

—তোমাদের করতে যাব কেন, অপরাধী তো আমিই হয়ে আছি গোড়া থেকে, তবে আমি আজ আশা করেছিলাম তোমরা এর চেয়ে গুরুতর কিছু শুনতে চাইবে, কিন্তু এতেও যে সময়টা নষ্ট হলো তা মনে করি না, যদি তোমাদের সত্যই কিছু ধারণা হয়ে থাকে।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের মত দেখিতে ওখানে শ্যামবাবু বলে একজন ছিলেন, তিনি গান গাইতেন ভাল, বৈঠকী গানে তার একটা খ্যাতি ছিল এবং এলাহাবাদের বাঙ্গালী মহলে হামেসাই তাঁর নিমন্ত্রণ হোতো। কর্ণেলগঞ্জে তাকে প্রতি উৎসবে আনন্দ সম্মেলনে দেখিতাম। তখনকার ভাল ভাল সাধকের গান—বিশেষ করে বালির রামদত্ত মহাশয়ের গান তিনি বেশী গাইতেন। এখন শ্যামবাবুকে ফরমাশ হোলো একখানা গান গাইতে। তিনি এই তালেই ক্ষেত্র বুঝিয়া রামপ্রসাদী গানখানাই ধরিলেন,—

বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে,—
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে
ওরে শূন্যেতে পাপ-পুণ্য গণ্যমান্য করে সব খোয়ালে,—
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলেজুলে
শেষে সময় হলে আপনাআপনি যে যার স্থানে যাবে চলে,—
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবিরে নিদানকালে,—
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় লয় হয়ে সে মিশায় জলে॥

স্বামী বলিলেন, দেখো তো কত আগে রামপ্রসাদ এটা বুঝিয়ে গেছেন, কিন্তু কে বুঝতে চাইচে?

এবার পণ্ডিত বলিলেন, সহজ কথায় বলেছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়।

এর উত্তরে স্বামী বলিলেন, সহজ ভাবলেই সহজ, তা না ভাবলেই বিপরীত। অথৈ জলের উপর বুদ্‌বুদের দৃষ্টান্ত খুবই সমীচীন;—দৃষ্টান্তটা কিন্তু প্রাচীন হলেও প্রভাবশালী।

এইভাবে এখন ঐ রামপ্রসাদের গানখানার ব্যাখ্যারই জের চলিল।

পণ্ডিত বলিলেন, তাছাড়া গভীর ভাবেই তত্ত্বমুখী করে দেয় ঐ সহজ কথাগুলি। জলের উপর বুদ্‌বুদ্‌ই বিশ্বরূপী দেহাশ্রিত জীব।

—যে জলের উপরকার বিম্ব রূপই এই দেহ–

বাধা দিয়া স্বামী বলিলেন, তোমরা শুধুই দেহ বুঝেচ আমি তা বুঝিনি।

—আপনি কি বুঝেচেন বলুন তা হলে ?

—তুমি কি বুঝেচ আগে বলো, তা হলে আমার কথা বুঝতে সুবিধা হবে তোমার।

—ষষ্ঠ ও সপ্তম লাইন দুটির কথাই আমার মনে হয় আসল, এর অর্থ এই যে, জীবন-ভোগের পর দেহত্যাগ হলে সেটা হয় অগ্নিসৎকারের দ্বারা কিম্বা মাটিতে পচে গলে মিশিয়ে যায়,—জলের বিম্ব জলে উদয় লয় হয়ে মিশায় জলে এই কথাতেই বলা হয়েচে, স্থূল পঞ্চভূত কারণ রূপ আকাশ ভূতে মিশে যায়,—জল বলতে এখানে অনন্ত আকাশকে বলা হয়েচে। ঘটাকাশ আর মহাকাশ।

—কিন্তু সেটা তো স্থূল পঞ্চভূতের কথা হোলো, ভিতরে যে প্রাণাত্মা আছেন তার কথা তো এর মধ্যে কিছুই বলা হোলো না, তার কি গতি বুঝবে ?

—তাই তো, এইখানেই যে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না দেহ-অতিরিক্ত চৈতন্যের কি গতি হোলো ?

—রামপ্রসাদ নিশ্চয়ই তার গতিও নির্দ্দেশ করেচেন এর মধ্যে। আমি বুঝেছি এই যে, তিনি যখন জলের বিম্ব বলেচেন, সেই বিম্ব শুধু পঞ্চভৌতিক দেহমাত্র নয়,—তিনি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এই আকাশ পর্য্যন্ত ঐ এক বিম্বের মধ্যে ফেলেচেন অর্থাৎ পঞ্চ স্থূলভূত, সূক্ষ্ম তান্মাত্রিক ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত যা কিছু অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত, যা নিয়ে আত্মা এই জগতে নানাভাবে ভোগ বা খেলা চালিয়েছিলেন, সবটাই বিম্ব উপাধিতে সম্পূর্ণ করেচেন।

—তা হলেও তো শেষে আত্মা থাকেন ?

—হাঁ, সেই তো কারণ-রূপী পরমাত্মা জল বা সমুদ্র, আত্মা জীবরূপে তার উপরেই বুদ্‌বুদ্‌ হয়ে ভৌতিক জগতে নামরূপ নিয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ-রসাদি ভোগ করে বুদ্ধি-বিবেক-জ্ঞানাদি আনন্দ লাভ করেচেন। এতে তো আমার মতেরই সমর্থন রয়েচে।

এবার শীল মশাই বলিলেন, রামপ্রসাদ যখন বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ বলেছেন, তুই অর্থাৎ নামরূপ উপাধি সংযুক্ত জীবেই যেন লক্ষ্য করেচেন মনে হয়, তাকেই আবার ঘটাকাশ বলচেন, এখানে ঘট দেহটা মাত্র আর আত্মা বা চৈতন্যকে ঘট মধ্যস্থ আকাশ বলেচেন ; তাহলে বাইরে থেকে আকাশ ও জলের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব বেধে যাচ্চে অর্থাৎ আকাশ জল ও ঘট তিনটে নিয়ে হচ্চে ব্যাপার—

পণ্ডিত! বিচার তোমার ঠিকই হয়েচে, কিন্তু রামপ্রসাদের জ্ঞানে এই যে কারণ রূপ জলে চৈতন্য পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম ঐ আকাশকেই বুঝাচ্চে। আর এইটাই বুঝলে যথার্থ সমস্যার নিরসন হয়, এটা দেখচো না,—তোমার বেদান্তের চক্ষু দিয়েই তো দেখতে হবে; —সকল তর্কের মীমাংসাই তো সেইখানে। স্থূল থেকে সূক্ষ্মাদি কারণ পর্য্যন্ত যা কিছু ওতঃপ্রোত আকাশের মধ্যে পুরে দাও না তাতেই সব সহজ হয়ে আসবে যে। ঘট ভাঙ্গলেই আত্মা ব্রহ্মরূপ কারণে লয়।

প্রসন্নমনে পণ্ডিত হাসিলেন। সবাই যেন তৃপ্তি পাইল।

ব্রহ্মচেতন পাশের কৌটা থেকে ত্নটি পান মুখে দিয়া বলিলেন,—এবার কি? আজ আর কিছু নয়—একটা গান হোক্। শ্যামবাবুকে আর নয়, এবার অতুল সেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আর সমস্যামূলক গান নয়,—এবার গানের মত গান হোক—

একজন আমাদের মধ্যে স্বামীর কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন,—শ্যামবাবুর গান আমাদের অনেক শুনা আছে, এখন অতুলদার গানই একখানা হোক। অতুলদা কর্ণেল-গঞ্জ থিয়েটার-পার্টির একজন পেট্রন, এখানকার সবাই অতুলদা বলিতে প্রেমে ও সম্ভ্রমে উন্মত্ত। অতুলদা কিন্তু লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া একবার বলিলেন, এখানে আমার গান ঠিক হবে না। ব্রহ্মচৈতন্য বলিলেন, এখন ঠিক হবে কি না-হবে সে আমরা বুঝবো, তুমি তো গাও। তখন গাইলেন,—

যখন তুমি গাওয়াও গান, তখন আমি গাই,
গানটি যখন হয় সমাপন, তোমার পানে চাই। ইত্যাদি।

গান হইয়া গেলে পর স্বামী বলিলেন, আমার কথা রেখে শ্যামবামুকে একটা গাইতে হবে, নাহলে ওঁর মনটা কেমন করবে। অতএব শেষ গান শ্যামবাবুই গাইলেন।

কাজ কি মা সামান্য ধনে,—ওমা কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে।
সামান্য ধন দিবি যদি পড়ে রবে ঘরের কোণে,—
তবে দাও যদি তোমার অভয় চরণ রাখি হৃদি-পদ্মাসনে।

গানটি এমনই তন্ময় হইয়াই গাইলেন, শুনে সবাই মুগ্ধ হইল সত্য কিন্তু অতুলদা খুব বেশী মুগ্ধ হইলেন—এমন কি যেন তিনি একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

গানের পরেই ব্রহ্মচেতন একটি আঙ্গুল উঁচু করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমনই সময়ে এক দৃঢ় পদক্ষেপ শব্দ আমাদের সবার কানে আসিল, তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিলেন এক মূর্ত্তি। স্বামীজীর সামনেই দরজা, তিনিই আগে দেখিয়াছিলেন তাই আর কথা বলিলেন না। সেই মূর্ত্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া একেবারে জজ সাহেবের কাছে আসিলেন ও পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়াই, তারপর পাশে স্বামীজীকেও ঐভাবে প্রণাম করিবার পর দাঁড়াইলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, ফটিক, তুমি ক্লান্ত, এখন স্নানাহার করে

বিশ্রাম করোগে,—স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার ভাইপো, কলকাতা থেকে এই মাত্র এসে পৌঁছালো। আজ ওরই আসবার কথা ছিল। জজ সাহেবের ভাইপো কিন্তু কলকাতা থেকে এলেও বিশ্রাম বা স্নানাহারের জন্য চলিয়া গেলেন না, বলিলেন, কাকা, খাওয়া আমার ঠিক সময়েই হয়েচে ট্রেনে, সব ঠিকই আছে, বিকালে স্নান করবো, এখন এমন একটা সুযোগ ছাড়া হবে না, আপনি বলুন যা বলছিলেন, আমি অসময়ে এসে পড়ে আপনাদেব ক্ষতি কবলাম বোধ হয়। স্বামীর দিকে চাহিয়া এই কথাগুলির পরই বসিয়া পড়িলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন জোড়হাতে।

ব্রহ্মচেতন বলিলেন, ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে, তোমার মত একজন লম্বা-চওড়া শ্রোতা কান পেতে বসলে শুভফলই হবে। বোসো,—বলতেই ফটিক বসিল। ছ' ফুটের উপর প্রায় চার ইঞ্চি দীর্ঘ শরীর, বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, কিন্তু মুখখানায় বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত, আর চক্ষু দুটি তীক্ষ্ণ বটে কিন্তু মুখেব তুলনায় ছোট থাকায় ব্যক্তিত্বের ছাপ কোথাও নেই, তবে আছে একটা নমনীয় ভাব। সেইটাতেই বোধ হয় আমরা অপ্রসন্ন বা বিরক্ত হই নাই বা হইতে পারি নাই। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হইবে।

ফটিক বসিবার পর জজ সাহেব সস্নেহে তার দিকে চাহিয়া একটু পরিচয় দিলেন—ছেলেটি সাধুভক্ত, আর নিজ ভাব অসাধারণ রকম প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, বাইরের ব্যবহারে কোন রকমেই টের পাওয়া যাবে না যে ওর মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসী বা যারা সাধনভজন করে তাদের উপর কতটা আকর্ষণ, তাদের খুঁজে খুঁজে সঙ্গ করাই ওর হবি। আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত, অথচ আমাদের সমাজেরও সব আড্ডাতেই বসে আড্ডাকে মশগুল করে রাখে। এখানকার সবাই ওকে জানে, ও এলে আর এক রকমের আড্ডা বসে যাবে এখানে।

যতক্ষণ কথা চলিতেছিল, ফটিক চুপচাপ আসনপিঁড়ি বসিয়াছিলেন, জজ সাহেবের কথা শেষ হওয়া মাত্রই স্বামী বলিলেন, আর বলতে হবে না, চিনেচি, এই বলে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখো, কি চমৎকার এক সাধু;—ফটিকের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, এর সব সময়েই জপ চলে, দেখো কি সুন্দর অভ্যাস—যাদের হয় তাদের এমনিই হয়। আমরা দেখিলাম, কোলের উপরেই হাতের তালু উবুড় করা, তার মধ্যে অর্থাৎ ভিতর দিকে গোপনে করাঙ্গুলীর পর্ব্বে পর্ব্বে জপের ছন্দে ছন্দে তাঁর বুড়ো আঙুলটি নড়িতেচে, শরীর স্থির। স্বামীজী ঠিক লক্ষ্য করিয়াছেন; আমাদের দেখাইয়া দিতেই ফটিক একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়াই দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আসচি—

স্বামী তাহাকে যাইতে দিলেন না, বলিলেন, বোসো, বোসো, হজম করতে শেখো, আত্ম-অভিমানকে প্রশ্রয় দেবে কেন, তোমার সামনে গুণের কথা হলেই বা, তাতে বিক্ষেপ আসবে কেন, তুমি তো জপে রয়েচ। জানো তো, আত্মশ্লাঘাটা মৃত্যুতুল্য,

মনে আছে যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনের গল্পটা! ফটিক তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচেতনের পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া আবার বসিয়া পড়িল, বলিল, ঐখানেই একটা কেমন দুর্ব্বল হয়ে যাই, সহ্য করতে পারি না,—তারপর বলিল, ঐ গল্পটি বলুন আপনি, কথাটা তুললেন যখন, আমারও শুনে লাভ আছে।

নাহার মশাই বলিলেন, শুধু আপনার কেন আমাদের সবারই লাভ আছে বলতে পারেন। পুণ্য মহাভারতের কথাই বলচি, আমরা এতগুলি লোক এখানে আছি, সবাই হিন্দু বলতে গর্ব্ব অনুভব করে থাকি, সত্যই বলুন তো? শীল মশাই কিম্বা রামানন্দবাবু এঁদের কথা আলাদা, এঁরা ছাড়া মহাভারত কে পড়েচে, সমুদয় ভারতের কথাই বলচি। সবাই চুপ—স্থির। তখন জজ সাহেব অত্যন্ত মৃদু স্বরেই বলিলেন, আমি পড়েছি, তন্ন তন্ন করে দুবার পড়েচি, বলতে পারি। অবশ্য তখনকার ন্যায়-নীতি, ব্যবহারিক আইন-কানুন, সমাজবিধি, এই সব জানবার জন্যই বিশেষভাবে পড়েছি; অনেক যত্নেই সংগ্রহ করে রেখেচি। এমনই একটা নেশা হয়েচে, আবার একবার পড়বার ইচ্ছা আছে। রিটায়ার করে ঐ নিয়েই থাকা যাবে স্থির করেচি।

ওখানে কম-সে-কম পাঁচ-ছয়জন প্রফেসার, এম. এ সবাই, কেউ হিষ্ট্রি, কেউ ফিলসফি, কেউ ইংলিশ,—বিজ্ঞানবিদ্‌ও ছিলেন একজন। শেষে হিষ্ট্রির প্রফেসর যিনি, তিনি একটু যেন বিনয়পূর্ণ সরলভাবেই বলিলেন, সত্য, সম্পূর্ণ পড়া তো দূরের কথা হয়তো খানিকটাই পড়েচি,—ঐ গ্রন্থ দুর্লভ। তবে এটা সত্য, কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীরামের মহাভারত পড়ে মন ভরে না।

একজন বলিলেন, এখন বোধ হয় সময় এসেছে যখন রামায়ণ মহাভারতের মূল থেকে বাঙ্গলা ভাষায় ভাল একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। তা না হয় কালী সিংহের কিম্বা বর্দ্ধমান রাজবাড়ির মহাভারতই পুনর্মুদ্রিত হোক। তাঁর কথা হয়ে গেলে রামানন্দবাবু বলিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের নূতন সংস্করণ, দফায় দফায় প্রকাশিত হচ্চে, বনপর্ব্ব পর্য্যন্ত বেরিয়ে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া শেষে বলিলেন, আসল কথাটা যা হচ্ছিল,—

হাঁ, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের গল্প,—বলে স্বামীজীকে ফটিক বিনীত অনুরোধ করিলেন, গল্পটি আপনার মুখ থেকেই শুনবো আমরা।

স্বামী বলিলেন, আসল গল্পটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু ঐ সহজ হাল্কা একটা ঘটনার সম্পর্কে ক্যাপিটাল পানিশমেণ্টের ব্যবস্থাটাই ওর বৈশিষ্ট্য,—তারপর আবার ঐ চরম দণ্ডের বিকল্প যেটা সেটাও এখনকার দিনে শুনতে হাস্যকর মনে হবে; এখন তা হলে গল্পটা হয়ে যাক।

দ্রৌপদীর আগমনের পর পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আপসেই একটা নিয়ম বিধিবদ্ধ

হয়েছিল যে, যথাকালে ভাইয়েদের মধ্যে যার পালা,—সেইই দ্রৌপদীর কাছে যখন থাকবেন, তখন যদি অন্য কেউ সেখানে যান, সে অবস্থায় মৃত্যুই হবে তার প্রায়শ্চিত্ত। এখন সেদিন হোলো কি—তখন যুধিষ্ঠির ছিলেন দ্রৌপদীব কাছে সেই সময় অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের প্রয়োজন গুরুতর কারণে, সে আবাব আব এক গল্প। মহাভারতের মত গল্পের সঙ্গে গল্পের জটপাকানো এমনটি আর কোথাও নেই। এদিকে, আবার তাঁর গাণ্ডীব ধনু ছিল এমন স্থানে যেখানে দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বয়েছেন। ওদিকে অর্জ্জুনের পক্ষে সে আবার এমনই সঙ্কট যে গাণ্ডীব ব্যতীত সেই সঙ্কট মোচন সম্ভব নয়। এমন নাটকীয় পরিস্থিতি না হলে অত বড একটা পরিণতিই বা হয় কি করে। কাজেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবটা এনে তখনকার মত কাজ উদ্ধাব করতেই হোলো,—তারপর যখন প্রায়শ্চিত্তের সময় এলো, যুধিষ্ঠির বললেন, ওতে কোন দোষ হয়নি, তুমি যখন অজান্তে গিয়ে পড়েছিলে তখন প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নই ওঠে না। অর্জ্জুন সত্য-সঙ্কল্পে স্থির, জান্তেই হোক অজান্তেই হোক, অপবাধ অপরাধই, প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তারপব যা হয়ে থাকে, কঠিন সমস্যার যখনই উদ্ভব হয তাই হোলো,—সখা কৃষ্ণ এলেন। অর্জ্জুনকে বুঝিয়ে দিলেন এরকম তুচ্ছ একটা ব্যাপারে প্রাণত্যাগ করবার মত প্রাণ তোমার নয়, সুতরাং তোমার ওভাবে আত্মহত্যা করা হবে না, বিকল্পে একটা কিছু করলেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে। আত্ম-শ্লাঘা মৃত্যুতুল্য পণ্ডিত বচন, অতএব খানিক ঐ কর্ম্ম করে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেল। এই তো ব্যাপার। এখন ঐ ধরণের এক একটা এমনই অবস্থা আসে যখন সত্যরক্ষা আবার আত্মরক্ষা দুটিকে এক সঙ্গে বক্ষা মহামুস্কিল হয়, তখন পণ্ডিত বচনে একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ই বা কি। আসলে এইটিই হোলো এর মোদ্দা কথা। তখনকার বীরের বীর ছিল বটে কিন্তু মোটা বুদ্ধি ছিল একথা বলতেই হবে। ফটিক বলিলেন,—

তবে তাঁরা সরল ছিল এটা সত্য। শুনে তৎক্ষণাৎ স্বামী বলিলেন,—

সরলতা ভালো, এখনকার লোকেরও সরলতা আছে, তখনকার তুলনায় এরাও কম সরল নয়। আচ্ছা, সরল লোকে আত্ম-সুখ্যাতি কি ভাবে গ্রহণ করে সেটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। এইমাত্র মহাভারতের এক নায়কের কথায়, আত্মশ্লাঘাটা মৃত্যুতুল্য বলা হয়েছে অন্ততঃ যখন এই রকমই ধারণা ছিল, তখন ঐ আত্মশ্লাঘা অর্থে নিজের গৌরব নিজেই দম্ভ করে প্রচার করা, এই তো,—এই যে শ্লাঘা এটা কখন দোষ? অথচ দেখা যায় না কি—আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ কর্ম্ম-গৌরব নিজেই প্রকাশ করে, তখন আরম্ভ করে এই বোলে, যথা,—বললে কারো অহংকার মনে হবে, তাই আমি বলতে চাই না, অথবা আমি অহংকার করচি না তবে আমি, অমুক অমুক কাজ করেছি ইত্যাদি। এটা কি আত্মগৌরব প্রকাশ নয়? সে কালের লোকেরা আগে নিরহঙ্কারের ভণিতাটা না-হয় করতো না। তারপর এখনও ঐ ভাবে ভণিতা না করে সোজা আত্মগৌরব প্রকাশ

করাও তো আছে। যথা, আমি ঐ দুঃস্থ লোকটাকে এতটা টাকা দিয়েছি, ওর বাড়িতে অসুখ ছিল যখন, তখন এত দিয়েচি অথবা অমুক অমুক কাজ করেচি, ইত্যাদি। এখন ফটিক বলো তো, তোমার নিজের গৌরবের কথা শুনে তোমার কি মনে হচ্ছিল, সরল সত্য বলবে। ফটিক সোজা স্পষ্ট ভাবেই বলিল, মনে হচ্ছিল, মা ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও, আমি প্রবেশ করি।

আমরা সবাই মুগ্ধ হইলাম। স্বামী আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, এই দেখো, সরল সত্য কি রকম বিশ্বাস আনে। তাবপর বলিলেন, যারা আত্মশ্লাঘা ভালবাসে তাদেব কিন্তু একটা সত্যের জোর থাকে, সেই জোরে তিলকে তাল কবে বলতে ভাল লাগে আর তাই না তার ঐ প্রবৃত্তি। সময় সময় অপবের মুখে নিজ সুখ্যাতিব কথা শুনতে পেলে তার আত্মশ্লাঘাটা একটু কম হয়। যে নিজ সুখ্যাতির কথা বা গৌরবের কিছু অপর কারো মুখে শুনতে পায় না তারই নিজেব ঢাক নিজেকেই বাজাতে হয়। মানুষ কিন্তু সৎ-ভাবাশ্রিত হলে আত্মপ্রশংসা করা তো দূরের কথা শুনতেও পারে না। শুনলে অস্থির হয়ে পড়ে,—তার কারণটা কি ?

স্বামী নিজেই বলিতেছেন, যে আত্মার মধ্যে সৎভাব প্রবল, সে জানে যে, যে মনোভাব নিয়ে একজন প্রশংসা করচে, আবার তাকে শুনিয়েই করচে, তার মধ্যে কতক মিথ্যাও আছে, তার অগোচরে কখনও এতটা করে না। সে মিথ্যাটির সরল স্বরূপ,—আসলে তাব ঐ গুণবর্ণনাটি উদ্দেশ্যমূলক, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই সে তাকে শুনিয়েই তার গুণ বর্ণনা করচে। তাই সেটা তার এতটাই বিরাগের কারণ হয়। ফটিক বললে, আমার আরও একটা কথা মনে হয় সেজন্য এতটা বিরক্তি আসে। কি ? যে পরিমাণ গুণের ভার অযথা তার ঘাড়ে চাপানো হচ্চে, সত্যই সে অতটা ভার বহনের উপযুক্ত নয় কাজেই অতটা তার দাবীও নয়। এইটাই সবার বড অসহ্য, কারণ মিথ্যার ব্যঞ্জনাই তাকে দুঃখ দেয়।

স্বামী বলিলেন, এই দেখ, দ্বিতীয় কারণটিও অতই সত্য। গুণের বর্ণনা শুনলেই যথার্থ গুণবান বুঝতে পারে তার কতটুকু প্রাপ্য। এও আবার দেখা যায় ; সময় সময়, কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের গুণ-ব্যাখ্যাকারীর একটা মত্ততা আসে, সেই অবস্থায় অযথা প্রশংসা বেরিয়ে যায় তার মুখ থেকে যা সে সামলাতেই পারে না,—যথার্থ গুণবানের মনে তখনই, মা ধরিত্রী দ্বিধা হও আমি প্রবেশ করি—এই অবস্থা আসে।

কিন্তু, সত্য প্রশংসাতেও অনেকের আত্মপ্রসাদ আসে না বরং সময় সময় একটা অবসাদ আসে এমনই বোধ হয়। তার কারণ কি ? ফটিকের দিকে লক্ষ্য করিয়া, তোমার কি মনে হয় ?

ফটিক বলিল, এবার একটু জটিল ব্যাপার ; আমিও এ নিয়ে একটু ভেবেছিলাম।

যে গুণের জন্য এত প্রশংসা, হায় হায়, এ কি শুধু একলা আমাকেই পেতে হয়, আর কারো অধিকার নেই এতে ? সমাজের এমনই দুর্গতি এমনই অবস্থা ,—এই কথা ভেবেই অধিকারীর আত্মপ্রসাদ ভোগ হয় না।

স্বামী বলিলেন, এটি মহৎ মনেরই পরিচয়। আচ্ছা, এবার একটা ধাঁধার উত্তর দাও তো,—

একটা যথার্থ গুণের বর্ণনায় যথার্থ আনন্দটি পায় কে ? ফটিক বলিল, যে বর্ণনা করে প্রথমে সেই পায়, যদি তার ব্যাখ্যা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারপর আনন্দ পায় সে, যে লোক ঐ ব্যক্তির পক্ষপাতী। তারপর তাতে মিথ্যার ব্যঞ্জনা থাকলেই এই গুণ বর্ণনা তোষামোদের পর্য্যায়ে পড়ে যেটা শ্রোতারা বিরক্ত হয়েই শোনে। স্বামী বলিলেন, স্বতঃ-প্রণোদিত গুণ-বর্ণনার যথার্থ কারণ লক্ষ্য করলে সবাই দেখতে পাবে, যার যে গুণটি নেই, অপরের যদি সেটা থাকে দেখা যায়, বা তার কোন পরিচিত ঘনিষ্ঠ বান্ধবের মধ্যে যদি সেই গুণটি বিশেষভাবেই থাকে, সে ঐ গুণের পক্ষপাতী হয়ে পড়ে। কারণ তার অভাবটাই ঘন ঘন তার মনকে আঘাত দেয়, ফলে তাকেও ঐ গুণের অধিকারী করে তোলে যথাকালে। মানুষের যে এ দিকে লক্ষ্যই নেই,—যদি থাকে তো সহজেই দেখা যাবে যে—এই ভাবে একজনের গুণ অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। একজনের থেকে আর একজনের মধ্যে সংক্রমণের ব্যাপার, দোষ গুণ সকল কিছু ভাবেই অবিরাম চলেচে আমাদের মানুষ সমাজের চারিদিকেই। মোট কথা যার যে গুণের অভাব, সে সমাজের আশপাশ থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে জীবন পূর্ণ করে। ছোট বড় দোষগুণ আমাদের নিজ নিজ জীবনেই দেখা যাবে, অনেকেই অনুকরণ বা অপরের অনুসরণ করেই আমরা পেয়েচি। শিশু বয়স উত্তীর্ণ হলে পর থেকেই দেখা যায় ঐ অনুকরণ বা অনুসরণ-স্পৃহা চলেচে, বালক যুবা এমন কি প্রৌঢ় অবস্থায়ও ছাড়ে না। নমনীয় মনে ওটার প্রভাব বেশী। আমরা কত সুখ পাই এক একটি সুপটু লোকের অনুকরণ দেখে ও শুনে। সমাজে এ একটি বিশেষ উপভোগ্য বিষয় যে। ব্যঙ্গ ছাড়াও অনেক কিছু অনুকরণের ব্যাপারে সমাজের দোষ বা অপগুণ সংশোধনের কাজ হয়ে যায়।

স্বামী বলিলেন, এ গেল একদিক,—এর আসল তত্ত্বটি এবার বোঝো। গুণগ্রহণ প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে অতি সহজ হয়েই আছে , স্বাস্থ্য ভাল থাকলেই ঐ প্রীতি সহজেই ফুটতে পায়, তাহলে আসল কথাটা হোলো কি ,—ভালবাসা নয় কি ? ঐটি না থাকলে সবই তো অন্ধকার। তুমি যাকে গুণ বোলচো সেটা আমার কাছে দোষের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যদি ভালবাসা বা সহজ প্রেম ধর্ম্ম আমার মধ্যে না থাকে। গুণগ্রহণের শক্তিটাই তো প্রেম যা মানুষের সহজ বৃত্তি। মানুষ দোষী হয় কখন ? ঐ বস্তুর অভাবেই না যত দোষের উৎপত্তি ? ভেবে দেখো, ভালবাসা মানুষের সহজাত, ঐ ভালবাসা বা প্রেম,

বৃত্তি বা ব্যবহার,—বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায় ? সোজা দেখলে গুণ, বাঁকা দেখলে দোষ,—সোজা চললে মিত্রতা, বাঁকায় শত্রুতা আনবে। সকল আমি, যেখানে এক সত্তা, দ্রষ্টার অবস্থায় থাকলে বা দেখলে, এখানকার সকল কিছুই আত্মার খেলা। কি অপূর্ব্ব আনন্দময় উপভোগ ; কিন্তু ঐ অবস্থা থেকে নেমে মনের ভূমিতে, তুমি আমি, তোমার আমার এই ভেদের ক্ষেত্রে এলে, ছোরা মারামারি রক্তারক্তি দেখে কি মনে হয়, এ জগৎটা কি সত্যই প্রেমের ?

তুমি কি বলবে ফটিক ? ফটিক বলিল, তখন মনে হয় আত্মহত্যা করি, এখানে আর থাকবো না। এখানে সবই খারাপ, থাকবার উপযুক্ত জায়গা এটা নয়।

স্বামী বলিলেন, এটাও তো তুমি জানো,--বাউলের গানে,—

যে প্রেমেতে সৃষ্টি স্থিতি সেই প্রেমেতেই হয় প্রলয়।—গানটা জানো ?

প্রেম কি সকল ধাতে সয়।
প্রেম বুঝতে হয়, প্রেম শিখতে হয়,
প্রেম তো কথার কথা নয়,
—প্রেমের মানুষ না হইলে প্রেম কি সেথা রয়। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

৮

যোগটা কি ?

সুরেনবাবুও মিউর সেন্‌ট্রাল কলেজের একজন প্রোফেসর। তিনি বড় গম্ভীর লোক। তা ছাড়া তাঁকে দেখতে সবার কনিষ্ঠ বোলেই মনে হোতো, তাঁর অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি শরীর বোলে যেন বয়সেও ছোট্ট মানুষটি। তিনি আস্তে আস্তে, একটি একটি কথায় বেশ গম্ভীরভাবেই বলিলেন,—

আপনাকে যোগী বোলেই আমরা শুনেছিলাম, যোগ সম্বন্ধেই কিছু শুনতে পাবো এই আশা করেই এসেছিলাম,—

স্বামী কথাটিকে রহস্যচ্ছলে এই বলে সম্পূর্ণ করে দিলেন,—তা না হয়ে কোন্নকে দেহ-ত্যাগের পর আত্মার গতি কি হয়, তাই নিয়ে এতকাল হোলো, কেমন ? কিন্তু কি করা করা যাবে বল। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম। এই মহাত্মাই যে ঐ কথাই তুললেন, বলে জজ সাহেব প্রমোদাবাবুর দিকে আঙ্গুল দেখাইলেন, এবং জজের হুকুম মানতে বাধ্য, বলিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। তারপরেই আমাদের ফটিক এলেন।

ঐ সময়ে, মাত্র তিন-চারদিন আগে জজ সাহেবের কোন আত্মীয়, সমবয়স্ক আবাল্য খেলার সাথী, কলকাতায় মারা যান। তাঁর কথাটাই তিনি তখন মনে বেশী বেশী

ভাবিতেছিলেন, কাজেই আজ প্রথমেই তাঁর মুখ হইতে ঐ প্রশ্নটাই উঠিয়াছিল, দেহ-ত্যাগের পর জীবের কি গতি হয়, এ জীবনের কথা তার মনে থাকে কিনা, ইত্যাদি। তখনই জজ সাহেব, কৈফিয়ৎ হিসাবে আমাদের এই কথাগুলি সরল ভাবেই বলিলেন। তাঁর মুখে ঐ কথাগুলি শুনিবার পর আমাদের প্রাণে একটা বেদনার হাওয়া যেন বহিয়া গেল।

পণ্ডিত শীল এবার বলিলেন, ওঁর মুখ থেকে যোগের কথা শুনবার সময় তো যায়নি, এখনও তো হতে পারে, অবশ্য যদি ওঁর ইচ্ছা থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ফটিক বলিয়া উঠিল, আজ আমার এখানে পৌঁছানোটা মহাসুকৃতির ফল বলতেই হবে।

স্বামী বলিলেন, কলেজের লেকচার যেমন হয় সেই ভাবেই শুনতে চাও, না কি কোয়েশ্চান ক্লাস হবে? যা তোমরা বলবে আমি তাই করবো। কিন্তু এটাও বলে রাখি —যদি এতক্ষণ বসে ক্লান্ত হয়ে থাকো, ফটিক ছাড়া বোধ হয় সবাই হয়েছ—তাহলে একটু যাত্রা বদলে এসো।

ঠিক এমনই সময়ে জলযোগের ব্যবস্থা। চা-পানের জন্যে সবাইকে উঠে ভিতরের বারান্দায় যাবার ডাক এলো। আশ্চর্য্য এই যে, ঠিক যে কয়জন ছিলাম আমরা, ঠিক তত-গুলির ব্যবস্থা বা আসন হইয়াছে। স্বামীজীও বাদ গেলেন না, অবশ্য তাঁর পৃথক আসন হইয়াছিল ঘরের মধ্যে। জলযোগের পর মহানন্দে একটু বাগানের মধ্যে চলাফেরা করিয়া সবাই আবার আসিয়াই বসিলেন, ততক্ষণে স্বামীও আসিয়া গিয়াছেন নিজ আসনে।

যোগের কথা বলতে আগে যম, অর্থাৎ সংযম নিয়েই কথা, তারপর নিয়ম। দৈনন্দিন সকল ক্রিয়া-কর্ম্ম যা করবার কথা, তারই নিয়ম। তারপরেই আসবে আসনের কথা। এখনকার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসাটা সংযমের প্রতিকূল। একটা কথা তোমরা সবাই খুব ভালই বুঝবে যে, তোমরা যতক্ষণ চেয়ারে বসে কাজ করো,—ভেবে দেখো কতবার শরীর নাড়াচাড়া করতে হয়। তারপর বসাতে সবার বড় বিঘ্ন হল হেলান দেওয়া, মেরুদণ্ড অপর এক কঠিন জড় পদার্থের উপর ঠেকিয়ে বসা,—সেটা আলস্যপ্রসূত অবশ্য, যাকে বলে আরাম, তারই জন্য। কাজেই তোমাদের যোগের কথা শুনে লাভ কি? দুঃখিত হোয়ো না।

কেহ দুঃখিত হইল কিনা তাহা বুঝা গেল না—তবে সবাই সোজা হইয়া বসিলেন, এমন কি জজ সাহেব পর্য্যন্ত উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন তাঁর চেয়ারে। আরও, সবার মুখ হইতে যেন একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল,—ঠিক ঠিক। পণ্ডিত কিন্তু ঠিক যেমন ভাবে ছিলেন তেমনই রহিলেন, নড়াচড়া কিছুই করিলেন না, তিনি সামনে একটু ঝুঁকিয়াই বসিয়াছিলেন। কেবল সবার গতি লক্ষ্য করিয়া একটু যেন হাসিলেন। তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

এখন, কেন মেরুদণ্ড কোনো জায়গায় ঠেকিয়ে বসতে নেই তার কারণটি জেনে রাখ। আমাদের মূল যে প্রাণ, সেটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ায় রত বায়ুমাত্র নয়, বরং সেই প্রাণের শক্তিতেই ফুসফুসের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের প্রতিক্ষণের ক্রিয়াটি চলছে, এই কথা বললেই ঠিক হয়। তার পর এটাও জেনে রাখো যে, প্রাণ কোন বায়বীয় পদার্থ নয়। কথায় ঠিকভাবে বলতে গেলে এই কথাই বলতে হবে, প্রাণ এক অপরূপ শক্তি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অথচ ইন্দ্রিয়ের পরমগতি, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, যাব স্পন্দন ও কম্পন দু'ভাবেই চলেছে সর্ব্বক্ষণ ঐ মেরুদণ্ডেব মধ্যে অতীব সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীল রেখার আকাবে,—সেই বেখার উৎপত্তি তার কম্পন স্বভাব বলেই। নাহলে কোনও আকার নেই তাব। যোগীর অনুভবেব মধ্যে অতীব সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় বেথার আকারে ধরা পড়ে।

ঘরের মধ্যে কারো চাঞ্চল্যমাত্র নেই, সবাই স্থিব। এখন নিস্পন্দ নীরব সোজা হইয়া বসিয়া সবাই শুনিতেচে। সবাই স্তব্ধ। এইটাই এখন একটি বিশেষ উপভোগ্য বিষয় হইয়াছিল। স্বামী প্রসন্নমুখে এইটি লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আবার আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে যে কথাটি জানা তোমাদের নিতান্তই প্রয়োজন, এই যে মানুষ জন্ম-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যোগে অধিকারী হয়ে জন্মায় এবং প্রথম শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ আরম্ভ থেকে শেষ শ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত যোগীই থাকে। আসলে যে যোগের কথা তোমবা শুনতে এবং জানতে চাও সেই যোগে যুক্ত থাকাই তোমাদেব স্বভাব, ধর্ম্ম ও বলা যায়, বললে ভুল হবে না। প্রত্যেক কর্ম্মে এই যোগই হোলো মানুষের প্রধান অবলম্বন। জীবন থেকে এটিকে আলাদা কবাই যাবে না, শ্বাস-প্রশ্বাসেব মতই সহজ এই যোগাবস্থা। মানুষকে যদি যোগী-জীব বলা যায় তা হলেও কিছুমাত্র ভুল হয না। কারণ যোগযুক্ত না হয়ে মানুষ কিছুই কবতে পারে না। মানুষে সেই শিশুকাল থেকে যা কিছু করচে তা যোগযুক্ত হয়েই করচে। আরও পরিষ্কার কবে বলতে গেলে এই কথাটা বললেই ঠিক হবে যে আমরা যা কিছু করতে পাবি তা যোগবলেই পাবি, যা পাবি না তা ঐ যোগের অভাবেই পারি না। কেমন ? কিছু যদি মনে না কর আবও একটু বলি। একজন ডাকাতও যত বড যোগী, এ সংসাবে একজন উকিলও তত বড যোগী। এখন এর সম্বন্ধ শরীর ও মনের সঙ্গে, একটু স্থির হলেই সেই সম্বন্ধটি বুঝতে সহজ হবে। দেহের মধ্যে তো প্রাণই মূলাধার, কাজেই প্রাণকে নিয়েই সবারই কারবার।

প্রাণের কথা আগেই বলছি, দেহ থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এ সবই প্রাণের কর্ম্মপ্রেরণাতেই সম্ভব হয়েচে। এক কথায় বুদ্ধিমনাদি প্রাণের অবস্থান্তর মাত্র। আরও প্রাণের কথায় বলা যায় সূক্ষ্ম ও স্থূল, শরীরের রূপ থেকে যা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য পদার্থ নিয়ে যা কিছু কর্ম্ম চলেছে আমাদের আয়ুকালে, তা একই প্রাণের অভিব্যক্তি। আত্মাকেও প্রাণ বলা

হয়েছে স্থূল সূক্ষ্ম দেহের কারণ রূপে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাণের স্থান হোলো উপরে মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধতম প্রান্তে একটি বিন্দুতে, যাব অপর নাম মূর্দ্ধা, সেখান থেকে মেরুদণ্ডের নিম্নতম প্রান্তে গুহ্যদেশের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত।

এনাটমিক্যাল ডিসেকশানে তাকে পাওয়া যাবে না, কারণ সে একটা বিশেষ স্পষ্ট বা স্থূল বস্তু নয়,—মেরুদণ্ডী প্রাণীব ঐ অংশ থেকেই তাব জীবন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়, এটুকু মাত্র বলা যায়। এর বেশী জানতে হলে তাকে গুরুর কাছে যোগাভ্যাস শিক্ষা করতে হবে এবং ঐতেই তন্ময় হয়ে যেতে হবে, প্রত্যেকটি কর্ম্মে, এমন কি নডাচডায় অভ্যাস কবতে হবে, তবেই স্থৈর্য্য আসবে, লক্ষ্য আসবে,—মূর্দ্ধার অনুভূতি আসবে, ধ্যান ধারণা এবং সিদ্ধি সবই আসবে। জীবের মহিমা বেডে যাবে, জন্ম ও জীবন সার্থক মনে হবে। আবও পাঁচজনকে জানাবার, শেখাবার ইচ্ছা হবে—সেই প্রবৃত্তিতে কর্ম্ম অগ্রসব হলে হিসাব কবে দেখা যাবে, শতকরা নয়, সহস্রকবাও নয, লক্ষকবা একজন হয়তো যথার্থ চায়। তারাই অধিকারী, বাকী যারা তারা চায় না ওটা,—তাবা টুঁটি ছেঁডাছিঁডিটাই বোঝে ভাল, সেই স্বার্থ অন্বেষণ আর অপরের সঙ্গে হল্লা চালানো এবং দ্বন্দ্বযোগটাই তাদের চাই, —স্থির, ধীব, জ্ঞানী, সমাহিত-চিত্ত হবাব প্রয়োজন-বোধই নেই। আপামর সাধারণের মধ্যে কারো যে নেই তা নয়, সাধাবণতঃ নেই, এ আক্ষেপটাই এখানে করে রাখলাম।

একটুখানি স্থির থাকিয়াই তিনি আবাব বলিতেছেন, তা বলে একথা মনে কবলে ভুল হবে যে, মানুষগুলি সব গোল্লায় যেতে বসেছে, যেহেতু তাবা যোগমার্গে বিমুখ। আসলে সবাব তো ওটা হবার নয় এবং দরকাবও নয়। মানুষজীবনে কত কত ভোগ আছে, তার ফলাফলে আরও অনেক কিছু কবতে হবে—জানতে হবে, সেই জানাব ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি সংস্কৃত হতে থাকবে, তাবপব আত্মজ্ঞানেব উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি। সব কথা এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বলা যাবে না, তবে এইটুকু জানা থাকে যে, আমি যোগমার্গে আছি তাই আমি শ্রেষ্ঠ, --এ অভিমান না আসে। কাবণ প্রত্যেক খোলেব মধ্যে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি বাদ দিলে যে সত্তা থাকে তা সকলকাব একই, এতে বাগ-ঝগডা-বিদ্বেষের কিছু নেই, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট বিচার নেই, আছে কেবল একটি পথ, সেটা আত্মবতির পথ। যেখানে সকল আমিই প্রধান। মনে করো, একটা আমি সত্তা যদি ধীরস্থির-মতি হয়, সেটা যেমন তাব নিজেব কথা, তাতে আমার কিছু করবাব নেই, বড জোর এইটুকু ভাবতে পারো যে তার চাঞ্চল্যেব ফলে সে প্রকৃতির নিয়মেই আঘাত পাবে, হয়তো দুঃখও পাবে। তবে ঐভাবে আঘাত পেতে পেতেই তাকে স্থির হতে হবে, কারো উপদেশে বা কথায় তার হবার নয়। এতটা পর্য্যন্ত আমি যে বললাম তার মূল কথা এই যে অহঙ্কার, দম্ভ, গর্ব্ব, আমি শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বোধ, এই সব মনোধর্ম্মের জঞ্জাল থাকতে যোগমার্গে অগ্রসর হওয়া যাবে না। তুমি যদি একজনকে ভালবাসতে না পারো তাকে ঘৃণাও করতে পার না। কারণটা বুঝছ তো,

ঘৃণাটা বা বিদ্বেষটা বা হিংসাটা করবে কাকে? যাকে করবে সেও একটা আমি, অর্থাৎ সত্তায় একই সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে। সেই জন্যই মানুষে মানুষে হিংসাদ্বেষের ফল অনুশোচনা। তাহলে এটা ঠিক, যিনি এই যোগমার্গে আসবেন তাকে এইভাবেই মনের জঞ্জাল সাফ করে নিতে হবে, তাহলেই সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ সহজ হবে। কেমন?

এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর আবার ধীরে ধীরে বলিতেছেন, আমি প্রাণের ক্রিয়ার কথাটাই শুধু বলব, ঐটুকু জেনে রাখলেই তোমাদের হবে, তারপর ভবিষ্যতে কারো ইচ্ছা হলে সে লোক খুঁজে নিয়ে তার উপদেশমত অভ্যাস করে নিজ পথ করে নিতে পারবে। বেশ, এখন শোনো একটি গুহ্য রহস্য,—

প্রাণকে ধরেই প্রকৃতির মূলে যাওয়ার, আর তোমার ইন্দ্রিয়াতীত যে অহম সত্তা, সহজে বুঝবার জন্যই তাকে "আমি"-বোধ এই কথাটিই ব্যবহার করছি। এই "আমি" বোধ নিয়েই আচার্য্য শঙ্করের একটি মহান অথচ সরল ভাষায় বর্ণিত নির্দ্দেশ আছে তোমরা দেখো, তোমাদের অনুভূত "আমি" বোধ সহজ হয় কিনা, —তিনি "আমি" স্বরূপের পরিচয় দিচ্ছেন এই বলে,—

মনশ্চক্ষুরাদির্বিযুক্ত স্বয়ম যো	মনশ্চক্ষুরাদিরগম্য স্বরূপ
মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদি	স্ব নিত্যোপলব্ধি স্বরূপঃহমাত্মা।

প্রথম কতকটা হেঁয়ালির মতই মনে হয়, কিন্তু নির্দ্দেশটি ঠিকই আছে। এটি যোগী ও দার্শনিক পণ্ডিতদের অমূল্য সম্পদ। তিনি বোলচেন, যিনি স্বয়ম মন ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হতে বিযুক্ত কিনা পৃথক, যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতির আদি কারণ অর্থাৎ মনের মন, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি অথচ তিনি স্বরূপস্থ হলে মন ও ইন্দ্রিয়াদির অগম্য, ইন্দ্রিয়াদি আমিকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই নিত্য উপলব্ধি স্বরূপই আমি আত্মা। আমির ইতি পেলে কি? "আমি" উপলব্ধি, বা আমি, আমি এই বোধই ধরতে হবে। ঐটিই চাবি। কথায় এর বেশী বলা যাবে না। কারণ বেশী কথায় তোমরা যা বুঝবে বস্তুতঃ তা ঠিক হবে না, কারণ এখন যা কিছু বোধ বা অনুভব করো তা ইন্দ্রিয় সাহায্যেই ঘটবে তো? ইন্দ্রিয় অতীত সত্তার বোধ বা অনুভূতি সেটা তো তোমাদের হঠাৎ হবার কথা নয়, কারণ তার সঙ্গে তোমার দেখাশুনো অথবা আলাপ যা কিছু, ক্ষণেকের আনন্দের ভিতর দিয়ে। তার সঙ্গে আসলে তোমাদের পরিচয়ই নেই যে। যার সঙ্গে পরিচয় নেই তাকে জানা যাবে কি করে? একটু আভাস দিচ্চি—হয়তো কখনও কখনও কোন শুভকর্ম্মে, শুভ যোগাযোগে একটু আভাসে তাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত তোমার আত্ম সত্তাকে পেয়েছ, বা চিন্তার ফলে উক্ত অবস্থায় আত্মা চকিতে একবার স্বরূপে প্রতিভাত হন, কিন্তু ফলে তার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় আত্মার পরবর্ত্তী নিকটতম পরিবেশ, আনন্দ বলে যাকে নির্দ্দেশ করা হয়েচে, সেই আনন্দের আভাসেই তা শেষ হয়ে যায়। বড় জোর কারো

কারো স্মৃতিতে ধরা থাকে কতকটা এই ভাবে যে, এক সময় এই ভাবে নির্ম্মল আনন্দ ক্ষণেক পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই চকিতের প্রকাশ আত্মস্বরূপের কোন ঠিকানাই নেই তোমার কাছে, কারণ তার সঙ্গে যে তোমার পরিচয় ক্ষণিক। ক্ষণেকের অতিথি, তা না তো কি? কারণ তো বুঝতে পারচো, সাধারণতঃ মানুষের কাম্য হল সুখ, সেটা স্থূল, সেটা বিষয় ও বুদ্ধির অন্তর্গত, মানুষের আর কি কাম্য হবে? সাধারণের একটু উপরে, সৌন্দর্য্য অনুভূতিসম্পন্ন কারো ঐ আনন্দাভাস পর্য্যন্তই। যারা সৌন্দর্য্য উপাসনাই পরম পুরুষার্থ মনে করে, শিল্পের সৌন্দর্য্য প্রচার করে জগৎবাসীর শিল্পবোধ জাগাবার জন্যে মাথা খাটাচ্ছেন, তাঁরা যতই শিল্পরসিক হোন না কেন, আত্মা বা স্বরূপের নিকটতম আনন্দ, সেই আনন্দরশ্মির একটুখানি স্পর্শ করেন। আনন্দের ঘন অবস্থা আস্বাদনের কোন সম্ভাবনাই তার নেই। কারণ বিষয়ী ব্যক্তির সেথা যাবার পথ নেই। শিল্পরসিক যত বড়ই হোন, বিষয়ে ভোগ নিয়ে ঘাঁটা তো তার আছেই, সব শিল্পরসিকই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত যে। বিষয় ছাড়া যে শিল্পী সে ফকির, তার যে শিল্প বা সৌন্দর্য্য বোধ, এবষ্ট্র্যাক্ট সেন্সেই ঠিক ঠিক সৌন্দর্য্যরসিক তারই সৌন্দর্য্য-বোধ ঠিক আত্মানন্দ নিয়ে আছে, অনুভবে সে ধন্য হয়।

ন্যায়ান্যায় বিচারশূন্য হয়ে আমি একটা কথা বলে দিলাম ঝোঁকের মাথায়, যেহেতু আমি শিল্পী। জানি না এঁরা কি মনে করলেন। বলিলাম, শিল্প বা সৌন্দর্য্য বোধে যে আনন্দ আর আত্মানন্দ একই কি?

তা নয় তো কি, আনন্দ যাকে বলচো সেটার উৎপত্তি যে আত্মা থেকেই, সেটা সুখ বা স্ফূর্ত্তি নয়। সুখ বা স্ফূর্ত্তি আর আনন্দ দুটিকে এক করে ফেলো না, দুটি এক নয়। সুখ বা স্ফূর্ত্তি যেটা, তার উৎপত্তি ইন্দ্রিয়গ্রামের সংঘর্ষের মধ্যে, বিষয় থেকে, তাতে তোমায় চঞ্চল করে। নিজ স্বার্থ উপলক্ষ্যে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ, শরীরে রক্ত চলাচলের বেগ বশতঃ উৎপন্ন হয়, আর শরীরের স্বাচ্ছন্দ্যে মনের মধ্যেই তার শেষ, কিন্তু আনন্দ যাকে বলচো তার উৎপত্তি আত্ম সত্তা থেকে, আত্ম স্বভাব থেকে, উর্দ্ধে প্রাণকেন্দ্র থেকে হৃদয়ে তার অনুভব—তাতে তোমায় সংযত করে, উপলক্ষ্য তার সত্য এবং সৎ ভাব থেকেই তার প্রকাশ। তবে আনন্দ গভীর হলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে, সময় সময় দুর্ব্বল শরীরে আক্ষেপও আনে, শরীর পর্য্যন্ত তার প্রসার। অবশ্য বাহ্য লক্ষণে অনেক সময় দুই-ই এক মনে হয়, কিন্তু ভোগে আর উপভোগে যে পার্থক্য আনন্দ ও সুখে সেই তফাৎ। মোট কথা, আত্মস্বরূপ থেকে উৎপন্ন আনন্দ, তার সঙ্গে শিল্পে বা রসিকের সৌন্দর্য্য-বোধের সম্বন্ধ বুঝতে পারোনি তাই সন্দেহ উঠেচে, নয়? আরে আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কে... এই যে সব আমি,—আঙ্গুল দিয়া সবাইকে দেখাইয়া সবাকে শুধাও প্রত্যেকজনকে ভাল...চেয়ে কেউ সুন্দর আছে নাকি, সবারই আমিটি বড় সুন্দর,

রূপে কুৎসিত হলেও—সেই আমিকে ভালবাসার টানেই যা কিছু, নাম্বারে সিঙ্গুলার আমি—সবার বড, ফার্স্ট পারসন তো সেই বড, আমি থেকেই উৎপন্ন, তার কি তুলনা আছে, এটা তো অনেক গভীর কথা কিন্তু আসলে আত্মার বড সৌন্দর্য্য আর নেই, এই থেকেই ঐ নীচের আমির সবার বড রূপবান এই ভাবের উৎপত্তি।

তারপর পাঁচটি কোষের কথা শুনেচ হয়তো,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়,—এই কোষ। কোন কোষের সঙ্গে কোন কোষের ভেদরেখা বিবর্জিত এই কোষগুলির স্বরূপটাও জেনে রাখা ভালো। কিন্তু হে আমার স্নেহাস্পদ প্রিয় বান্ধবগণ, কদাচ নিজের মনগড়া একটা উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন আলাদা যোগাভ্যাস করতে যেয়ো না। গুরু অর্থাৎ এ বিষয়ে এক্সপার্ট টিচার ছাড়া এ পথে গোঁভরে নামলে পরিণাম শোচনীয় হবে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, তাই এত করে বার বার বলচি। বরঞ্চ জীবনে আপন ভাবে মনের জঞ্জাল যে সব তা থেকে মুক্তির অভ্যাস নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কোরো, তার ফল ভালই হবে কিন্তু আসল প্রাণায়াম প্রভৃতি রাজযোগে ব্যাখ্যা পড়ে নিজে থেকে করতে যেও না। এখন পাঁচ কোষের কথাটা একটু বলে নিয়ে প্রাণের কথাই বলবো। কোষ মানে আবরণ।

মনে করো, অন্নে পুষ্ট এই স্থূল শরীরের নামই অন্নময় কোষ, ভিতরে বাইরে যা কিছু সবই অন্নময় কোষ, আত্মার আবরণ পাঁচটি—তার মধ্যে স্থূলতম আবরণটাই অন্নময় কোষ। তারপর শ্রবণগহ্বর চক্ষুগোলক নাসারন্ধ্র, তারপর কণ্ঠনালী হয়ে মাংস অস্থি সম্বলিত মেরুদণ্ড নিয়ে পঞ্জর আর বুক—তার মধ্যে ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, প্লীহা যকৃৎ মধ্যস্থ পাকস্থলী, তার নীচে বত্রিশ হাত নাড়ি যোজিত সবার কেন্দ্র হোলো নাভিকুণ্ড, তার নীচে মূত্রস্থলী, তার সঙ্গে নাড়ীতে যুক্ত উপস্থ বা লিঙ্গ, তারপর পায়ু পর্য্যন্ত নিয়েই ভিতরের ব্যাপার যা কিছু চলচে,—তা হোলো অন্নময় কোষ। আচ্ছা এখন দেখ, অন্নময় কোষ আর প্রাণময় কোষের মধ্যে কোনপ্রকার সীমারেখা টানতে পারো কি ? না, তা সম্ভব নয়,—কেন ? প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষের মধ্যে ওতঃপ্রোত আছে বলেই না কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয় ! এই দুটি যেন একটা হয়ে মিশিয়ে রয়েচে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রাণ অন্নময় কোষে সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত, ঠিক যেমন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত। এটা হয়তো এখানে অবান্তর লাগবে, তা হোক, একটা ব্যাপক বিশ্বপ্রকৃতির কথাও শুনে রাখা ভাল, সময়ে কাজ দেবে এখন না হোক। তারপর এটিও জানতে হবে, প্রত্যেক কোষেরই কেন্দ্র আছে যেহেতু কেন্দ্র না থাকলে সুশৃঙ্খল ক্রিয়া হবে কেমন করে ? সেই শরীর বা অন্নময় কোষের কেন্দ্র হোলো নাভিস্থল বা নাভীকুণ্ড আর প্রাণময় কোষের কেন্দ্র হোলো হৃদয়। যা কিছু প্রাণের ক্রিয়া তা ঐ হৃদকেন্দ্রেই আরম্ভ হয়েচে। এহেন হৃদয়ের ক্ষেত্রটি এমনই প্রশস্ত, ঠিক কেন্দ্র বলতে স্থানটি কোথায় বুঝানো শক্ত, কিন্তু মোটামুটি বুঝতে গেলে

ফুসফুসের সঙ্গে যেখানে হৃদপিণ্ডের যোগ, তারই সন্ধিস্থলে স্থূল কর্ম্মকেন্দ্র। কিন্তু নাভিই বলো বা হৃদয় বলো যথার্থ সূক্ষ্ম কেন্দ্র, তার কর্ম্মশক্তি, পাওয়ার কারেণ্ট যেখান থেকে আসচে সেটা ঠিক নাভিও নয় বা হৃদয় বা বুকও নয়,—আসলে মেরুদণ্ডের মধ্যেই সকল কেন্দ্র, একটু পরেই বলচি তার কথা।

এমনই সময়ে নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া নাহার বলিলেন, স্থূল কর্ম্মকেন্দ্র বললেন,—

হাঁ, হাঁ, বুঝেচি, পাঁচটি কোষের সঙ্গে প্রাণের কথায় আগে শরীরের সঙ্গে প্রাণের যে সম্বন্ধ সেই কথাই বলতে চেয়েছিলাম, তাই দেহের মধ্যে স্থূল ভাবে যেখানে কর্ম্ম চলচে সেই স্থানীয় কেন্দ্রকেই স্থূল কর্ম্মকেন্দ্র বলেচি, পাঁচটি জ্ঞান ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযুক্ত সকল কিছু কর্ম্মই স্থূল বুঝতে হবে। আর এই সকল কাজই চলচে প্রাণের সাহায্যে, শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে সর্ব্বশরীরে রক্ত চলাচল পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নই চলচে এই স্থূল প্রাণের ক্রিয়া। এখন জীবন্ত শরীর থেকে প্রাণকে তো বিশ্লিষ্ট বা আলাদা করা যাবে না, তাই এটা তো বলতেই হবে যে অন্নময় আর প্রাণময়ের মধ্যে সীমারেখা নেই, তাই সেটা টানাও যাবে না। এ যেমন বুঝলে, তেমনি প্রাণময় ও মনোময় কোষের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারিত নেই কেবল বুঝবার জন্য একজনকে অন্তরে চিনে নিতে হবে আর অপরকে বুঝবার জন্য বলতে হবে যে আমাদের চোখের গোলা, কানের গলি ও নাসামূল, যেখান দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াটা চলেচে, ঠিক তার উপরের যে স্তর ঐ অংশই মনোময় স্তর বা কোষ। আবার স্থূলসূক্ষ্ম যত কিছু চিন্তা, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সকল কিছু সূক্ষ্ম ক্রিয়ার ক্ষেত্রও বটে। তোমার চিন্তা মনের, বুদ্ধি বা জ্ঞানের সঙ্গে স্মৃতির সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি যদিও উৎপন্ন হচ্চে ঐ অংশ থেকে অর্থাৎ সেটা ঐ ব্রেন রিজন Region থেকেই, কিন্তু সেটার মাথার ঘিলু পদার্থটা নয় বরং তার নীচে বলাই সঙ্গত। এটাও বুঝবে যে, ব্রেনটার মধ্যে যা কিছু হচ্চে তাকেও শরীর ক্রিয়াই ধরতে হবে, কাজেই স্থূল বলতে হবে তাকেও। তবে রক্তমাংসের বা নাড়িভুঁড়ির ক্রিয়ার মত স্থূল নয়, তার তুলনায় সূক্ষ্ম। স্থূল থেকে এই ক্রমে সূক্ষ্মবিচার করে আসল বস্তুকে ধরতে হবে, যেহেতু স্থূল থেকে সূক্ষ্মের মধ্যে তো লাইন টানা যাবে না। সতর্ক হতে হবে পয়েণ্টটা না হারায়।

তার পর বিজ্ঞানময়, সেটি আরও সূক্ষ্ম, তবে ঐ অংশেই তার স্থিতি, তার পর আনন্দময়ও এমন ভাবে সূক্ষ্ম যে স্থাননির্দ্দেশ ধরা যাবে না, যদিও তারও ক্রিয়া স্থূল সূক্ষ্ম হৃদয় কেন্দ্র পর্য্যন্ত তার সাধারণ বিস্তৃতি কিন্তু বিশেষ ভাবের স্পন্দনে প্রাণময় কোষ পেরিয়ে অন্নময় কোষের সবটাতেই তার ক্রিয়া ও অনুভূতি এসে পৌছায়। যে আনন্দ অনুভূতিতে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে থাকে, শিউরে ওঠে, গায়ে কাঁটা দেয়, এমন কি কেশাগ্র খাড়া হয়ে ওঠে, সেই যে আনন্দ, তার ধাক্কা কম নয়; কোথায় সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে উৎপত্তি হয়ে তার ভাইব্রেশান কেশাগ্র পর্য্যন্ত এসে পৌছায়, বুঝে দেখো ঐ প্রাণের ক্রিয়ার প্রসার। ভাবের

প্রেরণায় বা আনন্দের আতিশয্যে গৌরাঙ্গের লোমকূপ থেকে রক্ত বার হোতো। এর মধ্যে তিলমাত্র মিথ্যা নেই, বৈজ্ঞানিক সত্য।

তা হলে এখন প্রাণের ক্রিয়ার কথায় আমরা তার দু'ভাবের কাজ পাচ্চি। একটি স্থূল,—যেটি শরীরের উপরের সর্ব্ব উচ্চ প্রান্ত, মাথার চুল থেকে সব শেষ নীচে পায়ের তলা, এমন কি নখ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করচে, তার কেন্দ্র হৃদয়, অপর ক্রিয়া সূক্ষ্ম, তার কেন্দ্র হোলো ঐ ব্রেন রিজন বা মস্তিষ্কের নীচে নাকের গোড়ায়, সে স্থানটি মনের, তাকে বর্ণনা করে কথায় বুঝানো যাবে না, স্থির, শান্ত অবস্থায় আভাসে বুদ্ধিমানের কাছে ধরা পড়ে। এক কথায় সেই কেন্দ্রের কথা বলতে গেলে মেরুদণ্ডের শেষ ঊর্দ্ধে প্রান্তে। আরও একটা কথা এখানে বলে নিই, যোগ সম্বন্ধে প্রাণের ক্রিয়ায় কথা বলতে এখানে আমি আমাদের সাধনের যৌগিক পরিভাষা, যেমন ষঠচক্রের কথা প্রত্যেক চক্রের নাম প্রভৃতি ব্যবহার করচি না, কারণ তাতে তোমাদের একটা (কনফিউশান) ধোঁকা আসতে পারে। সে সকল অপরিচিত সজ্ঞাগুলি শ্রবণ মাত্রেই তোমাদের কল্পনা কাজ করতে আরম্ভ করবে ও ফলে সত্যভ্রষ্ট করবে এমন আশঙ্কা আমার আছে। তাই ঐগুলি কেন্দ্র বলেই বলেছি।

কেন, স্বামীজী, আমরা বুঝবো না ?

কারণ তা বুঝবার জিনিস নয়, নিশ্চিন্তভাবে অনুভব করবার বিষয়। তোমরা গোড়া থেকেই ঐ যোগমার্গকে কল্পনায় এমনই দূরে রেখে দিয়েচ তোমাদের জীবন থেকে যেন একেবারেই আলাদা, এমন কি অসম্ভবের পর্য্যায়ে রেখে দিয়েছ, যেন একটা কি ভয়ানক, দুস্তর সাগরের মত দুরতিক্রম্য ব্যবধানময় অবস্থা। আমি তোমাদের সহজেই বুঝিয়ে বলতে চাই যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কাজ, যা প্রাণের সাহায্যে চলেচে আমাদের দেহে,—মাত্র মনটাকে সংহত করলেই প্রাণের সব কিছুই তোমার বোধের মধ্যে সরল ভাবেই এসে যাবে, আর যোগের সেই অবস্থাই হোলো প্রথম ধাপ। তার পর সহজকে এত জটিল দেখতে কোথা থেকে শিখলে যদি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা সটান বলবে শাস্ত্রকারদের দোষে। আমি প্রতিবাদ করবো এই বলে যে, ওটা তোমাদের পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায়ত্ত করায় বিপরীতমুখী চিন্তার প্রভাব আর যথারীতি নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করারই ফলে। তার উপর তোমাদের কল্পনাপ্রবণ মন,—পল্লবগ্রাহী, দুর্ব্বল বুদ্ধির দোষে কতক শাস্ত্র নিজে নিজে পড়ে নিজ মনোগত অর্থ করে, একটা ভাব ধরে নিয়ে বিজ্ঞের মত জাহির করার প্রবৃত্তির দোষেরও বটে, ঘটেচে কতকটা। যেভাবেই হোক না কেন, এখন যখন মৌকা এসেছে তখন বুঝে নাও বুদ্ধিমানের মত।

আমি এখন মনের ভূমিতে আসচি, তোমরা মনোযোগী হও। বলেছি, যেমন শরীর ও প্রাণের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আল দেওয়া যায় না, কোন বিভক্তি বা ভাবের রেখা টানা যায় না, তেমনি প্রাণ আর মনের ক্ষেত্রের মাঝেও কোন রেখা টানা যায় না কারণ মন

বলে যাকে তুমি জানো তার উৎপত্তি প্রাণ থেকেই। মানুষে ঐ সত্তার কাজ বুঝবার জন্যে ভাগ করে নিয়েচে আসলে ওরকম ভাগ কোথাও নেই। কারণ এটা বুঝে নাও যে যোগ-দৃষ্টিতে আত্মসত্তা এ জগতে ক্রিয়া করচেন, অন্তঃকরণের মধ্যে দিয়ে, যোগীরা তাকে অন্তঃ-করণ অর্থে বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও মন বলেন। কিন্তু এটাতে বুঝতে হবে ঐ চারটি ক্রিয়া-বিভাগ হিসাবে সত্য কিন্তু সত্তায় আসলে একটাই। এইখানেই একটু বিশেষ স্থির হয়ে লক্ষ্য কর।

সূক্ষ্ম ভাবে বুঝাতে চারটি বৃত্তি বা কাজকে নিয়ে অন্তঃকরণ বলা হয়েচে। কেবল সহজে বুঝে নেবাব জন্যই, কিন্তু আসলে একই শক্তিব খেলা। যেমন ধব বুদ্ধি, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, সত্য নির্দ্ধারণ যার কাজ, অপব নাম বিবেক। আত্মাব সর্ব্বাপেক্ষা নিকট এবং সৎ বা সত্যকে প্রকাশ করে বলেই এই বুদ্ধি মহৎ বা প্রধানাবৃত্তি। তাব পর চিত্ত, সকল তত্ত্ব অনুসন্ধানই এর কাজ,—সর্ব্ববিধ চিন্তার ক্ষেত্র এর মধ্যে, তাব পর মন,—যার কাজ হোলো সংকল্প ও বিকল্প, কামনা, ইচ্ছাই তার কাজ, এটা চাই, এটা চাই না এই ইচ্ছা প্রত্যেক ক্রিয়ামূলে না থাকলে কোন কাজই ঘটে না, আমাব ইচ্ছাশক্তিই হোলো মন, সর্ব্ব কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলে, কিন্তু নিজে দৃষ্টিহীন কারণ সে অন্ধ, বুদ্ধির সহায়তা না থাকলে সে মন যে কি করতো তা বুঝতেই পারো, যারা ঐ মনকে অবলম্বন করেই চলে তাদের ব্যবহার লক্ষ্য করে। জাতকে জাত অথবা কোন সম্প্রদায়েব একটা বড অংশ মনপ্রধান, এমনও তো আছে যাদের বিবেকবুদ্ধির পুষ্টি হয়নি অথবা এত অল্প কয়েকজনের মধ্যে আছে যা ধর্ত্তব্যই নয়। তাব পর অহংকাব। ঐ অহংকাব বলতে স্বভাবচ্যুত আত্মা, জীব অবস্থায় বুদ্ধি চিত্ত ও মনের সঙ্গে সঙ্গে আছে—সোজা কথায় তোমার আমি, এই বোধটিই হোলো অহঙ্কার, নাম রূপধারী ভোগমুখী সংস্কারবদ্ধ আত্মা। তাকেই আমি বলে বলা যায়, বোধ করাও যায়। যার ইচ্ছায় বা প্রবৃত্তিতে দেহস্থ সব কিছুই কার্য্যকরী। এই চারিটি বৃত্তি নিয়েই অন্তঃকরণ। এ ছাড়া যা কিছু সবই স্থূল বাইরের, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘটিত ব্যাপার। এইটুকুই এখন বুঝবার কথা।

এবার যোগীবর যেই একটু স্থির হইয়াছেন, যেটা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছিলাম, সাহস করিয়া এখন বলিয়াই ফেলিলাম—

একটু আগেই যে আত্মার স্বরূপে প্রতিভাতের কথা বললেন, চকিতে প্রকাশ, সেইটি যদি একটু বিশদ বলেন।

শুনিয়াই, এদিকে এসো, বলিয়া কাছে ডাকিলেন। পাশে বসাইলেন, তারপর বলিলেন, মোক্ষম জায়গায় ঘা লাগিয়েছ, বিপদের কথা যে আমার—

একজন বলিলেন, বিপদ কেন? উত্তরে স্বামী বলিলেন, বাক্যমনের অগোচর যে সত্তা তার কথা বাক্য দিয়ে বলতে হবে, বিপদ নয়? কথায় বলতে গেলে তাত জুড়িয়ে যাবে যে। তবুও বলতে হবে, কেমন? একটু স্থির হয়ে যাও আগে—

তখন কি রকমটা হয় জানো,—কোন সূত্রে যখনই বিমল আনন্দের আভাস পাবে তোমার মধ্যে, ধরো আমাদের ঐ অতুলপ্রসাদের গান শুনেই হোক, কোন প্রেমী তার প্রিয়কে পাবা মাত্রই, তত্ত্বপিপাসুর তত্ত্বলাভ হলেও হবে ঐ আনন্দ অথবা অপরূপ কোন রূপ দেখেই হোক, অথবা মহাসঙ্কট থেকে কারো জীবন রক্ষা করেই হোক সেই সৎ আনন্দদায়ী বিষয়টি অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই হয় কি, তোমার অন্তঃকরণে, অর্থাৎ ক্রিয়মান বুদ্ধি মন চিত্ত ক্ষেত্রে বিচরণশীল ঐ অহং বা আমি সত্তাটি সব ক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে চকিতের মত, যাকে বলে বিদ্যুৎগতিতে সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে উঠে স্বস্থানে স্বরূপে একবার স্থিত হয়ে তখনই ফিরে এসে গিয়েছেন পূর্ব্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে যেখান থেকে গিয়েছিলেন। আর নামবার সঙ্গে খানিক আনন্দের রেশ নিয়ে এসেছেন। সেই আনন্দের অনুভূতি যখন তোমার অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত হলো অর্থাৎ অন্তরে অন্তরে অনুভূত হয়ে তোমায় আনন্দ দিলে, তার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ক্ষণেক বা মুহূর্ত্তের জন্য তোমার, অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপে স্থিতি ঘটে গিয়েচে। এখানে তবুও সময়ের কথা দিয়েই বুঝতে হোলো, না হলে কি করে বলবো বলো, কিন্তু আসলে ওটা কম্পনের ব্যাপার, কাজেই আংশিক কালের স্পর্শ থাকবেই, অনুভূতিতেও থাকবে, আর সে রহস্যময় গুহ্য কথা বলতে গেলেও থাকবে—আর এইভাবেই বলতেও হবে।

আরও একটু বলুন,—আমি বলিলাম, এতে আমাদের লাভ আছে, আপনাকে আর তো পাব না—

তোমরা শিক্ষিতমনা, সত্যই অনুসন্ধিৎসু, প্রসন্ন মনে তিনি বলিলেন, কতকটা তৈরী আছ তাই একটু বলা গেল। বুঝে দেখ, এই ক্রমেই আত্ম-অনুভূতির ক্রিয়া হয়। স্থির হলে, যোগমার্গের সঙ্গে পরিচিত হলে, অন্তঃকরণের মধ্যে তোমার প্রাণাত্মা, বুদ্ধি মন চিত্ত অহঙ্কার সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেক নড়াচড়া তোমার গোচরে আসবে। এই যে কোন উপলক্ষে চকিতে, তোমার স্বরূপে, স্বভাবে বা স্বস্থানে স্থিতি, সকল ঘটেই ঐ রকম হয়ে থাকো তার প্রমাণ হল ঐ আনন্দ। যেমন কোন আতর-গোলাপের কারখানা ঘরে ঢুকলে, ফেরবার বেলা তোমার গায়ে কাপড়চোপড়ে কতকটা গন্ধ লেগে যায়—সেই রকমই বাইরে থেকে অহং সংস্থা স্বরূপ বা স্বস্থানে যেতে ঐ আনন্দের স্তর ভেদ করেই যেতে হয় আবার বাইরে আসতেও ঐ আনন্দের স্তর ভেদ করেই আসতে হয়, তাতে ঐ আস্বাদ চলে অন্তঃকরণেতে। শুধু নিজের মধ্যে নয়, সেইকালে যারা তোমার সঙ্গে কোনও ব্যবহারযুক্ত থাকবে, তাদের মধ্যেও ঐ আনন্দ সংক্রমিত হয়ে আনন্দে ভাসাবে। সবই ঐ আত্মস্বরূপে ক্ষণেক স্থিতির ফল। এর বেশী ব্যাখ্যা আর হয় না, কিন্তু ঐটুকু বলেও শান্তি পাওয়া যায় না, কারণ আরও অনেক কিছু থাকে যে। মোট কথা, কথা দিয়ে আমিকে ঠিক ধারণা করিয়ে দেওয়া যায় না। নিজে স্থির হয়ে আসনে বসতে হয়;—আমি বোধটুকু মেরে-কেটে

কথায় একটু ধরিয়ে দেওয়া যায়, তা ছাড়া আর পথ নেই। তোমার ঐ আমি বোধটুকু থেকেই সব কিছু অনুভব। বুদ্ধিমান হও তো ঐ আমি বোধটুকু ধরবার চেষ্টা করো, তার পর পথ সোজা। ঐ আমি-আমি আমি-আমি ধারণা করো, কি ভাবে কোনখানে কি রকম অনুভূতিটুকু হচ্চে।

এমন চমৎকার পবিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল সেখানে, বোধ হয় প্রত্যেকেই অনুভবের মধ্যেই সমাহিত হয়ে গিয়েছে মনে হোলো। একটা আনন্দেব পুলক যেন সবার মধ্যে খেলা করে গেল। স্থিব হলাম। আমাব মুখেব দিকে চেয়ে স্বামী বলিলেন, কি, আর কথা নেই যে! ঐ বকমই হয়। এখন এসব সাময়িক, পরে অভ্যস্ত হলে তখন ইচ্ছামাত্রেই ঐ স্বরূপে স্থিতি ঘটাতে পাববে। সেই জন্যেই বলে না যে, ঈশ্বব লাভ নিজের পক্ষে সহজ, অপর পাঁচজনকে লওয়ানোই কঠিন।

আচ্ছা, আমি এই বোধ একটু স্থিব হলেই তো ধবা যায়, কিন্তু সেইটিই কি আত্মা বলে বুঝতে হবে? স্বামী বলিলেন, হাঁ, ঐ আত্মাই জীব, আব ঐ আমি বোধের সঙ্গে অনেক বিষয়ের, মিথ্যা ভাবেব ময়লা থাকে কিনা।

কি রকম?

যেমন মিথ্যা তোমাব নাম, রূপ, সদসৎসংস্কাব ধর্ম্ম ও ভোগপ্রবৃত্তি যাব নাম উপাধি এই সব মাখানো আছে কিনা। একটা সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে, আমার মধ্যে আমি বোধটি অথবা তোমার মধ্যেও যে আমি বোধ এটা সহজেই অনুভব করা যায়, কিন্তু সেই বোধটির উপব তুমি মনকে বেশীক্ষণ বাখতেই পারবে না। অনবরত পিছলে আসবে।

আমাদের নাহার মশাই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন, আপনি বলুন, কেমন করে স্বভাবে স্থিত হওয়া যায়, কেমন করে যোগমার্গে দৃঢ় থাকা যায়—এই সব শুনতেই তো ভালো লাগে, এতে আত্মার সম্বন্ধ আছে, তাই না?

সেইজন্যেই তো, কিন্তু ঐ যে একটু আনন্দ পাওয়া যায় তাও স্থায়ী হয় না, বোধ হয় আসল যে আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলে সে অনেক দূর, জীব অবস্থায় তা ভোগ হয় না।

তা হলে শুনলে কি, আনন্দ বলে যে অবস্থা বলেছি সেটা আনন্দের আভাস মাত্র,— বুঝে দেখ তোমার এ আনন্দাভাস এলো কি করে! প্রথমতঃ একটি সৎ ভাবের, কোন সৎকর্ম্ম অথবা সুন্দর দৃশ্য অথবা সৎ প্রিয়সঙ্গ উপলক্ষ্য করে; স্বতঃই আসেনি,—কেন?

নিরবচ্ছিন্ন জডধর্ম্মী, স্বার্থ বা অর্থকরী বিষয় চিন্তা, নিরন্তর ভোগের প্রবৃত্তি, অসীম ভোগাকাঙ্ক্ষা শরীর ও মনে। ধর্ম্মে স্থিতির ফলে যদি কোন শুভ যোগাযোগ ঘটলো, সৎ ভাবের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের আভাস পাওয়া গেল। আর সেই আকর্ষণই বা কতটুকু, যাই হোক, তাও ঐ স্মৃতিতেই রইলো, তারপর হয়তো দীর্ঘকাল পরে আবার

কথনো ঐ শুভ যোগাযোগ উপলক্ষ্যে আবার ধরা যায়। তবে যার লক্ষ্য থাকে, ঐ সৎ ভাবের উপর তাহলে ঐ আত্মার ইচ্ছায় আবা: শুভ যোগ ঘটতে দেরি হয় না, বুঝলে! শুনলে তো আত্মার প্রবল ইচ্ছাশক্তির কথা!

যোগীদেরও কি নিরবচ্ছিন্ন এ আনন্দ ভোগ হয়? যেটা আমাদের একটা সৎ উপলক্ষ্যে হচ্চে,—বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, তোমার তো ঘন আনন্দ, যথার্থ সেই আত্মানন্দ লাভ হচ্চে না, আভাস মাত্র হচ্চে, কারণ আত্মার উপরে যত অন্যায়ে-র আবরণ পড়বে ততই তোমার স্বভাবচ্যুতি ঘটবে। আর মন বুদ্ধি নির্ম্মল তার অর্থই হোল তার আমি-র মলিনতা কম, স্বভাবে তার আনন্দ দীর্ঘকাল ভোগ হয়। সংভাবই আসলে বড় জিনিস, ভোগের আকর্ষণ যার কম তারই কাজে কর্ম্মে চিন্তায় সৎ ভাবের ক্রিয়াই প্রবল, আর সেটা যতই প্রবল তার আত্মার বা আমি-র স্বভাবে স্থিতি সহজ সহজ হয়, আনন্দ উপভোগের যোগাযোগ ঘন ঘন ঘটে, অর্থাৎ সে ঐ সদ্ভাবের উপলক্ষ্য ঘন ঘন জুটিয়ে নেয়, এ আনন্দে আরও দীর্ঘকাল স্থিতি হওয়ার জন্য।

আর যোগীরা নিরবচ্ছিন্ন এ আনন্দ ভোগ করেন কি? যদি কোন যোগী সিদ্ধির পর নিরবচ্ছিন্ন এ আত্মভাবে স্থিত হয়ে অর্থাৎ তার আমি-র সকল মলিনতা কাটিয়ে ফেলতে পারেন নিরবচ্ছিন্ন এ আনন্দে ভাসবার জন্য, তা হলেও এই দেশকালের রাজ্যে, দেশকালের অধীন তার শরীর থাকতে, নিরবচ্ছিন্ন স্থিত হতে পারবেন কেন, শরীর-ধর্ম্ম একটি আছে তো? তবে আমি এমন দেখেছি, সিদ্ধির পর যোগী শরীর ছেড়ে দিলেন, কারণ সেই আনন্দময় অবস্থা থেকে নামতে চাননি, সে আনন্দের প্রভাব এমনই। সেই জন্যই আমরা সৎসঙ্গের উপলক্ষ্য রেখে সমাজের মধ্যে আসি যাই থাকি ইচ্ছামত এমন সব জায়গায়, যেখানে পাঁচজনের মধ্যে সৎ ভাবের আদানপ্রদান ভাল চলে। মনে হয় এরও দরকার আছে। যাই হোক, সিদ্ধিঅন্তে যা হয় তা নিয়ে এখন আলোচনা একেবারেই বৃথা না হোক ভুল বুঝবার একটি কারণ থেকে যায়। কারণটা এই যে—তোমদের চাকরি সর্ব্বস্ব, মাসের তিরিশটি দিনের নিয়মিত এ জীবনে বাঁধা কয়টি কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত চিন্তা, ঘোরাফেরা, ভোগ-উপভোগ, সব কিছু নিয়ে এই যে জীবন, তার প্রভাব কয়টি একপ্রাণারাম যোগী জীবনের স্বাধীন বৃত্তিতে যে সকল কর্ম্ম নিয়মিত করেছে তার প্রতি দিন, প্রতি ক্ষণকে, তার মধ্যে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য। বাইরে থেকে দেখতে যে রকম তা বুঝতেও সাধারণের পক্ষে সহজ নয়, তখন তার অন্তরের অনুভূতি বা ধ্যানধারণার কথা কেমন করে জানা সম্ভব! তবে এটা ঠিক, তাঁরা থাকেন এক জগতে, সে সাধারণের জগৎ থেকে আলাদা এটা সত্য।

কিন্তু যত কিছুই ধারণা করো না কেন, তাদের সম্বন্ধে তোমার পক্ষে তা আয়ত্ত করা বা সেইভাবে জীবনযাপন অসম্ভব। যদিও এটুকু সত্য, যদি তাদের সঙ্গের গুণে খানিক

পরিচয় পাওয়া যায়,—তাতেও সুখ আছে। শুনেও সুখ, দেখেও সুখ।

একে সুখ বলবেন, না আনন্দ বলবেন'

আনন্দ বলতে তোমার আত্মা থেকে উদ্ভূত যা তাই আনন্দ, অপরের কথা শুনে ঠিক তাই হবে কি করে তোমার মধ্যে, মেরেকেটে আনন্দের আভাস বলতেও পারো তাকে।

৯

যোগের প্রভাব ও প্রকার

এখন যোগীরা কিভাবে এসব নিয়ে কাজ করেন সেইটি বুঝে নিতে হবে। ধরো একটি যে কোনও বিষয়ে চিন্তা—শুয়ে শুয়ে হয়, বসে বসে হয়, দাঁড়িয়েও হয়, আবার চলতে চলতেও হয়—এ তো তোমরা জানো সবাই, করেও থাকো, এতে আর বৈচিত্র্য কি আছে?

বৈচিত্র্য আছে বৈকি! সেটা এই যে, যখনই তুমি চিন্তামগ্ন থাকো তখন তোমার শরীর কোথায় থাকে? শরীর-জ্ঞান থাকে না। শরীর-বোধ পর্য্যন্ত থাকে কিনা সন্দেহ। তার মানে তোমার অহং সংযুক্ত চিত্ত ঐ চিন্তায় বিষয়ীভূত হয়ে যায়, তাই শরীর-বোধ থাকে না।

এই যে তোমরা এখানে আমার কথা শুনচো, এতে ভিতরের ক্রিয়াটি কিভাবে চলচে, বিশ্লেষণ করলে কি রকমটা হয় দেখো। তোমার অহংযুক্ত মন, শরীরকে এখানে বসিয়ে চক্ষু ও কান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখচে আর আমার কথা শুনচে। শুধু দেখচে আর শুনচে নয় বুঝচেও, আবার শুধু বুঝা নয়—রস উপভোগও করচে, শেষে আনন্দও পাচ্ছে। তাহলে দাঁড়ালো কি? মূল প্রেরণা কার? নিশ্চয়ই জীবাত্মার অর্থাৎ তোমার এ আমি বোধ অহং-এরই প্রেরণা, তারই মন-রূপী ইচ্ছায় এই শরীরকে এখানে এনেচে, বসিয়েচে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে। আমি, জীবরূপী অহং প্রেরণা দিয়ে, মন শরীরগত ইন্দ্রিয়কে চালাচ্চে, বিষয়ে যুক্ত থেকে বিষয় গ্রহণ করেচে, ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে, আমায় দেখচে, আমার কথা শুনচে, অর্থগ্রহণ করচে, কারণ ঐ মনের পিছনে বুদ্ধিই আছে। আরও দেখা এবং শুনার সঙ্গে পূর্ব্বাপর সঞ্চিত স্মৃতির সাহায্যে বিচার এবং সত্যনির্ণয়ও আছে, আবার রসগ্রহণও আছে এর মধ্যে, কাজেই এও একটি উচ্চস্তরের অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানের উপভোগ চলচে যেহেতু এতে আনন্দ আছে। তা হলে এখানে অহং জীবাত্মাকে অর্থাৎ তোমার তুমিকে কর্ত্তারূপে পাওয়া গেল প্রথম বা প্রধান প্রেরণাদাতারূপে, যার ইচ্ছায় সব কাজ হচ্চে,—তার সঙ্গে ইচ্ছারূপী মনকে পাওয়া গেল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, বিষয় অর্থাৎ দেখা ও শোনার ভিতর দিয়ে বিষয়টি গ্রহণ করলে, তারপর বুদ্ধিকেও পাওয়া গেল যে

বিষয়টির সত্যনির্ণয় ও রসগ্রহণ করে দিলে, যার ফলে উৎপন্ন হল আনন্দ। এই আনন্দই কাম্য বস্তু আত্মার বা তোমার বা প্রত্যেক আমির—রসের মধ্যেই আনন্দ ভোগই তার খোরাক।

এই যে কাজগুলি হয়ে যাচ্ছে যুগপৎ, যেন একই সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে সহজ ধারায়, এর মধ্যে এতগুলি ক্রিয়া আছে বিচার করলে লক্ষ্য হয়। এই ভাবে বিচার করে চললে তোমার প্রতি পদে সংযত করে দেবে, তোমার শরীর অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

আচ্ছা এই যে মন, বুদ্ধি, অহং ইন্দ্রিয়াদির বিষয় ভোগের কথা হয়ে গেল, এর মধ্যে প্রাণের কথা তো হোল না, তা হলে প্রাণটা কোথায় ছিল?

প্রাণ তখন শরীরে লিপ্ত ছিল, শরীরের কাজ চালাচ্ছিল,—একজন বলিল। যোগী বলিলেন, যে প্রাণ শরীর চালায় যোগীরা তাকে স্থূল প্রাণ বলেন। তাঁরা প্রাণকে এর মধ্যে আরও বড় করে দেখেছেন। আত্মা থেকে যা কিছু ঘটেচে তা প্রাণের শক্তিতেই ঘটেচে। এখন এই বিষয়টিতে একটু বিশেষ মনোযোগ করতে হবে। শোনো, ঐ যে আগে বিশ্লেষণের ফলে জীবাত্মা বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় নিয়ে কাজের কথা হোল, সেই জীবাত্মার প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব বা ইচ্ছা থেকে শরীর পর্য্যন্ত আগাগোড়া এর সবটাই প্রাণের অধিকার। সেই প্রাণের অভাবে জীব আত্মার ইচ্ছা পর্য্যন্ত অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। তার অপর নাম অন্তঃকরণ। তা'হলে এই যে অন্তঃকরণ তার অস্তিত্বই এ প্রাণের ক্রিয়ায় চলতে শুরু হয়েছে, শরীর ধারণের সমস্ত কাজেই, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের স্পর্শ ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। তা হলে এটা তো সহজেই বুঝা গেল আত্মা থেকে যা কিছু এই দেহ-রাজ্যের শেষ ক্রিয়া পর্য্যন্ত সবটাই প্রাণের অধিকার। সেই জন্যই আত্মদর্শনের পর, জড়জগৎ পর্য্যন্ত যখন প্রাণময় অনুভূত হয় তখন এখানে জড় কিছুই থাকে না তার কাছে অর্থাৎ আত্মদ্রষ্টার কাছে। ঐ আত্মাই প্রাণ, জগৎকারণ বলেই তার মাহাত্ম্য দেখানো হয়েচে। এর পরেও আবার প্রাণের কথা আসচে, কারণ এই প্রাণকে ধরাই যোগের কাজ, ক্রমে সেই কথায় আসচি।

বলেচি প্রাণ নিয়েই যোগের কথা, প্রথমেই প্রাণের কেন্দ্র বা আসনটির কথা জেনে রাখো। আগেই বলেচি মেরুদণ্ডের সর্ব্বোচ্চ বিন্দুটিই প্রাণের আসন বা কেন্দ্র, যার এক নাম মূর্দ্ধা, যৌগিক নাম প্রজ্ঞাচক্র, আর তার শেষ গতানুগতিক মেরুদণ্ডের মূল, সর্ব্ব-শেষ প্রান্তে সেই মূলাধার পর্য্যন্ত। সেই ঊর্দ্ধ প্রান্ত থেকে শেষ অধোপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রাণের কাজ সর্ব্ব সময়েই আমাদের শরীরে চলচে। এখন নির্ভুল ভাবেই বুঝে নিতে হবে সেই মেরুপথেই প্রাণের ক্রিয়া যত কিছু। যে শক্তিতে দেহ সচল সবল সুস্থ অবস্থায় কর্ম্মপটু থাকে, তাই শুধু নয়, আবার সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মক্ষম রেখেচে, আবার শক্তিপূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখচে, তাই হোলো প্রাণ, আর মেরুপথেই তার সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সেই প্রাণ

কিভাবে এই মেরুপথে কাজ করেচে এই কথাটি বলতে গেলে এইটি ধরতে হবে যে, একটি ধারা, অবিরাম, কল্পনাতীত দ্রুত, মূর্দ্ধা থেকে নেমে মেরুর মূলদেশে এসে স্পর্শ দিয়ে আঘাত করেচে এবং ঠিক সেইভাবে আবার মেরুর নিম্ন প্রান্ত থেকে সেই দ্রুততালেই তখনি মেরু-ঊর্দ্ধে সেই প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছাচ্চে। অতি দ্রুত এইভাবে ওঠা আর নামা থেকেই প্রাণের সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। একটা এই ভাবের সূক্ষ্ম বিষয় বুঝাতে হয়তো জায়গায় জায়গায় পুনরুক্তি হয়ে যাবে, তাতে ভালই হবে জেনে কিছু মনে কোরো না।

এখন এই মেরুর কথা আরও একটু আছে। যদিও হাড়পাঁজড়া কতকগুলি এই মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত আছে, তা হলেও তার সঙ্গে মেরুদণ্ডের সম্বন্ধ গৌণ। মেরুদণ্ডটি এমন ভাবে মাংস ও অস্থি দিয়ে তৈরী যে বাইরে কোন আঘাত সহজে প্রাণপথে আঘাত করে তাকে বিচলিত করতেই পারে না। তবে এ কথাও ঠিক যে ঐ মেরুদণ্ডের যে কোন অংশে বিষম আঘাতের ফলে প্রাণের ক্রিয়া লুপ্ত তখনই হবে। সেইজন্য প্রকৃতি মেরু-দণ্ডটি মানুষের মধ্যেই বিশেষতঃ এমনই কৌশলে এমনই নিরাপদ প্রান্তে রক্ষার ব্যবস্থা করেচেন, এমন কঠিন অস্থি গ্রন্থি দিয়ে একটার পর একটা রচনা করেচেন ভিতর-বার সূক্ষ্ম একমাত্র প্রাণপথের উপযোগী করে, বিচিত্র এ সৃষ্টি যাতে নিত্য কর্ম্মে কোন ব্যাঘাত না হয় অথবা সহজে কোন বাধা ঐ পথে পৌঁছাতে না পারে। ঐজন্য মানুষ-শরীরে বুকটাই সামনে, পাঁজড়ার হাড়ের পিছনে এমন নিরাপদ আর কিছুতেই হোত না। আমাদের মেরু-দণ্ডের আকৃতি অবিকল একটা সাপের মত, বার-ভিতর প্রায়ই ঐ ভাবেরই রচনা কেবল প্রথমে অথবা উত্তর দিকে ও শেষের দিকেই একটু সরু হয়েছে। আগাগোড়া সেই প্রত্যেক হাড়ের গাঁটের ভিতর থাকে অতি কোমল স্নেহপদার্থে পরিপূর্ণ নলের মত বটে কিন্তু ফাঁক নেই কোথাও, চর্মচক্ষে কোন ফাঁক দেখা যাবে না। কিন্তু ঐ যে সরু অতি কোমল এক পদার্থময় পথটি, তাকে যা বলতে হয় বলো, যেমন তামা বা রূপার তারের মধ্যে বিদ্যুৎগতি দ্রুত করে, তড়িৎপ্রবাহ নিজ অবাধ গতিতে চলতে পারে, সেই রকম মেরুপথে ঐ কোমল পদার্থের ভিতর দিয়ে প্রাণপ্রবাহ সহজ গতি পায় এবং সারা মেরুপথে চলাচল করে জীবন-ধারা বজায় রাখে।

এইবার এই স্থূল শরীরের মধ্যে স্থূল প্রাণ কিভাবে কাজ করে সেই কথাই আসচে, প্রথম এই শরীরে আত্মা, তাই থেকে উৎপন্ন সেই সূক্ষ্ম প্রাণের কাজকে যোগীরা ছয়টি ভাগ করে দেখিয়েচেন। এইমাত্র কথাটা হয়ে গিয়েচে যে, মেরুপথেই ঐ প্রাণের গতি ঊর্দ্ধ-অধো প্রবাহ অবিশ্রান্ত চলাচল করে আমাদের জীবনধারা অব্যাহত রেখেচে—সেই প্রথম জীবসঞ্চারের ক্ষণ থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত তার ব্যতিক্রম নেই। এই প্রাণের কাজ দুই ভাবেই দেখি। স্থূল শরীরের কাজ যখন তখন তাকে স্থূল, আর সূক্ষ্ম শরীর জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম ক্রিয়াসম্পন্ন হচ্চে তখন তাকে সূক্ষ্ম প্রাণ বলে বুঝি। আর শ্বাস-

প্রশ্বাসের কাজ থেকে মলদ্বারে মল নিঃসরণ পর্য্যন্ত সকল কাজই স্থূল প্রাণের, এটাও মনে রাখতে হবে এখন। আর মূর্দ্ধস্থান অর্থাৎ যেখান থেকে প্রাণের সূক্ষ্মক্রিয়া আরম্ভ—সেই স্থান, ধরে নাও নাসামূল অথবা দুই ভ্রূর সংযোগ-স্থল—মুণ্ডেরও কেন্দ্রে, আমাদের মাথার ভিতরে মস্তিষ্কের ঠিক নিচে এবং মধ্যস্থলে যেখানে মেরুদণ্ড আরম্ভ হয়েচে এমন একটি বিন্দুতে বা কেন্দ্রে, সেখান থেকেই স্থূল-সূক্ষ্ম সকল কাজই চলচে প্রাণের।

এখন শরীরের ভিতরে এবং মেরুদণ্ডের বাইরে হাড় ও মাংসে ঢাকা শরীরের যে যে যন্ত্র আছে, যেমন মস্তিষ্ক থেকে চক্ষু কান নাক কণ্ঠ ফুসফুস হৃদপিণ্ড পাকস্থলী প্লীহা যকৃত নাড়িভুঁড়ি অন্ত্রাদি মূত্রনালী মলদ্বার পর্য্যন্ত এই সব স্থূল দেহস্থ যন্ত্রের মধ্যেই কাজ চলচে স্থূল বায়ুধর্ম্মী প্রাণের, আর সেই স্থূল প্রাণের ক্রিয়ামূলে প্রাণসঞ্চার করচে ঐ সূক্ষ্ম প্রাণ ঐ মেরুপথের মধ্যস্থ ছয়টি কেন্দ্র থেকে। এই যে প্রাণ, আসল শক্তি, এইটি মনে রেখেই সব কিছুই বুঝতে হবে। এখন মেরুপথে, এক প্রাণ থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, আমাদের ধারণার অতীত অতি দ্রুত উর্দ্ধ-অধো গতির ফলে এক জ্যোতির্ম্ময় রেখা উৎপন্ন হয়েচে। তাকে ডাইনামো ধরে নাও, ঐ থেকেই শরীরের ছয়টি কেন্দ্রে সূক্ষ্মতম রেখার আকারে শক্তি এসে পৌঁছে শরীর-মধ্যে সব কিছুই সুশৃঙ্খলায় চালিত করচে। চক্ষে দেখে বিচারের বিষয় এটা নয়। যোগীর অনুভূত বিষয়।

প্রাণের রূপও আছে, ধ্যানের পরাবস্থায় অনুভূত হয়। তখন হয় কি? চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি, কানের শ্রবণ, ঘ্রাণশক্তি ও রসগ্রহণের শক্তি, মোট কথা পঞ্চতন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-শক্তি ঐ প্রাণে সংহত হয়ে একত্র পায়, দ্রষ্টারূপে কেবল আমি সত্তা অর্থাৎ আত্মাই থাকেন। অর্থাৎ তোমার আমি বোধটি স্বস্থানে স্থিত হলেই দেখতে পান।

আমাদের মেরুদণ্ডের সব নীচে, প্রায় গুহ্যমূলেই প্রথম কেন্দ্র, তার চার আঙুল উপরে লিঙ্গমূলের সমসূত্রে ঐ মেরুমধ্যেই দ্বিতীয় কেন্দ্র, তারপর নাভির সমসূত্রে মেরুমধ্যেই তৃতীয়, তারপর হৃদয়ের সমসূত্রে মেরুমধ্যেই চতুর্থ, কণ্ঠের সমসূত্রে পঞ্চম ও শেষ বা ষষ্ঠ কেন্দ্র হোল মেরুমূলেই প্রাণের আসন, তার নাম মূর্দ্ধা। সূক্ষ্ম প্রাণের সকল কর্ম্মই মেরুমধ্যেই, তাই বুঝাতেই প্রত্যেক কেন্দ্রের কথায় মেরুমধ্যে এই কথা বার বার বলতে হয়েচে। মেরুমধ্যস্থ প্রাণের মূলধারা থেকেই এই ছয় কেন্দ্রে সূক্ষ্ম প্রাণ এক-একটি রেখার আকারে ঐ ঐ কেন্দ্রে সঞ্চারিত হয়ে স্থূল প্রাণের সকল ক্রিয়ামূলে শক্তি সঞ্চার করচে। বুঝে দেখ স্থূল শরীরের সকল যন্ত্র চলছে প্রাণের হৃদয়স্থ কেন্দ্র থেকে, আর সেখান থেকেই পাঁচটি বায়ুরূপে স্থূল শরীরের উর্দ্ধ ও অধো ভাগ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়ে যে শক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনরক্ষা করচে, বিচারের জন্যই তাকে স্থূল প্রাণ বলেছি। অন্নময় কোষটির সৃষ্টি, পুষ্টি ও রক্ষার জন্যেই পঞ্চ বায়ুকে চালানোই হোলো এই প্রাণের কাজ। বায়ুধর্ম্মী এই প্রাণ নিয়ে আমাদের অনেক কথাই আছে, যোগাভ্যাসের ব্যাপারে। সেটা এর পরেই বলচি।

তবে আগে এইটুকু ধারণা হয়ে থাক্ যে, কারণরূপী আত্মা থেকে এই শরীর স্থূল হাড়-মাসের খোলস পর্য্যন্ত এই যে ব্যবহার—কর্ম্ম, ভোগ, জ্ঞান ইত্যাদি যা কিছু জীবধর্ম্মে ঘটে চলেচে তা আসলে প্রাণেরই মধ্যবর্ত্তিতায়। তাকে ভাল করে বুঝবার জন্য পঞ্চকোষের কথা, ষঠচক্রের কথা, আরও কতো স্তর-বিচারের আয়োজন। স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত আত্ম-চৈতন্য যে পথে বা ক্রমে যে এই স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখচেন, সেই ক্রম বা পথকে ধরে স্থূল শরীর থেকে আত্মচৈতন্যে ফিরে যাওয়া এবং স্থিত হওয়াই যোগের আসল কথা। আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য, প্রাণ, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, শরীর ও জগৎ এই এক ক্রম—অন্য ভাবে আত্মা, পঞ্চকোষ, জগৎ।

যোগীরা প্রথমেই স্থূল দেহমধ্যস্থ প্রাণের মূল, বাহ্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া ধরে তাই থেকেই আরম্ভ করেন।

এখন আমি একটু শিবের কথা বলব। কারণ এই যোগবিদ্যার পূর্ব্বাপর যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে আমাদের এই ভূমিতে, এমন কি এই যোগদর্শনের প্রথম আবিষ্কার, শিবের দ্বারাই হয়েছে। শিবই আদিগুরু আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, এ জগৎ শিবের কাছেই প্রধান ঋণী; এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব তাঁরই আবিষ্কার শুধু নয়, সবার বড আশার কথা এই যে শিব আদর্শ ত্যাগী সন্ন্যাসী বলে যত না পূজ্য, আদর্শ গৃহস্থ বলে তার চেয়ে অনেক বেশী পূজ্য। কারণ এই যোগমার্গ, তিনি গৃহী অর্থাৎ সস্ত্রীক অবস্থায় গার্হস্থ্য জীবনের সব কিছু করে তারই মধ্যে আবিষ্কার ও সিদ্ধিলাভ করে গিয়েছেন, তাঁর সাহায্যে অসংখ্য গৃহস্থ জীবনাবলম্বী সিদ্ধ হয়েচেন। আরও এমন অনেক কিছু ক্রিয়াও আবিষ্কার করে গিয়েছেন যাতে যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ সহজ হয়ে গিয়েছে। আমি তার মধ্যে একটি অত্যন্ত সহজ প্রক্রিয়ার কথা বলচি, যেটিকে ধরে তোমরাও সহজেই বহুদূর যেতে পারবে। সিদ্ধিলাভ করতে পারবে, একথা বললাম না বলে যেন কিছু মনে কোরো না, কারণ যথার্থ সিদ্ধির অবস্থা নির্দ্দেশ নিশ্চিত গুরুসাপেক্ষ। গুরু না হলে ঠিক শেষের কাজটুকু হয় না—যদিও শেষ ক্রিয়াটা প্রারম্ভ বা মধ্যাবস্থার তুলনায় বড়ো সহজ বিষয় নয়।

এই যোগদর্শনের কথায় শিব যে সহজ উপায় আমাদের যোগমার্গের পাকা নিদর্শন বলে দেখিয়েছেন, অন্যান্য যোগীরাও এই পথটাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বলেছেন, আমরাও এই পথেই জীবন সার্থক করে জন্ম ও মৃত্যু রহস্য ভেদ করতে পেরেচি। তাঁরা প্রথমে প্রাণ-বায়ু থেকেই শুরু করেচেন। অবশ্য আসল প্রাণ তো বায়ুধর্ম্মী নয়, আগেই বুঝেচো মেরু-দণ্ডের মধ্যে ঊর্দ্ধ অধঃ গতি তার। সূক্ষ্ম ঐ প্রাণশক্তির জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি মেরুদণ্ডেরই মধ্যস্থ এক স্থান থেকে হৃদয়ে কেন্দ্রস্থ হয়ে ফুসফুস ও হৃদয়যন্ত্রাদি চালনা করচে, যার ফলে ফুসফুস হাপরের কাজ আরম্ভ করে দিয়েচে সেই মুহূর্তেই যখন এক দেহ থেকে আর এক শরীরের জন্ম হয়েচে। এখন কেমন করে এই প্রাণ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ারূপী প্রাণ

থেকে যোগারম্ভ করা যায় সেই কথা।

ভিতর থেকে দেখলে অর্থাৎ মূল আত্ম-তত্ত্ব থেকে বিচার আরম্ভ করলে দেখা যাবে, আমাদের এই শ্বাসপ্রশ্বাসই প্রাণের সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল অভিব্যক্তি, এমন কি প্রাণের সবচেয়ে বাইরের বা শেষ কাজ বললেও হয়। বাইরে জগতের সঙ্গে আমাদের দেহের সম্বন্ধ এই যোগসূত্রের উপরই রয়েচে। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় আমাদের প্রাণই হোলো যেন ঐ বায়ু বা ফুসফুস পূর্ণ হয়ে কতকটা পাকস্থলী পর্য্যন্ত যায়। এমন কি সূক্ষ্মভাবে সমস্ত নাড়ি-পথে বরাবর শেষ গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করচে, এটুকুও জেনে রাখা ভাল। যোগের কাজে ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসটি লক্ষ্য করাই প্রথম এবং প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় যোগী প্রবর্ত্তকদের। আমরা এটাও দেখেছি, যখন কোন কাজে নিযুক্ত থাকি তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা মনেই থাকে না—শরীর-জ্ঞান থাকে না। কিন্তু প্রবর্ত্তকদের ওদিকে লক্ষ্য করতে এবং সেদিকে মন রাখতেই হয়, নইলে চলে না।

একটি নিরেট দৃষ্টান্ত বলচি। এক প্রবর্ত্তক অর্থাৎ ভাবী যোগীগুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে উপদেশ পেলে, অবশ্য সংযমের সঙ্গে কিছুদিন আসনে বসার পর, গুরু বললেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখো। সাতদিন গেল, গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখলে ? শিষ্য তখন মনোমত কিছু না পেয়ে একটু বিরক্ত হয়েই উঠেছিল। সে বলে, বাতাস নেওয়া ও ছাড়া এ তো আপনিই হয়ে চলেছে—আর তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

গুরু বুঝলেন তার মনের কথা, তার পর সেই দিনেই তাকে বিশেষ ভাবেই বলে দিলেন—তিলমাত্র স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে শুধু তুমি শ্বাস-প্রশ্বাসেই লক্ষ্য রাখবে তোমার এইটুকুই কাজ, আর কিছু করতে হবে না। এইভাবে কয়েক দিন পরের কথা হচ্চে,—শিষ্যের ধারণা ছিল যে গুরু তাকে কঠিন কঠিন কাজ অভ্যাস করতে দেবেন, হয়তো কারো কাছে সে আগে শুনেও ছিল যে প্রাণায়াম দেবেন। কিন্তু তার নাম ও গন্ধ না পেয়ে সে গুরুকে ধরেচে, কৈ আমায় কাজ দিন! গুরু বলেন, ঐ কাজই তো আসল—এটাই করো তাহলেই হবে। চ্যালা ছেলেমানুষ তো, তার মনে হোলো যোগী হতে এসেছি আর কোন কাজ নেই, এ কি ব্যাপার ? শেষে ভাবলে, আচ্ছা দেখাই যাক আর এক সপ্তাহ। তারপর সপ্তাহ-অন্তে গুরু বললেন, কি রকম ? সে বললে, খানিক বসবার পর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে—খানিকক্ষণ পরে যেন বন্ধ হয়ে যায়, এখন কি করব ?

এখন গুরু বুঝলেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর মন রাখলে যার প্রাণ স্থির হয় সে ব্যক্তি আধার ভালো—যোগী হবার উপযুক্তই বটে ; তারপরে এখন তাকে কি করতে হবে বলে দেন।

এই যে যোগী আর চ্যালার কথা হোল, এঁরা হঠযোগী নন—হঠযোগী হলে তার ব্যবস্থা অন্যরকম হোতো। এটা রাজযোগের কথা। আসনের কথাই এখানে প্রথম।

উপদেষ্টা এখন তাকে বলে দিলেন যে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ যেমন স্বাভাবিক তালে চলে চলুক, তুমি দৃষ্টিটা এখন থেকে শুধু সামনের একটা বিন্দুতে ধরে রাখো। ফলে মনকে ঐ বিন্দুর উপর রাখার ফলে যে একাগ্রতা জন্মালো তাইতেই আর এক ধাপ তাকে এগিয়ে দিলে। এইটাই প্রয়োজনীয়—এই একাগ্রতার জন্যই সব কিছু নিয়মপালন।

একজন বলিল, কৈ প্রাণায়াম করতে হোলো না, তা হলে কি রকম হবে?

প্রাণায়াম একটা শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক নিয়মেই বাঁধা ক্রিয়াবিশেষ। যদি কোন শান্তপ্রকৃতি আধার পাওয়া যায়, গুরু তাকে প্রথমে প্রাণায়াম নাও দিতে পারেন, কারণ তখন প্রাণায়ামের দরকার নেই তার। বুঝে দেখ, প্রাণায়াম কি জন্য,—প্রথম যাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল, বহুধা বিক্ষিপ্ত চিত্ত যাদের, যারা মোটেই স্থির হতে পারে না—তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সহজ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেই, কাবণ শবীরের চাঞ্চল্যে হৃদপিণ্ডের এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ কখনই স্বাভাবিক ছন্দে চলে না, তাদেবই আসনের পর প্রাণায়মের দ্বারা স্থির হতে উপদেশ দেওয়া হয়। চঞ্চল প্রকৃতি যাদেব, প্রাণায়ামের কাজে লেগে থাকার ফলে স্থৈর্য্য অর্থাৎ এক বিষয়ে তন্ময় হবার শক্তি আসবেই। প্রাণায়ামের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ছন্দে আসবে বলে এই অভ্যাস। প্রাণের গতি যাদের সংযত, সহজেই নিবিষ্ট চিত্ত—তাদের তো প্রাণায়ামের কাজ আপনিই হয়ে যাচ্চে। প্রাণায়াম হোলো তারই ওষুধ যার মন সহজে একাগ্র হয় না। অবশ্য সবাই যে চঞ্চল তা তো নয়, যারা স্বভাবতই স্থিরচিত্ত তার ঐ ওষুধ কেন? তোমরা কি ধারণা করে রেখেছ যোগমার্গে গেলেই তাকে প্রাণায়াম করতেই হবে?

এই কথা শুনিয়া একজন বলিলেন, তা না হলে যথানিয়মে প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গ যোগের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলচে কেন? প্রথম থেকেই শাস্ত্রকার ধরে নিয়েচেন মানুষ স্বভাবতই চঞ্চল, গোড়ার চাঞ্চল্যই প্রথম রোগ, এই সত্যটা নিয়েই প্রাণায়ামের নির্দ্দেশ। ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসে কসরতের ফলে যা হয়—স্থিরচিত্ত যারা তারা সহজেই তা পেয়ে যায়। তবে যাদের স্থূল বুদ্ধি, প্রাণায়াম না করলে কিছুই হবে না এই ধারণা করে বসে আছে, তাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হয়তো গুরু খানিক প্রাণায়ামের কসরৎ দিলেন। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে উলটা উৎপত্তিব সম্ভাবনা বেশী থাকে বলেই আরও উপদেষ্টা প্রাণায়াম দিতে স্বীকার করে না সাধারণ স্থূলবুদ্ধি বিদ্যার্থীদের।

এর ব্যতিক্রম আছে নাকি আবার? নিশ্চয়ই, তোমার তো দেখছি ঐ প্রাণায়ামী বায়ুর ধাত। তাহলে শোনো আসল তত্ত্বটি। প্রাণায়ামের তিনটি ক্রিয়া, প্রথম হ'ল—পূরক, বায়ু গ্রহণ করে ফুসফুস পূর্ণ করা; দ্বিতীয় কুম্ভক, সেই বায়ু ধারণ করা, তৃতীয় রেচক, সেই বায়ু ত্যাগ করা। প্রাণায়ামের সাধারণ নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে পূরণে যদি চার মাত্রা হয়, কুম্ভকে আট মাত্রা হওয়া দরকার, রেচকে ষোলো মাত্রা হবে। এই ষোলো

প্রাণায়ামের প্রথম ক্রিয়া। এখন ঐ অভ্যাসের ফলে অর্থাৎ ধর আরম্ভটা প্রথমে পনেরো মিনিট অভ্যাস চললো, তারপর পাঁচ মিনিট করে বাড়িয়ে যেতে হয়—এইভাবে আধঘণ্টাই হোলো যথেষ্ট প্রাণায়ামের কাজে। এর ফলে রক্ত চলাচল দ্রুত হওয়ায় একটা শারীরিক স্ফূর্তি আসে, স্থখে মন ভরা থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। সেই স্ফূর্তির প্রভাবে কসরৎ বেশী বেশী চালাবার প্রবৃত্তি বেশীর ভাগ সাধকেরই হয়; ফলে সর্ব্বনাশ আসে দুদিক দিয়ে। অতি-রিক্ত কাল অভ্যাসের জন্যই প্রতিক্রিয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক নিয়ম বদলে যায়, ক্রমে শ্বাসরোগ উৎপন্ন করে—অতি কসরতে হৃদরোগও দেখা দেয়। আর দ্বিতীয়, স্বাভাবিক তন্ময় অবস্থায় যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া এমন কি দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না, এই অযথা প্রাণায়ামের প্রতিক্রিয়ার ফলে সর্ব্বদাই দেহের উপর, শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরেই মন পড়ে থাকে, দেহ থেকে মনকে সরানো অসম্ভব হয়ে যায়, ধ্যানধারণার তো কথাই নেই, একটু স্থির হওয়াই তার পক্ষে বিষম হয়, কারণ সে আর সুস্থ নয়, অতীব চঞ্চল রিপুপরায়ণ এমন কি সে রুগ্ণই হয়ে পড়ে। এই সকল খুব দেখা যায় তাদের মধ্যে অনধিকারী যারা, যোগবিদ্যা আশ্রয় করে জীবন সার্থক করতে যায়। মূলতঃ তাদের মধ্যে অহঙ্কার, দম্ভ, মৎসরতা, স্বার্থপর বুদ্ধি—আমি সবার উপর শক্তিমান হবো এই সব মলিনতা থেকে, তার ফলেই অধোগতি।

আমরা সবাই স্তম্ভিত, একজন তখন বলিলেন, এতটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা কল্পনা করতেও পারো না, আমরা দেখে-শুনে এই অবস্থায় এসে পড়েচি। কাজেই স্বভাব বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়ে যতটা সহজ পথে চলা ততটাই ভালো। তাতেই কল্যাণ। জেনে রাখো তুমি যখন কোন বিষয়ে তন্ময় হও তখন প্রাণের স্বাভাবিক নিয়মে প্রাণায়ামের কাজ হয়ে যায়, সেই অধিকারেই তোমার এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়। তবে তুমি সব অবস্থার কথা জানো না, ঐখানেই পিছনে একজন দরকার যে তোমায় বিপথে যেতে দেবে না, যার অভিজ্ঞ দৃষ্টি তোমার অবস্থার উপর, উত্তর উত্তর তোমার যোগমার্গে গতির উপর থাকবে। এই ক্রমে ধারণা ও ধ্যানের অধিকারী হবে।

এখন আমাদের সঙ্গী এক প্রোফেসার চুপি চুপি আমায় বলিতেছেন—এইসব যতই শুনচি ততই মনে হচ্চে রাজযোগের কথাটা ভাল করে শুনে নিয়ে তা শেষ হলে হঠযোগের কথাও শুনে নিতে হবে এঁর কাছে। হঠযোগের নিশ্চয়ই কিছু শুভ আছে—আমরা তার কিছুই জানিনি শুনিওনি। এমন সময় যোগী আমাদের ফিসফিসানিটা শুনিয়াচেন —আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, জীব কত বড় অধিকার পেয়েছে এই যোগের ভিতর দিয়ে দেখলেই ধারণা হবে। মনের মালিন্য ঈর্ষা হিংসা দম্ভ মৎসরতা নিয়েই তুচ্ছ শক্তির অধিকারী হয়ে বিপথে যাচ্চে, হুঁশ নেই যে কত বড় শক্তির অধিকারী সে। জীবের

সর্ব্বোত্তম শক্তির বিকাশ রাজযোগের পথে হতে পারে, কিন্তু হঠযোগে সে রাস্তা বন্ধ।

প্রোফেসারও স্থির থাকতে পারলেন না, বলিয়াই ফেলিলেন—পরে শুনবো বলে আশা করতে পারি কি? যোগী বলিলেন, মোটের উপর তোমার মধ্যে কোন মলিন আবরণ পড়ে মন ও বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত না করে এদিকেই সাবধান হতে হবে। তোমার আমি যতটাই নির্ম্মল পাশমুক্ত হবে ততই স্বরূপে প্রতিভাতের আনন্দ হবে, স্থায়ীভাবে পাকা-রকমে এই যোগে অধিকারী হবে।

ঐ বোধটুকু পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা পৌঁছেচেন, পণ্ডিত বলিলেন। ঐ আমি বোধটুকু পর্য্যন্ত।

স্বামী উত্তরে বলিলেন, তাই তো তারি ঠেলাতেই অস্থির, চঞ্চল হয়ে পড়ে। ঐখান থেকেই ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের দ্বন্দ্ব, ঐখান থেকেই আত্মা নশ্বর কি অবিনশ্বর প্রশ্নের উৎপত্তি। নশ্বরবাদী যাঁরা বলেন দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ, ঐ যে আমি বোধ-টাকে নিয়ে এতদিন কাটানো হয়েচে, ঐ অহম আমি বোধটাও তো ভৌতিক অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থে তৈরী এই স্থূল শরীর, এতে যে শক্তি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি হয়ে ক্রিয়া করচে সেও ভৌতিক যোগাযোগে উৎপন্ন হচ্চে, সুতরাং একজনের দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে ওসব নিঃশেষ হয়ে যায়, যেমন দীপ নিভে যায়। ভৌতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেই সব শেষ। তারপর যা কিছু মানুষের কল্পনা। এভাবের নশ্বরবাদী ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাও ছিল তো। তাদের কথাও কাটাবার যো নেই, কারণ প্রমাণাভাবাৎ। তারপর বিশ্বাস নিয়েই পথ, সে কি সহজ? শেষে ব্যক্তিগত ধারণাতে এসে পড়ে। তাই তো সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নিতান্তই স্থূল হয়ে পড়ে—মিথ্যার উপরেই তার ভিত্তি। সব কাজই সাম্প্রদায়িক ভাবে হতে পারে কেবল ঐটি ছাড়া। ঐ ধর্ম্ম নিজ নিজ অনুভূতির উপর, ধ্যানধারণা সৎসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ধর্ম্মকে যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁদের আর দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে হয় না, নির্ম্মল নির্দ্বন্দ্ব শান্ত হয়ে যান, শান্তির পথেই শেষ পর্য্যন্ত চলেন। তারপর তনুত্যাগে নারায়ণ তো আছেনই—আর কি চাই, ব্যস।

কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, অনুভূতি বা সিদ্ধি কি তাঁর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল! পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন।

তা কি করে হবে, তা হলে এত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হোলো কেন? স্বামী বলিলেন, একজন আপ্তপুরুষের বিশ্বাস অনুভূতি এগুলি যে শক্তি, বহুজনের মধ্যে এটি সংক্রামিত হয়েই না সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তারপর তত্ত্বজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে এক পুরুষ, দু'পুরুষ, বড় জোর তিন পুরুষ, তার পরেই শেষ। কোথায়·কোন্ সম্প্রদায়ে দেখেছো, প্রথম পুরুষের তত্ত্ব অনুভূতি বা বিশ্বাস বা সংস্কার ঠিক আছে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত। বিকৃত হতে বাধ্য।

আচ্ছা এখন তা হলে ওসব শাখা-প্রশাখা রেখে আমাদের মূল প্রসঙ্গে এসো। যখন যোগের কথায় প্রাণের প্রসঙ্গ আরম্ভ করেচি তখন প্রাণের আরও বিশেষ কথা কিছু শুনে নাও, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামের যথার্থ সুফলের কথাও তার মধ্যে আসবে। অপাত্রে প্রাণায়াম কতটা ক্ষতিকর তা শুনেছ, এখন সুপাত্রের শুভফলের কথা শুনে বুঝে নাও তোমার করণীয়।

এইটুকু সবার চেয়ে চমৎকার যে ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ধরলেই, স্থূল শরীরের অন্তরে যতগুলি বায়ুস্তর কাজ করচে সকলগুলিব সঙ্গে পরিচয় ঘটে যায়, তারপর প্রাণকেন্দ্রে লক্ষ্য আসে। ঐখান থেকেই ধ্যানাবস্থার শুরু। সে-সব পরিচয় যেমন একটার পর একটা ঘটে, আমি সেইগুলি তোমাদের বলে যাই, পরে যদি তোমরা কেউ যোগমার্গ অবলম্বন করো, তখন মিলিয়ে নিও।

এখন শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করো। দেখবে যে বায়ু বাইরে থেকে নেওয়া হোলো, সেটা কণ্ঠদেশ পেরিয়ে যাবার বেলা একটা পাক খেয়ে ফুসফুস পানে হৃদয়দেশে গেল। ফুস-ফুসে যতটা দরকার ভরে দিয়ে এক পাক খেয়ে নাভীর উপরে পাকস্থলীতে পৌঁছালো, তারপর সেখানে আরও এক পাক খেয়ে উপস্থ দেশে গিয়ে পৌঁছালো, সেখান থেকে আবার পাক খেয়ে গুহ্যে গেল। আবার ঐ ভাবেই একটা করে পাক খেতে খেতে গুহ্য-দেশ থেকে নাভী হৃদয় কণ্ঠ বা শ্বাসনালী দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই কাজ অবিরাম চলেচে যে মুহূর্ত্ত থেকে শ্বাসগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ জীব ভূমিষ্ঠ হয়েচে। তুমি এই বায়ুর গতি ফুস-ফুস অবধি বড় জোর নাভি পর্য্যন্ত অনুভব করতে পারো, তার বেশী আর লক্ষ্য করা যায় না; তা ছাড়া পাক খাওয়াও লক্ষ্যের বিষয়ীভূত নয় তোমাদের। তখন ঐ পাঁচ ঘাটের ক্রিয়াশীল বায়ুর নামগুলি জেনে রাখো। প্রথম গ্রহণ করে কণ্ঠে যেখানে প্রথম পাক খেলে, উদানের ক্ষেত্রে তার নাম উদান, হৃদয়ের কেন্দ্রে যেখানে পাক খেয়ে ফুসফুস পূর্ণ করলে সেটা হোলো প্রাণ, নাভীতে যেখানে পাক খেলে সেটা সমান, সেখান থেকে মলমূত্র নিঃসরণ ক্ষেত্রে অপান, আর সব শরীরে রক্তপ্রবাহ বহন করাই যার কাজ তারই নাম ব্যান—এই পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়াই আমাদের শরীরে স্বাস্থ্যরক্ষা করচে।

এখন এই যে বায়ুপথটা—এক-একটা পাক খেয়ে একটা ক্ষেত্রে বা কেন্দ্রে গিয়ে সেই সেই বিভাগে কাজ করিয়ে পুনরায় ফিরে এসে প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিলচে, ততক্ষণে হাপরের কাজ অনেকবার হয়ে গিয়েছে মনে হয়, কিন্তু এখানে বায়ুপথের একটা বিশেষত্ব আছে, সেটা ঐ কাজে নামলেই দেখা যায়। সেটা এই, যেন একটি ধারায় প্রাণবায়ু কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ক্রমান্বয়েই নিযুক্ত আছে—সেটি কোন সময়ে কোন কারণে বন্ধ থাকচে না, শ্বাসনালী দিয়ে তার ফুসফুস ও পাকস্থলীতে যাতায়াত অবিরামই চলচে এটা লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু যে বায়ু নিম্নগামী হয়ে ফিরে হৃদয়ে ব্যান বায়ুরূপে সর্ব্বশরীরের কাজ চালিয়ে

আবাব প্রাণের অর্থাৎ প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশেচে, তাদের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় নেই—সেটা হয় প্রাণায়ামের ক্রিয়া দ্বারা। এই ক্রিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত চলে।

এখন প্রাণায়ামের অবশ্যম্ভাবী শুভফল যা হয় সেই কথাই শোনো, বুঝে দেখো, বিচার কবো—কিন্তু কখনো যোগীগুরু, যার কাছে দীর্ঘকাল থাকতে পারবে, অথবা যাকে নিজের কাছে রাখতে পাববে, এমনই একজনেব সহায়তা ব্যতীত এবং পর্ব্বত সমুদ্রতীরস্থ কোন স্বাস্থ্যকব আবহাওয়ার মধ্যে এমন কোন আশ্রয় না পেয়ে কিম্বা শুধু নিজবুদ্ধিকে সম্বল কবে এসব করতে যেও না, আগেই আমি তাই বিশেষ করে এতবার সাবধান করে দিচ্চি।

অনন্যমনা হয়ে এই প্রাণায়ামের ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হলে, আসলে পূরক কুম্ভক ও রেচক, যে মাত্রাব কথা পূর্ব্বেই বলেছি, ঐ মাত্রানুসারে শুরু করলে ক্রমে চিত্ত স্থির হয়েই আসে, ফলে আবও দীর্ঘকাল করবার প্রবৃত্তি বলবান হয়। শরীর এত হালকা বোধ হয়, রক্ত-চলাচল সুনিয়ন্ত্রিত হয়, শরীরের সকল যন্ত্রই সহজ ঘড়ির মতই ক্রিয়াশীল, ফলে স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর স্ফর্ত্তি আর লাবণ্য ফুটে ওঠে। তার রূপের আকর্ষণী শক্তিবৃদ্ধি, ফলে কর্ম্মীর নিজ অস্তিত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি এমন ভাবেই হয়ে পড়ে যেন ঐ অবস্থায়ই সিদ্ধিলাভ হয়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন আর কি চাই এইটাই শেষ। এখন এই যে ক্রিয়াফলের এতটা প্রভাব, তাতে কিভাবে বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে, সেটা তোমরা খানিক অনুমান নিজ নিজ বুদ্ধিতেই করতে পারো, যেটুকু পার না সেটুকুই বলচি।

প্রত্যহ ঐ পূরক কুম্ভক ও রেচকের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, কুম্ভকের কালটাই বেশী সুখদায়ক, অর্থাৎ তার মনে হয় ঐ কুম্ভকে থাকার অবস্থাই শরীরের স্ফূর্ত্তি, একটা বিশেষ সুখ বেশী অনুভূত হয়। ফলে কুম্ভকে স্থিতিকাল বাড়াবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে পড়ে। কিন্তু কুম্ভকে যতটা থাকার নিয়ম, রেচকে তার স্থিতিকাল দ্বিগুণ হবে, সেদিকে আর লক্ষ্য থাকে না। এক্ষেত্রে গুরু বা শিক্ষক থাকলে কখনই তাকে এটা করতে দেবেন না; অর্থাৎ রেচকের কাল দ্বিগুণিত না করে কুম্ভকের স্থিতি দীর্ঘ হতে পারে না, এটি তাঁর চেয়ে বেশী কেউ জানে না। এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে প্রাণায়ামের ক্রিয়াটি, মূল প্রাকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম যাতে না হয় এমনভাবেই বাঁধা আছে; এটা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। খেয়ালী ছাত্র কুম্ভকের কাল বৃদ্ধি করায় রেচকের কাল স্বভাবতই কম করতে হয়। কারণ যোগশাস্ত্রে পূরক কুম্ভক ও রেচকের কাল যথাক্রমে চার আট ও ষোলো মাত্রাই যে নির্দ্ধারিত হয়েচে, সেটা ফুস্‌ফুস্ ও হৃদযন্ত্র শরীরের এই মূল দুটি যন্ত্রের সহজ কর্ম্মশক্তি অনুসারেই বিধিবদ্ধ হয়েচে, যার ব্যতিক্রমের ফলে যন্ত্র বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কাজেই ব্যতিক্রম কোন অবস্থায় না হতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এটুকু বুঝে রাখো, কেমন?

এখন প্রাণায়ামের দ্বিতীয় এবং গুরুতর শুভফলের কথাটি বলচি। সংযত শিষ্যের যা

কর্ম্মীর রীতিমত অভ্যাসের ফলে দ্বিতীয় অবস্থায় যা হয় অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় যা এর আগেই বলা হয়েচে তার পরেরটি বুঝতে হলে, পূর্ব্ব কথা একটু স্মরণ করবে। সেই সে শ্বাস বায়ুর কণ্ঠ দিয়ে যাবার সময় প্রথম পাক, হৃদয়ে দ্বিতীয় পাক, নাভিতে তৃতীয় ও পায়ুতে চতুর্থ ও গুহ্যে পঞ্চম পাকে ঐভাবে ফেরবার পথেও সেই সেই স্থানে পাকগুলি—সংযত অভ্যাসের ফলে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক পাক সরল হয়ে যায়, কোথাও আর পাক থাকে না, বায়ুপথ সোজা হয় অর্থাৎ প্রাণায়ামী যখন শ্বাসগ্রহণ আরম্ভ করে ঐ এক পূরক অবস্থায়ই আর কোথাও পাক না থাকায় বায়ু-পথ সরল কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে সোজা চলে যায় গুহ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত, তখন কুম্ভক আরম্ভ করলে আর এক রকম ফল হয় যাতে তৃতীয় অবস্থায় পৌঁছনো যায়। সঙ্গে সঙ্গে জপটি মাত্রানুসারে চললে তার ফলে তখন সিদ্ধির নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। এসব মুখের কথায় যতই বুঝাতে চেষ্টা করা যাক না কেন, কখনই সম্পূর্ণ বুঝানো যাবে না, অনেক কিছুই বাকী থেকে যাবে—যা না কবে দেখলে বুদ্ধিগত হবার নয়।

তারপর প্রাণায়ামে দীক্ষিত শিষ্যকে গুরু যদি কোন মন্ত্র দেন, মাত্রানুসারে সেই মন্ত্র পূরক কুম্ভক ও রেচকের সঙ্গে জপের প্রণালীও দেখিয়ে দেন, যার ফলে ক্রমে ক্রমে তার মূর্দ্ধা স্থানের অনুভূতি আসে। অবশ্য এটা সঙ্গে সঙ্গেই হয় না, কিছুকাল ঐ লক্ষ্য জপ অভ্যাসের ফলেই ক্ষেত্রটি অনুভব করা যায়, যেখানে প্রাণ মন বুদ্ধি এবং অহং-এর স্বাভাবিক কেন্দ্র সেখানে আমি সত্তার অস্তিত্ব অনুভব, ঠিক ঐ স্থানটি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করবার বিষয়; কারণ যেমন শরীর-মধ্যে মাথার গুরুত্বই বেশী তেমনি ঐ যোগবিদ্যার অধিকারে মাথার মধ্যে ঐ স্থানের গুরুত্বই সবার তুলনায় বেশী। ঐখান থেকেই প্রাণের অর্থাৎ আত্মার জগৎ লীলার উৎপত্তি, প্রাণের আসন—জপযুক্ত প্রাণায়ামের ফলে ঐ মূর্দ্ধায় স্থিত হবার শক্তি জন্মায়। আত্মদর্শন ঐ ক্ষেত্রেই হয়। ঐ চক্রের নামই প্রজ্ঞাচক্র, বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে জীবের আত্মচৈতন্যের মিলন ক্ষেত্র ঐখানেই। মোট কথা সর্ব্বতত্ত্ব উপলব্ধি-স্থান। ঐখানেই তত্ত্ব, হৃদয়কেন্দ্রে এসে অনুভূতি। হৃদয়টা বুক নয়। এই কেন্দ্রে চতুর্থ চক্রের অনাহত চক্র। মেরু-মধ্যে প্রাণপথে যে ছয়টি কেন্দ্রে প্রাণশক্তি প্রবাহিত হয়ে আমাদের শরীর থেকে আত্মা পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল রেখেচে, সেই পথেই যোগীরা ষঠচক্র ভেদ করে মুক্ত হয়ে যান—সেই পথই যোগীর একমাত্র পথ।

শেষে বলিলেন, মৃত্যুকালেও এই প্রাণায়ামের কাজ আপনিই হয়ে যায়, কারণ প্রাণাত্মার শরীর ত্যাগের প্রক্রিয়াটাও ঐ রীতিতেই হয়। মোট কথাটা, এই প্রোসেসটা যোগীরা আগাগোড়া এমন ভাবেই অভ্যাস করে ফেলেন যে যখনই দেহত্যাগ করেন তখন সজ্ঞানে ইচ্ছামত দেহত্যাগ করতে এবং এখান থেকে যে লোকে গতি গমন

করতে পারেন। সেকথা এর সঙ্গে নয়। এখানে যোগমার্গের প্রধান অবলম্বন যে ক্রিয়াকর্ম্ম তারই কথাই হোলো, এতে তোমাদের ধারণা হয়ে যাবে যে যোগী হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়, এখানে কল্পনার সাহায্যে কিছু করবার দরকার নেই।

একজন বললে, তবুও দুর্লভ বস্তু নিশ্চয়ই।

গরীব শ্রমজীবী একজন দেহাত্মবুদ্ধি মানুষের কাছে একজন বড় দোকানদার, যার ধন উপার্জ্জন তার তুলনায় বেশী বলে জানে, সেই অবস্থাও সে দুর্লভ মনে করে। ও কথা যাক, এখন আর যা কিছু বাকী আছে শোন—স্বামী বলিলেন। তার পর এবার প্রাণায়ামের ফল, যে প্রাণায়ামের আরম্ভ হয়েচে ঐ পূরক কুম্ভক রেচক, চার আট ষোলো মাত্রায়, তার সার কথাটা এখানে বলবো বলে এখানে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাদি ঐ যৌগিক ভাষা ব্যবহার না করে সহজ কথায় বলবো। এই অভ্যাসের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে আসে ; অর্থাৎ দুটি নাকের বায়ু-পথই সবল হয়ে যায়, অর্থাৎ যোগীর ভাষাতে বলতে হবে সুষুম্নাপথ খুলে যায়।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে প্রায় সব সময়ে একটি দিক দিয়েই শ্বাস-প্রশ্বাস যাতায়াত করচে, অপর দিকটি বন্ধ। সাধারণতঃ দিনমানে দক্ষিণ রন্ধ্র দিয়ে, রাত্রে বামরন্ধ্র দিয়ে আর শ্বাস বদলের সময় অথবা সুষুপ্তিতে দুই পথই সরল হয়ে যায়। আবার কর্ম্মী লোকের, নানাবিধ কর্ম্মে যাদের দিন কাটে, তাদের এক কর্ম্ম থেকে কর্ম্মান্তরে মন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-পথ পরিবর্ত্তিত হয়। অসুস্থ হলে বায়ুপথ রুদ্ধ হয়। রোগের সঙ্গে ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এইভাবে যখন সুস্থ থাকে শরীর, তখন যে নাক দিয়েই শ্বাসের কাজ চলুক না কেন, সেদিকে লক্ষ্য থাকে না অর্থাৎ মন সেদিকে লক্ষ্য করবার অবকাশ পায় না। এটা জেনে রাখা ভালো যে, নাকের বাঁদিকের পথ ইড়া, দক্ষিণের পথটা পিঙ্গলা, আর যখন দুই পথই সরল ভাবে চলে তাকে বলে সুষুম্না। প্রাণায়ামের মুখ্য ফল সুষুম্নায় গতি।

প্রাণায়ামের দ্বিতীয় অবস্থায় বলেছি, কণ্ঠ হৃদয় নাভি গুহ্যদেশ শ্বাস বায়ু যখনই ঐ সকল কেন্দ্র অতিক্রম করে একটার পর একটা পাক খুলতে খুলতে যায় এবং শেষে সকল পাক সরল হয়ে গেলে—তখন সোজা শ্বাস বায়ু কণ্ঠ হৃদয় নাভি গুহ্য সকল স্তর ভেদ করে সর্ব্বশেষ গুহ্যপ্রান্ত, যার নাম মূলাধার পর্য্যন্ত চলে যায়, আবার সেই ভাবেই ফিরে এসে নাসামূল পর্য্যন্ত এলে তাকে রেচকন না হতে দিয়ে কুম্ভকের কাজে যেমন মাত্রানুসারে ধারণ করার কথা, সেইভাবে বাহিরে যাবার গতি রোধ করে পুনরায় তাকে গুহ্যপ্রান্তে পাঠানো, আবার সেখান থেকে ঘুরে নাসামূলে আসামাত্র আবার পাঠানো, এই ভাবে তিন চক্র ঘুরিয়ে তারপর আবার রেচক অর্থাৎ ত্যাগ করে নূতন বায়ু নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু কথায় আমি যা বললাম তাতে ঐ প্রোসেসটা হয়ত বুঝা গেল,

কিন্তু ঐ বায়ু গ্রহণ করে তাকে গুহ্যপ্রান্তে,—মূলাধার পর্য্যন্ত চালানো আর তাকে নাসামূল পর্য্যন্ত আনা, এই কাজটা এত সূক্ষ্ম ভাবে মাত্রানুসারে হবে,—মাত্রা রাখবার জন্য কোন বীজ যথা ওঁ, এই জপ নিয়ে মাত্রা ঠিক রেখেই চক্রাবর্ত্তন প্রাণায়ামের তৃতীয় পরিণতি, জেনে রাখ। নিয়মিত প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার, তার ফলে সারাদিন তার ক্রিয়াফল ভোগ হয়; তারপর তার নিকট পরিণতি সুষুম্না-পথ খুলে যাওয়া। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস সরল হয়ে যায়, যার সহজ পরিণাম ধ্যানের অবস্থা। ঐ যে জপ, মন্ত্রজপ চলছিল, মন্ত্রদাতা গুরু ঐ জপের প্রতিপাদ্য অর্থ একটা কিছু নিশ্চয়ই দিয়েছেন বুঝিয়ে ঐ মন্ত্র দেবার সময়, এখন সুষুম্নামার্গে গতি হলেই প্রায়ই, দীর্ঘকাল যারা অভ্যাস করচে, তাদের ঐ জপের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে একটা ধ্যানের অবস্থা এসে যায়; প্রাণায়ামের কাজ বা প্রাণায়ামের ফলাফল এইখানেই শেষ। অবশ্য শ্বাস-প্রশ্বাসের শেষ ক্রিয়া প্রাণায়ামের ফল এইখানেই শেষ। আসলে প্রাণ নিয়ে যে ক্রিয়াটা আগাগোড়া সেই জন্মকাল থেকে চলচে, সেই প্রাণ-চৈতন্যের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত তার কাজ চলবে আর সমাধির বেলা যে চৈতন্যময় প্রাণশক্তি গুহ্যদেশ থেকে নাভিতে, নাভি থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে কণ্ঠে, কণ্ঠ থেকে মূর্দ্ধায় এসে সমাধি হয়, দেহত্যাগের বেলাও অবিকল ঐভাবেই প্রাণের দেহত্যাগ ঘটে। কাজেই সেদিক থেকে প্রাণায়ামের ক্রিয়া আজন্ম বা আমৃত্যুই চলে।

অতুলদা বললেন, এই যোগের ব্যাপারে দেখলাম সবার বড় লক্ষ্যই হোলো ঐ মূর্দ্ধা স্থান, আচ্ছা ওটি কি একটি স্থান?

—না, বরং একটি বিন্দু বলতো পারো, কারণ ঐ যে অদ্ভুত বিন্দুটি যা কিছু মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, অনুভব, ধারণা, সিদ্ধান্ত সবই ঠিক ঐখানে। উপরে ব্রেণে বা মস্তিষ্কে ভরা ক্ষেত্রটার ঠিক নীচেই শরীর স্থান হিসাবে ঠিক নির্দ্দেশের ব্যাপার নয়। বড় সূক্ষ্ম বিষয়টা। আচ্ছা যোগী ঋষিদের নির্দ্দিষ্ট ঐ স্থানটির আর একটি নাম আছে ব্রহ্মরন্ধ্র। এখন রন্ধ্র বলতে ছ্যাঁদা বা সরু পথই সেটা, সেটাকে শূন্য বায়ুপূর্ণ স্থান মনে হয়। ওখানে এমন স্থান আছে কিনা ডাক্তারেরাও বলতে পারে না, তাদের ধারণায় ঐ স্তরটি ভরাট, মাথার ঘিলু পদার্থে ভরা। কিন্তু যোগীরা জানেন ঠিক তার নীচেই, দুটি চক্ষের গোলা আর কানের ভিতর কর্ণপট যাকে বলে সেই লাইনের ঠিক মাঝখানে এবং নাক দিয়ে বায়ু যেখান দিয়ে নীচে নেমেছে সেই বাঁকের উপর এই কটির সংযোগ স্থলেই মূর্দ্ধা। উপরে ব্রেণের সঙ্গে তার কর্ম্ম সম্পর্ক আছে বৈকি, তবে তা এমনই সূক্ষ্ম যা অনুভব ব্যতীত বর্ণনার বিষয় নয়।

ঐ মূর্দ্ধার মাহাত্ম্য তো শুনলে যে ঐখানে সর্ব্বতত্ত্বের অনুভূতি, এখন আর এক মাহাত্ম্য-কথা শোনো। সেকালে হিন্দু রাজাদের অভিষেক হতো জানো তো? কোনো রাজাকে

রাজ সিংহাসনে বসবার আগে রীতিমতো অভিষিক্ত হতে হতো। এখন অভিষেক মানে ঘড়ার জলে স্নান করানো, কোন জলাশয়ে নদীতে অবগাহন স্নান নয়। একশো আট ঘড়ায় তীর্থ জল, নানা স্থানের নানা নদীর জল পূর্ণ করে রাখা হতো, শুভ লগনে সেই জল ঢালা হোতো মাথায়। তারপর যথারীতি সিংহাসনে আরূঢ় হতে হোতো,—তাকেই অভিষিক্ত হওয়া বলে। কিন্তু এই অভিষিক্ত হওয়া মাথায় বা শিরোদেশে যেখানে জলটা ঢালা হোলো সেখানে নয়, জলের শৈত যেখানে অনুভূত হয় সেই মূর্দ্ধাদেশে যেটি সকল অনুভূতির কেন্দ্র সেইস্থানে। সেইজন্য রাজাদের মূর্দ্ধায় অভিষিক্ত হতে হোতো এবং সেই অভিষেকের কথায় বা বর্ণনায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলা হতো। মূর্দ্ধাভিষিক্ত না হলে রাজাই নয়। জগৎপালক বিষ্ণুর অবতার হোলো রাজা, ঐ অভিষেকের পর তবে রাজার উপাধি হোতো প্রজাপালক।

নাহার মশাইয়ের পাশে দুজন ফিসফিস শব্দে কথা কহিতেছিল, তাহাদের এসব ভাল লাগে না—অথচ এতগুলি লোকের মনোযোগেব মাঝে তাদেব উঠিয়া যাইতেও সঙ্কোচ বোধ। স্বামী হয়তো লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই। এবার তাদের একজন একটা অবান্তর প্রশ্ন করিয়া বসিল। আচ্ছা সেকালের রাজারাও কি যোগসাধন করতেন? স্বামী যেন শুনতেই পাননি এমনভাবে রইলেন, কোন কথাই কইলেন না। আমি কাছে থেকে যোগীর মূর্ত্তি দেখছিলাম। এই পান খাওয়া যোগী দেখতে সত্যই গম্ভীর,—কথা কি মিষ্ট! অনেকক্ষণ দেখিয়া কতকটা মেমারীর মধ্যে পুরিয়া লইলাম তাঁব মুখাকৃতি। চক্ষু দুটি বড়ই করুণ মনে হইল। আরও মনে হইল যেন কিছু বলিবেন, পূর্ব্ব প্রসঙ্গ এখনও শেষ করেন নাই। সত্য তাহাই হইল। তিনি সুরেনবাবুর দিকে দেখিলেন,—বলিলেন, যোগের কথা যেটুকু হোলো শুনে কি মনে হয়?

সুরেনবাবু বলিলেন, আমরা যেভাবে যে সব কাজে দিন কাটাই, অবশ্য তার মধ্যে আপনি যা বললেন যোগের কাজও অনেক হয়। আমার কথাই বলতে পারি, আর কারো কি হয় জানি না, হয়তো ঐ রকমই হবে, আপনার কথা শোনবার পর মনে হয় এখন থেকেই যেন ঐ প্রাণের ক্রিয়াই আমার লক্ষ্যের বিষয় হোলো। তবে তাকে ঠিক ধরা যাবে না তো!

যখন সব কিছু ছেড়ে ঐ প্রাণকে নিয়ে থাকতে পারবে তখন এসো, পথ বলে দেবো ধরবার,—সব কাজের সঙ্গে করবার কাজ নয়। কেন জানো? অনেক বিক্ষেপ আছে কিনা। একবার নাগাল পেলে পর তখন সকল সময়ে সব কাজের সঙ্গে মহাস্ফূর্ত্তিতেই লক্ষ্য করতে পারবে। এ নিয়েও অনেক কিছু আবিষ্কার চলতে পারে। খাওয়া-পরার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা থাকলে আর কোন উটকো দায়িত্ব ঘাড়ে না থাকলে, মনকে

একটু ফাঁকায় আনতে পারলে এই তত্ত্ব নিয়ে অনেক কিছু করা যায়; শিক্ষিত সমাজে অনেক কৌতূহলী আছে এসব জানতে চায়, তাদের কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারবে।

এইবার একটু স্বস্তিবাচন হয়ে যাক,—হে আমার পরমাত্মীয়, আমি সকল, এখন এসো, আমরা আর গুরু-শিষ্য বা লঘু-গুরু উপাধি ত্যাগ করে এক স্তরে এসে যাই আর সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করি, যোগধর্ম্মের ভিতর দিয়ে আত্ম সাক্ষাৎকারের ফলে আমরা জেনেছি যে আমরা একই সত্তা, আর যোগধর্ম্মের মধ্যে দিয়েই প্রাণের এই আশ্চর্য্য অস্তিত্বের কথা বুঝতে ও জানতে পেরেছি। সত্তায় আমি প্রাণময় অনুভব হলেও, অপরিচিতের মত তাকে খানিকটা দেখে এসে এখন যেন একটু হদিস পেয়েছি বলে মনে করচি। এই প্রাণকে ধরবার পন্থা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভিতর ঐ প্রাণায়াম ক্রিয়াটি, তার নিয়মিত অভ্যাসের ফলে শরীর ও মন শোধনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ থেকে উচ্চমার্গে গতি,—যার নিশ্চিত ফল জ্ঞানানুরতি। অষ্টাঙ্গযোগের প্রত্যেকটি অঙ্গ আত্মতত্ত্ব শুধু নয়, সর্ব্বতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অতীব সহজ পন্থা,—মানব সমাজের এতবড় আনন্দ, শান্তি ও বিজ্ঞানময় পথ আর নেই।

এর যিনি আবিষ্কর্ত্তা, কি অসাধারণ সরল এবং সহজ একটা বিষয় থেকে আরম্ভ করেছেন ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে,—আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই শুরু করে শেষে জগৎপ্রাণে তার পরিণতি। এমন সর্ব্বজনবরেণ্য তত্ত্ব শুধু নামে নয়, তার প্রতি পদে অনুভূতি, প্রমাণিত সত্য। শিবের এই যোগমার্গ সর্ব্বস্তরের মানুষের জন্যই, কেবল শিক্ষিত বিত্তবান উচ্চবর্ণগর্বিত আর্য্যজাতির নাগরিকগণের নয়, আর এইখানেই সেই মহাঋষীর যোগমার্গ আবিষ্কারের সার্থকতা। তাঁর অসীম মাহাত্ম্য অকূল বারিধির মতই ঠেকে আমাদের কাছে। পরবর্ত্তীকালের আর্য্যেরা শিবের শুধু এই যোগমার্গ নয়, তন্ত্রধর্ম্মের অন্তর্গত আচার-অনুষ্ঠানের অনেক কিছু আপসে ছাট্‌কাট করে তবে নিজেদের মত করে নিয়েছিলেন নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য। কিন্তু যোগশাস্ত্রের মধ্যগত এই প্রাণায়াম অঙ্গটি, এর সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়া যেটি যোগমার্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ, এ ধারাটি হুবহু বজায় রাখতে হয়েচে,—এর ন্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে ছেঁটে-কেটে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেন নি। সেটা করেন নি বলেই আজ আমরা প্রাণায়াম রীতিটি যথাযথ স্বাভাবিক ভাবেই পাচ্ছি। নষ্ট আমাদের অনেক কিছুই হয়েচে,—যেটুকু আছে সেটুকু নিয়েও আমরা জীবনের পরমার্থ সিদ্ধ করতে পারবো।

এখন আত্মার ইচ্ছায় এই তত্ত্ব সাধারণ না হোক,—শিক্ষিত, যথার্থ পিপাসু যারা তাদের মধ্যে আয়ত্ত করা প্রয়োজন হয়েচে। দেখ তার প্রমাণ,—আজ এখানে আমার

আসবার কথা নয়, আসাটা দৈবাধীন, তারপর তোমাদেরও আসবার কথা নয়। জজ সায়েবের একটি বিষম দোষ উনি একটা ভালো মুখরোচকই হোক বা পুষ্টিকর উপাদেয় ভোজ্য কিছু একলা খেতে ভালবাসেন না, সকলকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়া চাই। আমরা সেটা ভাল বুঝি না; একটা চমৎকার জিনিস পাওয়া গেল, নিজে পেট ভরে খেয়ে কোঁচায় মুখ মুছে,—মুখে প্রতিবেশীকে বললাম, কি হে ভাল আছ তো? তা নয় উনিই তোমাদের চাঁইয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে এই অপরূপ জীবটিকে দেখেশুনে যাবার ব্যবস্থা করেচেন। নাহলে তোমরাও আসতে না,—আর যেই এখানে আজ কথা আরম্ভ হোলো অমনি পরলোক-তত্ত্ব আরম্ভ করলেন, দেহত্যাগের পর কি গতি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সেটা চুকলো, তারপর আমাদের প্রোফেসার আসল কথাটা পেড়ে বসলেন, আর মনে হোলো এটা শোনবার আগ্রহ যেন সবারই বেশী ছিল। কাজেই এতে যদি ধারণা করে থাকি আজকাল শিক্ষিত সাধারণ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন ও যোগশাস্ত্র নিয়ে, তার মধ্যে যথার্থ কি আছে আর কি নেই জানতে উৎসুক এই কথা ভেবে থাকি তাহলে কি ভুল করেচি? আমি নাড়ী টিপে বসে আছি যে, তাই তো জাতি দেহের তাপটা ঠিক ধরতে পারচি। তা বলে সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,—এ তো সবার নয়, কাজেই এখন এইভাবে অনেকটা আলোচনার ভিতর দিয়ে কতক সারবস্তু তোমাদের মরমে প্রবেশ করুক তারপর যথাকালেই তা লাভের জন্য ঝম্পপ্রদান করলেই হবে। এখানে কিছুই ত্যাগের বা গ্রহণের বিষয় নয়,—যেটা করতে হবে প্রেমে করতে হবে—ব্যস, এই চাই। এইভাবে বংশবৃদ্ধি হবে। এ জগতে এখনকার দিনে যতটা যোগীর বংশবৃদ্ধি হয় ততটাই মঙ্গল। কারণ মানুষ সর্ব্বজনহিতায় যা কিছু কর্ম্ম, ধর্ম্ম যা কিছু করে তার ফলাফল অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, যার শেষটা রহস্যেই আবৃত।

—আচ্ছা প্রাণায়ামের সম্বন্ধে শেষে যা বললেন,—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের কাজ আপনি চলে—

বাধা দিয়ে যোগী বললেন, হাঁ গো, শুধু তা নয় যখন কোন সূত্রে আমাদের একটা ভয়ানক দুঃসহ উত্তেজনা, শোক, দুঃখ আসে,—কোন আঘাতে আমরা সেই সূত্রে কেঁদেও থাকি, তাতেও প্রাণের ক্রিয়া ঐভাবেই হয়ে যায়। শুনে আমরা সবাই বিশেষ মনোযোগী হলাম। তিনি বলিলেন, তাই তো হয়। হয়তো চক্ষের সামনে দেখলে একজন গাড়ীর চাকায় কাটা গেল, তুমি তার সেইভাবে মৃত্যু দেখলে, সেই প্রত্যক্ষ দৃশ্যটা তোমার মধ্যে যে ক্রিয়া করবে তাকে তুমি মনের ক্রিয়া বলেই বর্ণনা করবে, যথা আমার মনে এইরকম হোলো, বুক ধড়ফড় করতে লাগলো ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আসলে যা কিছু হোলো ঐ প্রাণের রাজ্যেই হোলো। সেই প্রাণকেন্দ্র থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত প্রাণের আলোড়ন যদি লক্ষ্য করা যায়,—যা যোগী সাধকেরা অনুভব করে থাকে, তা চমৎকার, কথায় বলতে

গেলে এইটুকুই বলা যাবে যে, প্রাণ আশীর্ষ মূলাধারাবধি আলোড়িত হয়ে কেন্দ্রে স্থির হোলো, কিন্তু আলোড়নটা ভোগ করলে কে ?

একজন বললে, আমি। শুনেই যোগী তাকে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করেই জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমিকে তুমি, বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই ধরতে পারো নি, তোমার যে আমি এই বোধ বা জ্ঞানটি, তাকে কি বেদনা বা আঘাত স্পর্শ করতে পারে ? ফটিক তুমি বল তো কি বুঝেচ ?

ফটিক বললে, শরীরের আঘাত শরীরে, অর্থাৎ প্রাণময় তার প্রতিক্রিয়া আর তার অনুভূতি হোলো এখানে স্পর্শ, ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ে, প্রাণক্রিয়ার ঘাৎ-প্রতিঘাতে। বুদ্ধিতে ধারণা হোলো এইটি এই আঘাত, আর সকল কিছুর কারণ বোধরূপে এই আমি সবার সঙ্গেই তো আছি, তাই দেখচি, আর সব শুনচি, যেন সাক্ষী, অথচ আমাকে ওসবের কোনটাই ছুঁতে পাবে নি।

আচ্ছা এইখানেই আমায় একটু বলতেই হবে। প্রথমে যিনি আমি বলিয়াছিলেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন,—তোমার মধ্যে দেহাত্মবুদ্ধি এখনও বেশী আর ফটিক নিশ্চয়ই উপদিষ্ট হয়ে ক্রিয়াশীল, জপ-প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলেই ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেচে প্রাণের ক্রিয়াগুলি, তাই ও এতটা পরিষ্কার অনুভব করেচে। শোনা কথা এক, আর অনুভব করা আর এক কথা। আরও একট কথা আছে কিন্তু, সেটি এখনও বাকী আছে বলতে। পূর্ব্ববর্ণিত ঐ যে আঘাত ইন্দ্রিয়পথে প্রাণে এসে পৌঁছানোর ফলে আত্মা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপে স্থিত হয়ে আবার নেমে তখনি যেখান থেকে তিনি গিয়েছিলেন সেইখানেই পৌঁছানোর ফলে আনন্দও এনেচেন। তোমার ঐ বেদনার সঙ্গে সেই অমৃত বেশ খানিক ভোগ করতে লাগলে যে। অবশ্য এত বিশ্লেষণের অবস্থা তোমার নয় তখন, তাই হয়তো বিশেষ লক্ষ্য করলে না। শুধু আঘাত বা বেদনা বা গভীর দুঃখমূলক একটা কিছু বলেই নয়, তোমার সুখের ব্যাপারেও তো এই ভাবটি ঘটে আগেই বলেচি।

সুখের ব্যাপার এমন কি ইন্দ্রিয় সম্ভোগের বেলাও ঐ প্রাণায়ামের ক্রিয়াই হয়, আর তার ফলে তোমার ক্রিয়াশীল চঞ্চল প্রাণ, ভেবে দেখ শরীরের সর্ব্বত্রই প্রবাহিত প্রাণ স্থিরগুপ্তি হয়ে কেন্দ্রস্থ হয়ে যায়। অবশ্য অল্পক্ষণের জন্যই। কারণ কর্ম্মবাড়ির কর্ত্তারা বেশীক্ষণ বসলে চলে কি? প্রাণ স্থির হওয়াটা কি বুঝেছ তো? ফটিক বললে, ঐ আমির স্বরূপে প্রতিভাত হওয়া আবার আনন্দ নিয়ে ফিরে আসা। যোগী বললেন,—ঠিক। এর উলটো দিকটাও আছে। উপেক্ষায় দুঃখ অনুভব করি আবার শ্রদ্ধা বা প্রীতি সম্ভাষণের ফলে আনন্দলাভও ঘটে। শোকের ফলে কাঁদাতেও ঐ কাজ,—ফলে আনন্দ লাভ। শোকের স্থায়িত্ব যতটা, ইন্দ্রিয় কেন্দ্র হৃদয়ে, মনে এবং বুদ্ধিতে তার প্রতিক্রিয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বোধটি অর্থাৎ আত্মার স্বরূপে স্থিতির সঙ্গে

সঙ্গে নেমে আসার ফলে আনন্দ লাভ, এসব যুগপৎ ঘটতে থাকে। সেই জন্যই গভীর শোকে একলা থাকার এতটা ইচ্ছা প্রবল হয়। আত্মানন্দই অর্থাৎ আত্মার স্বরূপে স্থিতির পর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দের আভাস সেটা একলাই ভোগ করতে ইচ্ছা হয়, তখন কোন সঙ্গ ভাল লাগে না, কারণ এ সঙ্গ সাধারণতঃ সংসার সম্বন্ধে বাহ্যক্রিয়া কর্ম্ম ও ভোগেব মানুষ যারা তাদেরই সঙ্গ তো! সে আনন্দের ভাগী তারা নয়, এই ব্যাপার। এখন তো হদিস পেলে খানিকটা, নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসাবে এ সম্বন্ধে একটু কালচার করো না, ফল ভালই হবে।

অতুলপ্রসাদ বলিলেন,—তা হবে না স্বামীজী, out of sight out of mind—আপনার সঙ্গে সঙ্গে সব মন থেকে চলে যাবে।

ফটিক বলিল, আপনাব যে অকুপেশন তাতে আপনি যে আনন্দ পান সেই জন্য আপনাব পক্ষে ওটা সত্য, কিন্তু যাবা ঐ সব নিয়ে চলচে, ভিতবে ঢুকতে চায়, তাদের তা হবে কেন, তারা ছাডতে পারবে না। স্বামী বললেন,—সংস্কার যাব অনুকূল তাদেবই সম্ভব হবে এসব নিয়ে আলোচনা। কিন্তু এখানে যাঁবা আছেন সবার সংস্কার তো এসবের অনুকূল নয়, যদিও শুনবাব সময় আগ্রহ কিছু কম দেখা যায় না। আসল কথাটা ফটিকেব মুখ থেকে বেবিয়ে গেল কিন্তু ওর তাৎপর্য্যটা কেউ নিলে না। এখন এটা বুঝতে তো কোন কষ্ট নেই যে আনন্দ বা সুখই তো সবার লক্ষ্য, এখন যার যেটা বৃত্তি, পয়সা তো আসল কথা, তাব উপব যদি সেটা অর্থাৎ ঐ বৃত্তির কাজটিতে আনন্দ থাকে, আব ঐ বৃত্তিধারী যদি প্রতিভাশালী হন যেমন অতুলপ্রসাদের ব্যারিস্টারী অথবা সুরেনবাবুর প্রফেসারী, তা হলে সে আনন্দ ফেলে অন্য কিছু করতে যাওয়া, সেটা তার মুখ্য অবলম্বন হবে না,—গৌণ অবলম্বন হবে। তবে এটা বৃথা হবে কেন, একেবারেই।

১০

যোগির দৃষ্টিভঙ্গী

অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর এবার আরও একটু হইয়া গেল। ফটিক জোড় হাতে, আচ্ছা শ্বাসে শ্বাসে মন্ত্রজপ, আর প্রাণায়ামের ফল কি একই? প্রশ্নটি করিল। আমি তো অবাক। শুনেই তিনি বললেন, দেখো বাপু, তুমি বড় সহজ ছেলে নয়,—তুমি কি চাও, হঠাৎ একদিন খানিকক্ষণ একজনকে পেয়ে তার কাছ থেকে সব কিছুই [illegible] করে নিয়ে সিদ্ধির পুঁটলি বেঁধে নিয়ে ঘরে যাবে? অথচ দেখো আমার [illegible] [illegible]দের মধ্যে জজের বৈঠকখানায় আজ দিনটা আর রাতটা কাটাবো বলে এসেছি। [illegible] তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগটা ঘটেচে এর মূলে ঐ অঘটন-পটিয়সীই আছেন, না[illegible] [illegible] কোথাকার

মানুষ আজ এইক্ষণে এখানে, সিংহের গুহায় এসে জমায়েত হয়েছি, কেন? আবার কাল কোথায় থাকবো তার স্থিরতা নেই। আমাকে বলতেই হবে সেটা বড় কথা নয়। এক্ষেত্রে বড কথা যা আমার পক্ষে শক্ত, তোমাদের প্রত্যেকের ধারণা হয় এমন ভাবেই বলতে হবে তো? তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, একলা তোমায় নিয়ে কিম্বা ফটিককে নিয়ে পড়লে ঢের সহজ হোতো কাজটা, কিন্তু এতগুলি বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বুঝানো কি সহজ? এ যেন আমাব পক্ষে আব একটা পরীক্ষা,—নয় কি?

নাহাব মশাই বলিলেন, আমাদের বিরুদ্ধ-শক্তি বলছেন? স্বামী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, বলচিই তো। যার আমার প্রতি বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা যদি থাকে সে তো আরও ভাল কথা, জটিল হলেও একটি তত্ত্বকথা আমাব পক্ষে তাকে বুঝিয়ে, অনুভব করিয়ে দেওয়াও সহজ, কিন্তু যাদের মধ্যে এখনও শ্রদ্ধা জন্মায় নি, অনেক অনেক যাচাই করে তবে যাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে, তোমাব মত যাবা পবীক্ষা করতে এসেচে তাদের বুঝানো কি সহজে হবে? এরা তো অনধিকাবী, রাগ কবো না, তোমরা বিদ্যা ও বুদ্ধিজীবী লোক, যার নাম ইণ্টালেকচুয়্যালস, অর্থাৎ সমুদয় বিদ্যা-বুদ্ধি, ধনবৃদ্ধি আর সুখস্বচ্ছন্দ উপভোগের পিছনেই লাগিয়েছ, বড জোর হেলথের জন্য গাড়িতে চড়ে প্রাতে একবার গঙ্গায় অবগাহন স্নান কবে, অন্ধ ভিখারীর হাতে আনি দুয়ানি দিয়ে এলে খানিক পুণ্যকর্ম্ম করে। তাতে কি হোলো? যা কিছু শুনবে প্রত্যেকটাই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখাই তো তোমার অভ্যাস। বৃথা তর্কই যাদের বুদ্ধিমত্তাব পরিচয়, আমার কি গরজ বল, তাদের সঙ্গে বৃথা সময় ও শক্তি নষ্ট করব, কেন?

সবাই স্থিব-নিস্তব্ধ, দেখিয়া খুব গম্ভীর ভাবে আবার বলিলেন, একটা কথা, তুমি হয়তো কল্পনাও করো নি যে,—তুমি যেমন আমাকে, তোমার বুদ্ধির মাপকাঠিতে পরীক্ষা করতে এসেছ এই লোকটার সত্যসত্যই পথের জ্ঞান আছে কিনা,—আমিও তোমায় পবীক্ষা করচি,—অধ্যাত্ম-বিদ্যা কতটুকু গ্রহণ করতে পারো অথবা তোমার মধ্যে আদৌ গ্রহণ করবার শক্তি জন্মেছে কিনা? যদি বুঝতে পারি পুঁথির বিদ্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ছাড়া তার বেশী আর কিছু নেই তোমার মধ্যে, তা হলে বলো তুমি, আমার কি প্রবৃত্তি হবে তোমার সঙ্গে কালক্ষেপ করতে? তোমার বলেই বলচি, তুমিই তো একলা নও, এখানে তোমার মত আরও অনেকে তো আছে।

বুঝিলাম, শুধু আমি নয়, নাহার মশাই প্রভৃতি আরও কেহ কেহ বুঝিলেন, এসব কথা কাহাদের উদ্দেশে বলা হইল। সবাই চুপচাপ, কেহ কিছুই বলিলেন না। শেষে, একটি স্নেহময় পিতা যেমন নিজ সন্তানকে বলেন সেই ভাবেই স্বামী বলিলেন,—

"চুপ করে শুনে যাবে, তোমাদের অনেকেরই অপরিচিত এই রাজ্য, শুধু শ্রদ্ধা করে শুনবে। শ্রদ্ধা আমায় করতে বলচি না, ঋষির বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারকে শ্রদ্ধা করে

শোনো, যথা সময়ে ফল দেবে। এর পর কথা আছে কি? কিছু মনে কোরো না বাবা, এইভাবেই ক্ষেত্রটা তৈরী করে নিলাম,—বুঝেছ? যেখানে যেমন সেখানে তেমন করতে হয়, আমার শত্রু তো কেউ নেই এখানে তাই বলি,—প্রেমের সম্পর্ক নিয়েই চলো ঠকতে হবে না, তার সব দিকেই লাভ। মানুষ স্বভাবতঃ মানুষই, পতঙ্গ নয়, কীট নয়, পশু নয়, মানুষই। কেবল ভেদ আর বৈশিষ্ট্য নিয়েই যেন থাকতে ভালবাসে। তার গোড়ার কথাটা কি জানো, নিজ বৈশিষ্ট্য রাখা,—নাহলে বড একঘেয়ে হয়ে যায় জীবনটা। মত-ভেদের কিছু না পেলে, পাশের লোকের পিঠে একটা চাপড দিয়ে বলবে, শালা বলে ভালো, কি বলো?

এবার সবাই হেসে উঠলো,—হালকা হয়ে গেল ঘরের বাতাসটা, তখন স্বামী আরম্ভ করিলেন,—

✓এক রকম জপ আছে, বিসর্গ জপ,—দিবারাত্র যতক্ষণ চেতনা থাকবে অর্থাৎ জেগে থাকা যাবে ততক্ষণই চলবে জপের কাজ। আসলে জপ হোলো তাল ও মাত্রা। শ্বাসে শ্বাসে জপ, বললে বুঝতে হবে যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক তালে চলচে সেই সঙ্গেই মন্ত্রজপ চলবে। শ্বাসের সঙ্গে যে মন্ত্র বা শব্দটি থাকবে, মুখে উচ্চারণ দরকার নয়, তা প্রাণকেন্দ্রেই উচ্চারণ চলবে। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মাত্রানুসারে ঐ মন্ত্র ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ একই সঙ্গে চলবে। এতে যে কাজ হবে তাতেও চিত্ত স্থির হবে কারণ মনটা সর্ব্বক্ষণ মন্ত্রের সঙ্গেই রইলো, তারপর যখন এমন কাজ আসবে, যেখানে মন, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইন্দ্রিয় অর্থাৎ শরীর দিয়ে কাজ, তখন জপের কাজ বন্ধ থাকবে। যখনই শরীর নিয়ে কাজ করতে হবে তখনই জপ বন্ধ। সুস্থ শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আপনিই চলে, কারো সেদিকে লক্ষ্যই থাকে না। এ একরকম জপ,—শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আপনিই অভ্যস্ত হবে। সাধারণতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধকেরা এই নিয়েই চলচেন। গৌরাঙ্গের উপদেশেই এই সহজ জপের আরম্ভ হয়েছিল তাঁর গৃহী ভক্তদের মধ্যে। এইভাবে জপ অভ্যাসে, মন চাইবে যেন ঐ কাজেই থাকি। রিটায়ার্ড, যারা শেষ জীবনে সম্বলরূপে হরিতে ধরেছেন তাঁদের পক্ষেই এই জপ বিশেষ ফলপ্রদ। ✓কারণ দেহত্যাগের পূর্ব্বে যদি চৈতন্য থাকে তা হলে ঐ অভ্যাসের গুণেই মহাশান্তিতে মৃত্যুর কোলে গিয়ে পড়া যায়।

—কিন্তু দেহত্যাগের সময় যদি চৈতন্য না থাকে, তাহলে? ঐ প্রশ্ন করলে ফটিক।

—তা হলে এত দিন যে ঐদিকে লক্ষ্য করে, ঐ জপের সঙ্গে মনন চালিয়ে এসেচে তার ফলটা যাবে কোথা?

আপনি বড় তাড়াতাড়ি শেষ করলেন, ফটিক বলিল।

শুনিয়াই তিনি বলিলেন, কোথায় দেরি করে শেষ করবো বলে দাও। এখন এটা তো বুঝতে পারা যাচ্চে যে, যা কিছু জপ, তপ, ক্রিয়া, প্রাণায়াম, ধ্যানাদি সব কিছুই ঐ

আমি,—আমি বোধ বা উপলব্ধি স্বরূপ যে আত্মা তাইতেই স্থিত হবার জন্য,—তার আসল কথা হল আমিকে পাওয়া, জানা, আত্মস্থ হওয়া সব কিছুই। দেহ এবং দেহস্থ প্রাণ থেকে আরম্ভ করে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির যে সকল কাজ দেহমধ্যে হয়ে চলেচে তার পিছনে আমি, অহং উপলব্ধি আছে বলেই না সকল ইন্দ্রিয়াদির কাজই সম্ভব হচ্চে? যদি কোন কারণে আমি বোধ ভিতরে না থাকে তাহলে সকল ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধির কাজ বন্ধ। তাহলে সবার মধ্যে যে আমি বোধ—সেই জীবরূপী আমিকে ধরলেই সব তত্ত্ব বা রহস্য ভেদ হবে,—এই কথাই যোগশাস্ত্রের আসল কথা, আর যে সকল প্রক্রিয়ায় তাকে ধরা যায় তাই হোলো যোগের রাজা, রাজযোগ।

উপলব্ধিকে নিয়েই সব কথা,—ভিতরে যে আমি, উপলব্ধিটা হচ্চে, সেই আমিই জীব; যোগের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে মনের ক্রিয়াকে যে উপায়ে ক্রমে ক্রমে ঐ আমি উপলব্ধিতে কেন্দ্রস্থ করা যায় সেই উপায়টাই যোগ। তারপর সেই আমি তত্ত্বে স্থিত হলেই ক্রমে আত্মার বা অহংএর বা আমির স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা করবে। তখন জীব ভাবের যে অহম সেই অহম, বা আমির দীর্ঘকাল স্বরূপে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তার চিৎশক্তি ও আনন্দ-ঘন সত্তার উপলব্ধিতেই তার সার্থকতা।

—ঐ চিদানন্দময় স্বরূপে স্থিত হওয়াই তো শেষ? ফটিক বলিয়া বসিল।

উত্তরে যোগী বলিলেন, কথাটা কি রকম হোলো জানো, একজন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র, আই. এস-সি, বি-এস-সি পাস করে পরে ইঞ্জিনীয়ার হবো, সংকল্প করে খোঁজ নিচ্চে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে গিয়ে পাঁচ-ছয় বৎসর পড়ে এগজামিনে পাস করে ইঞ্জিনীয়ার হলেই তো হোলো? তোমার স্বরূপে স্থিতির অবস্থা যে কি রকম তা তো এখন তোমার কল্পনাতেও আসবে না; তার পর যে সমুদ্র আছে! তুমি ছিলে পার্ব্বত্য ঝরণা, তারপর হলে নদী, তারপর নদী অবস্থায় কায়ার বিস্তার হতে হতে মোহানায় এসে তোমার শেষ প্রসার দেখলে, তারপর সামনে কি দেখবে?

আর কথা চলল না। সবাই স্থির।

কতক্ষণ পর আবার একটু কথা, যোগীর নানা অবস্থায়, সাধন এবং সিদ্ধ অবস্থায় আহার বিহারের কথা। বিশেষতঃ যোগীর আহারের কথাটা আমার জানবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, এইবার সেই সুযোগ বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যোগীর আহার সম্বন্ধে কি কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি? আমরা সাধারণতঃ যা কিছু খাই তাই-ই কি যোগীর আহার?

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, আমি তো এই কথাই ভাবছিলাম যে অতোগুলি বড় বড় কথা সবাই জানতে চাইলে, কিন্তু এমন একটা অতীব প্রয়োজনীয় তথ্য কেউ জানতে চাইলে না তো? যাক, শুনে সুখী হলাম আমার এগজামিনারদের যথার্থই আন্তরিকতা আছে,

কোথাও আমার ফাঁকি দেবার যো-টি রইল না। বিশেষতঃ একজনকে এড়ানো মুশকিল, —ফটিককে যদিও বা এড়াতে পারি তোমায় পারবো না, এটা ঠিক। এইভাবে আমাদের গৌরব বাড়াইয়া প্রসন্ন ভাবেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগির আহারের কথা হয়ে গেলে পর বিহারের কথা তখনই আবার জিজ্ঞাসা করে বসবে না তো?

শুনিবামাত্র ফটিক তখনই বলিয়া ফেলিল, দয়াময়! আপনিই তো আমাদেব তৈরী করে দিচ্ছেন, নয় কি?

স্বামী বলিলেন, ভাল,—তাই-ই ঠিক। তোমাদের কাছেই শেষ অবধি কি দুর্গতি আমার হবে, মা জগদম্বাই জানেন, এখন যা জানি তাই বলে তো নিষ্কৃতি পাই।

আমরা যখন যোগী গুরুব ঘরে সাধনা করতাম,—প্রাণায়াম নেবার পূর্ব্বে যম, নিয়ম, আসনের বেলা, এক প্রহরেব শেষে চাব, বড জোর পাঁচখানা পাতলা রুটি, তাব নামই হলো ফুলকা, পাতলা মুগের দাল,—একটু আমের চাটনী, একটু ঘোল, দই নয়, তার মধ্যে মিষ্টির নামগন্ধ থাকবে না। হল ভেণ্ডি, ঝিঁঞা, বেগুন, সীম, এই সব দিয়েই তরকারী, তাতে তেলের নাম নয়। আর একবেলা দুটি ভাত, একটু ঐরকম পাতলা ডাল, মসুর কিম্বা মুগ—, বিকালে একটু হালুয়া, একটু দুধ, অন্য কিছুই নয়। এইভাবে প্রথমে। তারপর পাকস্থলীটা ভার বোধ না হয়, খাওয়ার বেলা এইটুকু লক্ষ্য রাখবার কথা,- -তিন-বার ভোজনে, কোনবারেই পেট ভরা নয়। এমনই হয়ে গিয়েছিল অভ্যাস, ঠিক মাপটা হয়ে গেলেই একটি উদ্গার উঠে জানিয়ে দিতো, ঠিক মাত্রা হয়ে গিয়েচে।

এইভাবে তিন মাস, তার মধ্যে কোথাও কোন ভাণ্ডারাতে বা নিমন্ত্রণে যাওয়া এবং খাওয়া প্রথম থেকেই ছিল নিষেধ। লুচি বা পুরী বা পরোটা বা কোন মিষ্ট পিষ্টক বা মুখরোচক খাদ্য বা আমিষাহার নিষিদ্ধ। তখন আমি রাত্র চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে, কি শীত কি গ্রীষ্ম স্নান করে এসেই আসনে বসে যেতাম। একাদিক্রমে দু'ঘণ্টার বেশী নয়, তারপর ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে পাইচারি, পরে পাঠ নিয়ে বসতাম। পাঠ নেওয়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল,—দুটি লাইন সংস্কৃত শব্দ, চারবার, তিনবার, দুবার অর্থাৎ প্রথমে চার, তারপর তিন, তারপর দুই, শেষে মাত্র একবারের পাঠেই একেবারে মুখস্থ হয়ে যাবে—এই অভ্যাস; স্মৃতিশক্তির কসরৎ,—এই সব ছিল আমাদের। কথা বেশী কওয়া নয়, এমনই নিয়ম ছিল; চীৎকার নিষিদ্ধ, গলার আওয়াজ কাছের লোক শুনতে পাবে, তার চেয়ে দূরে কোন লোক থাকলে তার কাছে গিয়ে বলতে হবে। এইভাবে, নিয়মের কাজ চলতো। তিনবার আসনে ছয় ঘণ্টা বসা, প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে বসার অভ্যাস ঠিক ঠিক হলে তখন প্রাণায়াম পাওয়া গেল। তখন থেকে ভোজনের নিয়ম একটু বদলালো। স্নান বন্ধ হোলো।

—কেন, স্নান বন্ধ কেন?

জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বামী বলিলেন, অবগাহন স্নানে প্রাণায়ামের কাজ হয়ে যায়। এরপর আমি তোমাদের বলবো, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে এমনই কতকগুলি কাজে প্রাণায়ামের ক্রিয়া আপনিই হয়ে যায়। এখন ভোজনের কথা শোনো। রুটি অর্দ্ধেক ভাত অর্দ্ধেক, ঐ ডাল ও তরকারী, আচার শেষে দই অল্প, পরিমাণও পূর্ববৎ। রাত্রের আহারও লঘু পথ্য, একটু মুগের ডাল ও কেবল বেশীর ভাগ দিনের মধ্যে কিছু ফলমূল খাওয়াটা বিশেষ ছিল, একাদশীর দিনে একবার মাত্র শুধুই ফল ও দুধ ;—এ নিয়ম তো ভোজনের বিষয় গেল। সকালে ও বৈকালে নদীর ধারে মাইল দু'মাইল চলার কাজ ছিল, দ্রুত নয়—তারও মাপ মাত্রা ঠিক ছিল, বনে গিয়ে কাট কুড়িয়ে আনা পালা করে, এইভাবে কতক পরিশ্রমের কাজও ছিল। সে যে কি সুখের জীবন বলবার কথা নয়। আমরা স্বর্গের সুখ অনুভব করতাম। চেহারায় এমনই লাবণ্য ফুটে ছিল, যে দেখতো তার মধ্যেই একটা স্নেহআকর্ষণ অনুভব করতো, এমন ছয়-সাত বৎসর। দেহ চলতো যেন ঘড়ির কল চলছে। শরীরের প্রত্যেক কাজটি শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে যত কিছু বায়ুঘটিত ব্যাপার সকল কিছুই আমূল অনুভূতির মধ্যেই থাকতো।

ফটিক জিজ্ঞাসা করিল, নিয়ম কতদিন ছিল ?

—প্রথমে ছিল নিয়ম, তারপর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল, তখন আর কি সে নিয়মকে বন্ধন বলে বোধ হয় ! শরীর তৈরী হয়ে গেলে তখন আর কোন বন্ধন নেই। এখনও আহার-বিষয়ে এমনই একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, যেটিতে ক্ষতি করবে না, সহজভাবে পুষ্টি বা হজমের ব্যাঘাত করবে না—তাইতেই রুচি ঠিক আছে, পরিমাণও ঠিকই আছে। মুখরোচক কিছু আস্বাদের প্রবৃত্তিই হয় না। তোমাদের যেমন নানাপ্রকার জিনিস মিলিয়ে রসনার তৃপ্তি কর, কিছু আস্বাদের জন্য একটা লালসা আছে—আমাদের সেটা লোপ করে দিতে হয়েছে।

তোমাদের মধ্যে এতটা রোগের প্রাদুর্ভাব কেন ? ঐ বিচারশূন্য রুক্ষ গুরুপাক রসনার তৃপ্তিকর প্রিয় বস্তু আহারের ফলেই নয় কি ? আরও একটা ধারণা আছে তোমাদের এই যে, দেহ যখন জন্মেচে তখন রোগটা হবেই। কিন্তু গোড়া থেকে সহজভাবে যদি ভোজনের নিয়ম থাকে,—আহার-বিহারের সংযম থাকে তাহলে রোগ হবেই বা কেন ? ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি-কাশি হবে, ঠাণ্ডা লাগবেই বা কেন ? ঠাণ্ডায় তো গরীব-দুঃখীদের ছেলেপুলেরাও থাকে, তাদের রোগটা খুব কম হয়, কারণ তাদের ভোগের দিকে লক্ষ্যও কম,—নয় কি ? পরিশ্রম, অনেক কাল স্বাস্থ্য অটুট রাখে যে। বাবুদের খাওয়া আছে শ্রম নেই, বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম, ফল রোগ শোক দুঃখ।

তারপর, এবার কি ;—বিহার ? যোগীদের বিহার আছে কিনা ? বল না,—আসল কথাটা কি ? যোগীরা কি স্ত্রী নিয়ে ঘরসংসার করে অথবা করতে পারে কি ?

আরে বাবা, এটা আত্মারামের সাধের রাজ্য, এখানে নেই কি ? সবই আছে, রাজ্যটি এত বড, ভোগ-উপভোগের তাই না এটা লীলাস্থান ! একটি কথা সব সময়েই মনে রেখো, যারাই এখানে জন্ম নিয়ে এসে পড়েচে, তাদের ইচ্ছামত পেট না ভরলে তৃপ্তিও নেই,—শান্তিও নেই। সেইটি পূর্ণ করতেই তার এখানে আগমন, তার সেটা যে চাইই চাই। সাধ, সাধ, সাধ,—সাধেরই মেলা। যার সেটা সাধ তার ঠিক সেটার জন্যই গতি, তাকে সেটা পেতেই হবে তবে শেষ। পথ দুটি আছে, ব্যভিচার না করে সংসারী যোগী, এ একরকম যোগী আমাদের দেশে আগেও ছিল, এখনও আছে, অপর যেটি ত্যাগের পথ, উর্দ্ধরেতা হয়ে যে পথে যেতে হয়, এ পথের সিদ্ধযোগী আগেও ছিল এখনও আছে। তবে দুটি পথেরই প্রথম অংশ একই অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা, দীক্ষা, বিধিব্যবস্থা, ক্রিয়াকর্ম্ম, সব যেন একই।

এমন দেখা গিয়েচে, একটি বালক মনোমত হোলো, কোনও সিদ্ধযোগী সমাজ থেকে একটি রত্ন কুড়িয়ে পেলেন। তিনি রত্ন চেনেন, লক্ষণে বুঝলেন যে এই জীবের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যোগসিদ্ধির অনুকূল প্রকৃতি। তাকে নিয়ে এলেন নিজ স্থানে। তার সংস্কার—উচ্চমার্গে গতিশীল বৃত্তির সাহায্যে ধীরে ধীরে তার মধ্যে আবর্জ্জনা যেটা ছিল সাফ করে নিয়ে তার শিক্ষায় মনোযোগী হলেন। অল্প বয়স থেকেই ঐ বিদ্যা দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, তাকে আগলে রেখে, ধীরে ধীরে এমন সংযমে তাকে শিক্ষিত এবং পটু করে তুললেন যাতে তার নরনারীর সম্বন্ধ-বোধ উগ্র না হতে পায়। যথাকালে, কৈশোরের শেষে, যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ক্রিয়া, সহজ যোগের কাজ, তার সঙ্গে সৎভাবের উদ্দীপক শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ, ক্রমে এই ভাবটি তার মধ্যে জাগাতে সাহায্য করলেন যে আত্মজ্ঞান ও স্বরূপ দর্শন ব্যতীত জীবন বৃথা। সাধারণ সংসারী মানুষ পশুর সমান, তাদের সদসৎ বৃত্তিটা আসলে জন্মায় নি তাই গতানুগতিক আহার নিদ্রা ও মৈথুনেই ভুলে আছে। যার সুকৃতি আছে সেই না কুমার ব্রহ্মচারী, উর্দ্ধরেতা হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সফল করতে পারে ! ঐ সুকৃতি যার আছে, সেই আধারই উন্নত আধার, যার মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় আত্মা স্বরূপে স্থিত হবেন। তার মধ্যে এই ভাবটি সংস্কারের মতই দৃঢ় করে দিতে গুরুকে পিছনে লেগে থাকতে হয়। বারো বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ করে আরো বারো বৎসর সাধনের কাল, তার মধ্যে সাধনের শেষ ছয় বৎসর গুরুকে বড় বেশী আগলাতে হয়। আঠারো থেকে বিশ বৎসর হলে তবেই তার যোগমার্গে গতি অর্থাৎ উর্দ্ধরেতা হতে গেলে যে সকল ক্রিয়া অভ্যাস করতে হয় ঐ কাল থেকেই তার আরম্ভ। তার সব কথা খুঁটিনাটি বলবো না, তবে, আসলে প্রাণায়ামের সঙ্গে জপ যোগ, আর পিছনে গুরুর অধ্যাত্ম শক্তি, এই নিয়ে শিষ্যকে শেষ পর্য্যন্ত যেতে হয়। শেষ তিনটি বৎসরই বড় কঠিন সময়।

ইতিমধ্যে যৌবনোদ্গমে শিষ্যকে স্খলন থেকে বাঁচাতে গুরুকে অনেক কিছুই করতে হয়েচে, ভোজনেব বিশেষ নিয়ম এই সময়েই কার্য্যকরী হয়। মাসে দুদিন উপবাস, কোনদিন পর্য্যাপ্ত আহার না নেওয়া, তীক্ষ্ণ ক্ষুধারোধের আগে খাদ্য না নেওয়া, চরু প্রস্তুত হবে স্বহস্তে অথবা গুরু তৈরী কবে দেবেন আর কেউ নয়, একাহারের কালে ঐ চরুই তখন প্রধান আহার্য্য শেষ তিনটি বৎসর। হয় ঐ চরু আর না হয় ফলই আহার। দুধ-ঘি এইগুলি এমনই ভাবে পরিমিত করা থাকে এক উপবাসে তা জীর্ণ হয়ে, রক্তের তেজবৃদ্ধি না করে ওজ ধাতুতে পরিণত হয়ে যায়। সকল দিকে সাবধান হতে হয়। বড় হিসাবের ব্যাপার শেষদিকে, গুরু তো বটেই শিষ্যেরই ক্ষুরধার পথ দিয়ে যেতে হয়। কাঁচা শিষ্যের কর্ম্ম নয় ঐ সময় ঐ ভাবে চলা। যদি আধারে গলদ থাকে, হয়তো এমন হয়, দীর্ঘকাল পরে শিষ্যকে সক্ষম, নির্ভরযোগ্য এই বিশ্বাসে অল্পকালের জন্য গুরু স্থানান্তরে গিয়েচেন, ইতিমধ্যে প্রকৃতি বাদ সাধলেন, কোন নারী সাক্ষাৎ ঘটলো, যৌবনের আকর্ষণে অদ্ভুত উপায়ে ঐ ললনার সংস্পর্শে, বিচিত্র যোগাযোগে ক্ষণেক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় সর্ব্বনাশ ঘটে গেল। এই যোগাযোগের অঙ্কটা কিছু পরে হলে হয়তো ঐ সর্ব্বনাশ ঘটতেই পারতো না। কারণ সিদ্ধির আর বিলম্ব ছিল না, সিদ্ধির পর আর স্খলনের ভয় নেই। নেহাৎ ঐ সংস্কারের গোড়ায় কোন গলদ না থাকলে তীরের অত কাছে এসে নৌকাডুবি হয় না।

মনে থাকে তোমাদের, আমি ঊর্দ্ধরেতা কুমার ব্রহ্মচারীর কথাই এখনও বলেচি। ধর স্খলন হোলো না, যথাকালে যোগসিদ্ধির ফলে সত্যের আলো লাভ হোলো। একটি মহাপ্রাণ যখন সিদ্ধকাম হন, সত্য তত্ত্ব লাভের ফলে গুরুশক্তির অধিকারী হলে একটি সাধ, একটি কামনা প্রায়ই তার মধ্যে জেগে ওঠে। প্রকৃতির সৃষ্টির নিয়মেই এটা হয়। সেটি এই যে,—যে তত্ত্বদর্শন আমার হয়েচে, জগজ্জনের মধ্যে তা প্রকাশ হোক, যারা পিপাসু, এই পথে আসতে আগ্রহশীল, সংসারের গতানুগতিক কর্ম্ম ও জীবন যাদের তুচ্ছ বোধ হয়েচে তার, যে সাধনের পথে আমি এই সত্যের অধিকারী হয়েচি, তাদেরও এই পথের সন্ধান লাভ হোক। অন্ততঃ একটি আধারে, তাঁর ঐ অপার্থিব সম্পত্তি দান করতে প্রাণ ছটফট করে। যার ফলে, জগদম্বাও যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, কারণ আত্মারাম সির্দ্ধযোগীর সংকল্প, সিদ্ধ হতে বাধ্য। বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যেমন সৃষ্টিরক্ষার নিয়মেই সমাজে ক্রিয়াশীল, অধ্যাত্মরাজ্যেও ঐ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের কামনা একটা থাকেই। এ পর্য্যন্ত এমন কোন সিদ্ধ মহাত্মা, ধর্ম্ম জগতে মহামানব এমন কাকেও দেখা যায় নি যাঁর মধ্যে তাঁর অধ্যাত্ম সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের স্পৃহা না জেগেছে। প্রকৃতির অলক্ষ্যীয় নিয়মের মধ্যেই এটা মনে থাকে যেন। এখন বুঝে দেখো নিজ নিজ বুদ্ধিতে,—এমন যে সিদ্ধযোগী তাঁর আবার আহারবিহারের বিধিনিষেধ কি থাকবে বলো তো? স্ত্রী-সঙ্গে

ঘরকন্না করা ? যেমন ভাই ভগিনী মা পিসি মাসী নিয়ে সংসার করে তেমনি স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে তো বাধাই নেই। তবে এই তত্ত্বদ্রষ্টা আত্মারামের পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য অথবা জীবসৃষ্টির জন্য মৈথনের প্রবৃত্তি থাকতে পাবে কি তাঁর মধ্যে ? তখন তাঁরা যে সুখের অধিকারী হন, তোমাদের বুঝাবো কি করে, সে সুখের তুলনায় নারীসঙ্গ সুখের স্মৃতিমাত্র—বমনোদ্রেক হবার কথা।

এখন গৃহী, অর্থাৎ স্ত্রীগ্রহণ করে যোগী হওয়া যায় কিনা ? এইটাই তোমাদের বড জিজ্ঞাসা নয় কি ? ফটিক বলিল, সে আবার বলতে ! তবে এইমাত্র যা শুনলাম তারপরে আর যা কথা তার মীমাংসা তো আমরাও করে নিতে পারি।

যোগী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তাহলে আমি বাঁচলাম, আর আমায় বলতে হোলো না কিছু, ধন্যবাদ ফটিক।

এখন ফটিককে ধন্যবাদ দিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, সবাই না হোক অধিকাংশ ভদ্র এমন কি পণ্ডিত পর্য্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন,—তা হবে না, ওটাও আমরা শুনবো। পুরাণচাঁদবাবু বলিলেন, ঐটাই তো আমাদের মত লোকের আসল দরকার, ও ছাড়া হবে না। যোগীর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝবো, আবার নারী নিয়ে সংসারধর্ম্ম কিভাবে চলে,—আমরা শুনবো। কাজেই স্বামী আবার স্থির হইলেন। এর মধ্যে দেখিলাম একটি অপূর্ব্ব সংযমের ব্যাপার। কোন বিশেষ বিষয়ে কিছু বলিবার আগেই কিছুক্ষণ স্থির হইয়া যান, মনে হয় তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও যেন বন্ধ থাকে।

দেখো, প্রথম কথাটা এই যে, একজন যোগীর দৃষ্টিভঙ্গিতে জগতের মানুষ সমাজটা কি রকম দেখায় আগে সেই কথাই বলছি। যখন মানুষসমাজ বলি তখন সকল দেশময় মানুষসমাজের যে একটা স্তরভেদ আছে সেটাও স্বীকার করে নি, —অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বেশভূষা, আচার, পারিবারিক শৃঙ্খলাপূর্ণ সাধারণ জীবন ধারার সমাজের সবই বাইরে থেকে দেখতে একরকম হলেও সবাই কিন্তু রুচি কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিতে এক নয়,—এমন কি এক স্তরেরও নয়। এই সত্যটি আমরা স্বীকার করে সহজভাবেই মানুষসমাজের কথা বিচার করবো।

সব দেশে সকল সমাজেই মোটামুটি তিন স্তরের কথা ধরে নিলেই সমাজসৃষ্টির রহস্য অনেকটাই ধারণা হবে। যোগীর দৃষ্টিতে এই তিনটি স্তরের বিচার ও বিশ্লেষণের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির কথাও একটু আছে। দৃষ্টিভঙ্গিও তিন রকমের, যথা উপর থেকে নিচে দেখা—অনুলোম গতি ধরে, আবার নীচ থেকে উপর দিকে দেখা—বিলোম, শেষে মাঝখানের যারা তাদের সঙ্গে সমান স্তরে দাঁড়িয়ে দেখা, মোট এই তিন ভাবেই আমরা মানুষসমাজের প্রায় সকল কিছুই দেখে থাকি।

যখন নীচে থেকে দেখি তখন সমাজের এই নিম্নস্তরে যারা, আমাকে তাদেরই [illegible]

দেখতে পাই। দেখি কি? তাদের মোটা বুদ্ধি,—আহার নিদ্রা ও মৈথুনের আসক্তিই জীবনের পথে টেনে নিয়ে চলেছে,—যেন তাই-ই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তাদের বুদ্ধি প্রায়ই স্থূল, বিষয় ছাড়িয়ে ওঠে না। তাদেরও নীচের স্তরে জীব যে পশুসমাজ, সেই সমাজের সঙ্গে তুলনায় নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ যেহেতু তারা মানুষ; আর মানুষ যখন মনের সঙ্গে বুদ্ধির ক্রিয়া নিশ্চয়ই আছে, কাজেই বুদ্ধি ও শক্তি তাদের শরীরগত হলেও মোটামুটি কখনও কখনও অপেক্ষাকৃত উচ্চবুদ্ধির পরিচয়ও পাওয়া যায়,—শেষে এই সত্যটাই তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা তাদের নিকটতম উপর স্তরের প্রভাবে শুধু নয় তাদেরই সাহায্যে যেন জীবনের গতি পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ বুদ্ধি তাদের শরীরগত বলে শরীর থেকে উৎপন্ন সন্তানাদি ছাড়িয়ে বেশী দূর যায় না। অবস্থার চাপেই হোক, অপরিণত বুদ্ধির জন্যই হোক তাদের শরীর ও মন নিয়ে যে সকল স্বার্থবোধ, তারই পিছনে ঘুরে বেড়ায়,—তামসিক ভাবটাই তাদের যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে,—সেইজন্যই তাদের অপরিণত যোগী জীব বলতে পারা যায়। অবশ্যই তার সঙ্গে তাদের অগ্রগতিও আছে আর সেটা স্পষ্টই দেখা যায়,—সেই অগ্রগতি তাদের নিকটতম শ্রেষ্ঠ যারা অর্থাৎ ঐ মধ্যস্তরের পানে, এখন সেই কথাই বলছি। এদের মধ্যে,—

এই মাঝের স্তরে এলে দেখা যাবে, আহার, বাসস্থান, নিদ্রা, মৈথুনাসক্তি ঠিক নিম্নস্তরের মতই তবে তার মধ্যে একটু বিচার এবং সংস্কারের ছাপ আছে। তারপর তাদের মনের সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগটাই প্রবল, শক্তি তাদের শরীরের চেয়ে মনের সঙ্গেই বেশী কাজ করে। তার মানে এ নয় যে তাদের বুদ্ধিশক্তি কম। কিন্তু তারা মনের প্রবৃত্তি ও প্রভাবেই কাজ করতে অভ্যস্ত, তাইতেই শক্তিমান মনে করে নিজেদের। বুদ্ধির চেয়ে এই মনের প্রভাবেই তারা কর্ম্মের প্রেরণা পায়, চলে বেশী; মনপ্রধান বলে বুদ্ধিকেও মনোগত করে নেয়। অন্য কথায় বলতে হয় তাদের বুদ্ধিও যেন মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এটা বিশ্লেষণ করলে কি দেখা যায়? মন = ইচ্ছাশক্তি; সেটা আবার অন্ধ, তার দৃষ্টিই হল বুদ্ধি বা জ্ঞান,—এই অন্ধ মনই কেবল চেনে নিজের সুখ ও সম্ভোগ, এক কথায় স্বার্থ; এ জগতে অপর কেউ যে আছে সেটা সে দেখে না কারণ সে অন্ধ, জ্ঞান বা বুদ্ধি সর্ব্বদাই মনের সঙ্গে থেকে মনকে সেটা জানায়, কারণ সে তো সবই দেখতে পায়। এখন মধ্য-স্তরের মানবের মনশক্তিই প্রধান তাই সেই মনের অন্ধত্ব বুদ্ধিকেও খানিকটা অন্ধ করতে চায় অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিকে কতক চাপা দিয়ে মনের অনুগামী করে; ফলে দুঃখও পায়। বড় আঘাত না পেলে বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তবে তাদের মধ্যে যারা অগ্রগতিসম্পন্ন, কতকটা উন্নত হয়েছে তাদের, কখন কখন মনোধর্ম্মের প্রভাব কাটিয়ে খানিক বুদ্ধির অনুগামী হতে দেখা যায়। এদের দ্বারাই নীচের স্থূলবুদ্ধি মানুষসমাজ পরিচালিত হচ্ছে, বলা হয়েছে। এদের প্রভাবেই দেশময় কর্ম্মধারা চলে, রজস্তম গুণেরই খেলা সেই স্তরের

সর্ব্বত্র। সংখ্যায় এরা অনেক বেশী, মনে হয় নিম্নস্তরের চেয়েও বেশী। সর্ব্বত্রই রাজ্যশাসন, পরিচালনা, দেশস্থ সমাজরক্ষা,—নিজ দেশের স্বার্থের সঙ্গে পরদেশের স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যুদ্ধবিগ্রহ, নিম্নস্তরকে প্রভাবিত করে যুদ্ধে পাঠানো, এসকল মধ্যম স্তরের মানববুদ্ধির ফলেই ঘটে থাকে। দেশের ধন, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি যা কিছু এদের দ্বারাই ঘটছে। এদের স্বার্থবুদ্ধিতে নিজ দেহই প্রথম, তারপর তার আত্মীয় ও কুটুম্ব সমাজে শেষে স্বার্থপুষ্ট অনাত্মীয় বন্ধুবর্গের পানে প্রসারিত হয়। অপরিচয়ের সম্বন্ধ এরা মানে না কারণ আপন আর পর, শত্রু অথবা মিত্র এ ছাড়া অন্য সহজ সম্বন্ধ এদের মধ্যে স্থান পায় না। এদের কর্ম্মশক্তি এতটাই প্রবল যে উচ্চস্তরের মানুষদেরও এরা প্রভাবিত করে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিতে পারে এবং বহু ক্ষেত্রে তা করেও থাকে। তাদের প্রবল মনশক্তিই কার্য্যকরী। ধন ও ঐশ্বর্য্যই এই স্তরের আদর্শ,—মুখে ঈশ্বর স্বীকার করে, কিন্তু কখনও বিশ্বাস করে না। এইটাই এদের বৈশিষ্ট্য, কোন গুরুবিষয়ে এরা গভীর অনুসন্ধিৎসু হয় না; হতে পারে না,—হলে এদের বৈশিষ্ট্য থাকে না। ইন্দ্রিয়সুখ সম্পর্কে সৃষ্টি,—সমাজের এই দুই স্তরের মানুষের দ্বারাই প্রভূত পরিমাণে ঘটে।

এইবার সমাজে উচ্চস্তরের যারা, তাদের প্রধান কথা এই যে আহার নিদ্রা ও মৈথুন এই স্তরে ক্ষীণ, এমন কি তার মূল কারণ, তাদের মন অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রবল, তাদের বুদ্ধিই মনকে প্রভাবিত করে সেইজন্যই ত্যাগ, স্থূল ইন্দ্রিয়জ ভোগের দিকে লক্ষ্যহীন, সংযত চিত্তই বৈশিষ্ট্য এদের। জ্ঞানধর্ম্মই এদের মন অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মধ্যস্তরের মানুষ তার বিপরীত আগেই বলেছি। সেই জন্যই এরা মধ্যস্তরের জীবের আদর্শ হয়েই আছে। যথার্থ যোগী এরাই, এদের মধ্যেই সেই সমাজের সংস্কৃতি প্রাণ পায়। জ্ঞানশক্তি বিস্তারের সঙ্গে এই স্তরের মানুষই শিক্ষকে পরিণত, যৌগিক ক্রিয়াকর্ম্মের অধিকারী, জাতিকে ধ্যান-ধারণাতে শক্তিমান করে তোলে, প্রকৃতির গুহ্য রহস্যভেদের এরাই অধিকারী। গভীর অধ্যাসের ফলে এদের মন যে তত্ত্ব ধরে সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের ফলে সকল সমাজের শ্রদ্ধার অধিকারী হয়। আগেই বলেছি মূলে বুদ্ধিই তাদের মনকে প্রভাবিত করে। সেটা বিশ্লেষণ করলে কি বুঝা যায়? মন = অন্ধ ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধি = জ্ঞানদৃষ্টি তার দ্বারা প্রভাবিত, তাহলে তো এইটাই বুঝা গেল তাদের মন বা ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানদৃষ্টি প্রভাবপুতঃ হয়ে যায়, তাই তাদের ধীশক্তি উৎপন্ন কাজ, চিন্তা, কল্পনাশক্তির প্রসার সাধারণতঃ সমাজের সর্ব্বস্তরেই কল্যাণকর হয়ে থাকে। এই স্তরের জীবের মধ্যে কবি, শিল্পী, *সাহিত্যিক, সঙ্গীতবিদ্, সিদ্ধজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, জ্যোতিষী* যত কিছু জ্ঞান ও আনন্দরসময় বৃত্তি আছে এই শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত। জীবসৃষ্টি রহস্য প্রথমে এদের জ্ঞানেই প্রতিভাত হয়ে,—অপর সবার গোচর হয়।

যদিও সহজ দৃষ্টিতে মনে হয়, মাঝের স্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের মন সম্বন্ধ নেই কিন্তু

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মাঝের স্তরকে এরাই আকৃষ্ট করছে বেশী এবং উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবার পথও সহজ করে দিচ্ছে। নিম্ন ও মধ্যস্তরের আদর্শরূপেই এরা একটি জাতীয়জীবনের শক্তি হয়ে শুধু সেই সমাজ বলে নয় জগতের মানুষসমাজের স্মরণীয় হন।

এখন শেষের কথা এই যে, সর্ব্বনিম্ন থেকে সর্ব্বোচ্চ স্তবের মধ্যে এমনই একটি গতি-প্রবণতা আছে যাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ বোধ হয়, একজন আর একজনকে আকৃষ্ট করে এইটাই যোগধর্ম্মের কথা। সম্বন্ধটি যথার্থই আত্মিক, আর যোগ ব্যতীত কখনও তা ধারণা এবং ব্যবহার সম্ভব হয় না। তবে সর্ব্বনিম্ন স্তবে এটি অপরিণত, মধ্যস্তরের মধ্যে আংশিক পরিণত আর উচ্চস্তরে পূর্ণ পরিণত, আবার সেদিক থেকে দেখলে সকল সমাজেই এই তিন স্তরের মধ্যে একটি সহজ যোগেবই বাঁধন আছে। এই বাঁধনটাই সৃষ্টি সরস, তত্ত্বমুখী করে রেখেচে। সেইটেই যোগশক্তি। মানুষ এই যোগী জীবযোগের মহিমা তার পক্ষে সহজ বলেই বুঝতে চায় না, যোগবলেই তার জন্ম তারপব সেই শৈশব থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শুধু নিজকর্ম্মই সে কবচে তা নয়, অপর সকল স্তরের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা কবে সৃষ্টিকে সার্থক করচে। এই যোগধর্ম্ম প্রাণের সঙ্গেই শক্তিরূপে অন্তস্তলে প্রত্যেকের মধ্যেই পরিণতির দিকেই গতিশীল।

আমাদের এই দেশে শুধু নয় সর্ব্বদেশেই গণিতের প্রথম ধাপ হোলো যোগ, শেষ ধাপ পর্য্যন্ত এই যোগেও বিভক্তি সঙ্গেই সম্বন্ধ। নিম্ন স্তর থেকে সকল স্তরের সর্ব্বোত্তম অবস্থায় এই যোগশক্তিই ক্রিয়াশীল, মানুষ সৎভাবে যখন নিজেকে উন্নত করে তখনও সে যোগ, যখন অসৎ পন্থা অবলম্বনে তার অধোগতি হয় তাও সৎ যোগেরই অভাবে। মানুষ মানুষকে টানে এই যোগশক্তিতেই যার পরিপক্ব অবস্থার নাম প্রেম।

এখন হে বন্ধুগণ! মানবরূপী জীবাত্মা এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের মধ্যে এসে, প্রথম আহারনিদ্রা ও মৈথুনে আসক্ত মানুষ থেকে ক্রমোন্নতির পথে যোগীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার পাওয়া গেল, কেমন? সেই অধিকার কি? আত্ম-সংস্বস্থ হবার পূর্ব্বে **আমি রয়েচি** এই বোধই প্রথম অধিকার। কোন মহৎ লাভের ফলেই আমার অন্তরে আমি এই বোধ প্রথমে অস্পষ্ট তারপর স্পষ্ট উপলব্ধি করার শক্তির অধিকারী হয়ে, ঐ বোধরূপী **আমি**-কে অবলম্বন করে যাত্রা হোলো শুরু। কোন পথে? আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথে। প্রথমে জপের সঙ্গে প্রাণায়ামের সাহায্যে ধারণা, তারপর ধ্যানের অবস্থা পেয়ে আত্ম-উপলব্ধির পথে গতিশীল। অতঃপর অনন্যকর্ম্মা হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যখন কাটিয়ে চলেছি, তত্ত্বের মধ্যে সবার বড়ো তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উজ্জ্বল আশায়—তখন ঐ যোগীর গৃহস্থজীবন, অর্থাৎ নারীসঙ্গে সংসার সম্ভোগ করা অথবা করতে করতে সাধন চালানো যায় কিনা, এই প্রশ্ন কেমন?—এরই নাম ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও—ঐ কাজ করে, নয় কি? নিস্তব্ধ।

যখন রোগীর প্রাণায়ামের সম্বন্ধে এবং শেষ যোগ সম্বন্ধে কথা শেষ হয়ে গেল তখন বোধ হয় আমাদের প্রত্যেকের মনেই এক অপূর্ব্ব আনন্দ ভরে নিয়ে আমরা উঠবার ব্যবস্থা করচি। একটু চাঞ্চল্যও এসেছে, বিপক্ষের মত। এখানে যেসব কথা শুনলাম, আমাদের সার্থক হোলো আজকার এই সাধুসঙ্গ। কথাশেষে যোগী আবার দুটি পান মুখে পুরলেন। তাই দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম, আপনি যে এত পান খান তাতে কোন ক্ষতি হয় না ?

তিনি অবশ্য প্রসন্ন ভাবেই বলিলেন, কেউ পান করে, কেউ খায় পানটাকে, তার কি করা যায় বলো ? আমরা সবাই হেসে উঠলাম। ভাবলাম ঐ বলে উড়িয়ে দিলেন কথাটা। কিন্তু তিনি তা করিলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন, যোগী শ্রীনাথের আমরা দুটি প্রিয় শিষ্য ছিলাম। আমাদের দুজনকেই তিনি নিজ মনোমত ভাবেই ঠিক ঠিক যোগমার্গে গড়ে তুলেছিলেন বিশেষতঃ সাধনশেষে যখন আমরা তাঁর আশ্রম ছেড়ে আসি। আসবার পূর্ব্বে কিছুদিন কাছে রেখে অনেক গুহ্য প্রকাশ করেছিলেন। কত স্নেহ তাঁর ছিল আমার উপর,—এতটা আমার পিতার ছিল না আমার প্রতি। বিশেষতঃ তাঁর একটু বেশী মমতা ছিল, বোধ হয় এই কারণে, প্রথম অবস্থায় তাঁর আশ্রয়ে আসবার পূর্ব্বের কথা, একটা সাংঘাতিক ধাক্কা খেয়েছিলাম খানিক বিপথে গিয়ে,—সেটা তিনি জানতেন।

বিপদে যাওয়ার কথায় আমরা নিজ নিজ মনে অনেক রকমের বিপদ অনুমান করেচি বুঝে, তিনি আবার বলিতেছেন, অন্য বিপদের কথা নয়, একটু কৃচ্ছ্রসাধন করে ফেলেছিলাম যার ফলে শরীর বিগড়ে গিয়েছিল। তাই সেই সূত্রেই আমায় বলেছিলেন, এর ফলে শেষে তোমায় একটা কিছু নিতে হবে। অর্থাৎ স্থূল ভোগ্য কিছু, শরীর সম্পর্কে কোন রসের খোরাক। তাই এই পানটাই নিয়েছি, এই একটা নেশা, যার নাম বিলাস,—এটা শরীরের স্ফূর্ত্তির জন্য বলতে পারো।

আমাদের একজন, বোধ হয় অতুলদা, জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃচ্ছ্রসাধনকে বিপথ বললেন কেন ? তিনি বলিলেন, তোমার গন্তব্য কল্পনা করে, অথবা তাড়াতাড়ি ইষ্টলাভের আশায় বোকার মত একটা পথে তুমি চললে, তারপর অনেকটা গিয়ে দেখলে তোমার ইষ্টমন্দির এ পথে নয়, আবার অতটা ফিরে এসে তবে ঠিক পথ ধরতে হোলো যে পথে সহজে পৌঁছানো যায়। কাজেই প্রথম পথটাকে তুমি বিপথ বলবে না তো কি বলবে ?

অতুল সেন বলিলেন, আমরা তো কৃচ্ছ্রসাধনকে গৌরব দিয়ে থাকি, উচ্চস্তরের সাধন মনে করি। তা করবে না কেন, ভোগের দিকে পড়ে আছে যারা, সুখের কাঙ্গাল, ইন্দ্রিয়জ ভোগতৃপ্তির কঠোর সাধনার পিছনে ছোটাই যাদের কাজ, কোন রকমের সুখ স্বচ্ছন্দ ত্যাগ তো বড় কথা, সুখের আশাটকু ত্যাগ যাদের পক্ষে অসম্ভব তাদের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধনের বিষয় তো মহা গৌরবের মনে হতেই পারে। যদি কৃচ্ছ্রসাধনের ঐ পথে কিছু থাকতো তাহলে, আমাদের কথা ছেড়ে দিচ্চি, স্বয়ং বুদ্ধ কেন ওটাকে ভুল পথ বললেন,—

তাঁর তুল্য কৃচ্ছ্রসাধন আর কেউ তো করে নি ! শুধু করা নয় তিনি যে দৃঢ়তা যোগমার্গে তাঁর প্রত্যেক সাধনটিতে দেখিয়েছেন পূর্ব্বাপর যোগীদের তুলনায় তা অনেক বড়ো, আমাদের তা আদর্শ হয়ে আছে। তার চেয়ে বড় দান আর কারো নেই বলেই মনে করি।

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের কথা জানো তো ? একে রাজার একমাত্র পুত্র, ভোগেবিলাসে পুষ্ট দেহ, এখন সেই ভোগবিলাসের প্রতিক্রিয়ায় বৈরাগ্যের প্রাবল্যও ততটাই। তখন গতানুগতিকতার উপর কি ভয়ানক বিরক্তি ! কারো কাছে কিছু শিখতে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নেই। ঐ সব গুরুর কাছে কি শিখবো আবার ? কথাটি ভেবে দেখো কত সত্য। এখনকার দিনেও যা তখনকার দিনেও তাই। সত্যতত্ত্বপিপাসু কি প্রবল বৈরাগ্য নিয়ে বেরিয়ে এলেন, সিদ্ধগুরু যার কাছে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদ হবে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হবে এমন লোক কোথায় ? কাজেই নিজ বুদ্ধিতেই যা ভাল মনে করলেন তাইতেই লেগে গেলেন। অবতার কল্পপুরুষের মনের বল এমনই থাকে। ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখালেন, শরীর নিয়েই পড়লেন প্রথমেই। ক্রমে সেই ভোগে পুষ্ট শরীরের আর কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না, শরীরটাকে শুকিয়ে ফেললেন, এমন করে আনলেন শুধু কঙ্কালের উপর শুকনো পাতলা একখানি ত্বক্ ছাড়া আর কিছুই রইলো না,—শরীরটাও ত্যাগ করবার যোগাড়। এই শরীরের বর্ণনা আছে। এটা তো ঐতিহাসিক সত্য, ভাস্কর্য্য শিল্পে, পাথরের উপর খোদা এখনও তার অস্তিত্ব আছে মিউজিয়ামে দেখো নি ? আমি লাহোরে দেখেছি যে। মাথার জটপাকানো চুল, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু আর কঙ্কালসার শরীর, পেটের অন্ত্রগুলি শুকিয়ে মেরুদণ্ডে ঠেকেছে, বিষ্ণুপঞ্জর এক-একখানা গোনা যায়, আসনে বসে আছেন, কি ভয়ানক মূর্ত্তি। এমন কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগের ইতিহাস জগতে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। যোগীমনের কি দৃঢ়তা !

তখন কি হোলো ? সেই অবস্থায় যখন বুঝলেন ভুলপথে এসে এখন জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হতে চলেছে। দেহটি তো নাশ করা হবে না, দেহকে রাখতেই হবে, সর্ব্বকর্ম্মের মূল আধার হল এই দেহই, যেহেতু দেহ অবলম্বন করেই তো সিদ্ধি সত্যলাভ যাকিছু। তিনি তো সত্যলাভের উপযুক্ত ইতিমধ্যেই হয়েছিলেন, সত্যসংকল্পী তিনি, কেবল উপলব্ধি-টুকুই বাকী ছিল। কাজেই শরীর ও ইন্দ্রিয় সতেজ করে সত্য উপলব্ধির উপযুক্ত করে নিতে হবে, যখনই সংকল্পে দাঁড়ালো, সেই ক্ষীণ শরীর নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে, নিজ আসন থেকে সামনেই নদী নীরঞ্জনার জলে পড়লেন, দীর্ঘকাল স্নানে যখন শরীর স্নিগ্ধ হল, ধীরে ধীরে নিজ আসনে এসে বসলেন এবং ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানভঙ্গেই দেখলেন মহা পুণ্যবতী সুজাতা পায়সান্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে। জীবন সার্থক হোলো সুজাতার। সত্যসংকল্প হলে এমনই হয়। সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করলেন—আর তাকে যে গৌরব দিলেন তা চিরদিন ধর্ম্মজগতে অক্ষয় হয়ে রইলো ;—সুজাতার অন্নেই আমি সত্যলাভ করেছিলাম, একথা তিনি

নিজমুখেই বহুবার বহুক্ষেত্রেই বলেছিলেন।

মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ বলে তিনি অতঃপর সকল ধর্ম্মার্থীকে দৃঢ়ভাবেই উপদেশ করলেন। এবার পণ্ডিত বলিলেন, এই কৃচ্ছ্রসাধনের কথায় মনে হয়, আপনিও তো বললেন, বিশেষ প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীর সম্পর্কেই যেমন একটা তুচ্ছ ভোগ নেশা বা বিলাস রেখে দেওয়ার অভ্যাস, আপনার যেমন পান খাওয়া, পরমহংসদেবেরও শুনেছি পান-তামাক ছিল, তিনিও ওটা রেখেছিলেন, তেমন বুদ্ধদেবের কোন বিলাস ছিল কি,—আপনার কি মনে হয়?

তিনি বলিলেন, এ কথা তো কোথাও লেখা নেই। তবে থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। তখন তামাকের ব্যবহার তো ছিল না তবে পানের ব্যবহার ছিল। আর তুচ্ছ ভেবে হয়তো কেউ কিছু ও সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেনি। যেমন পরমহংসদেবের জীবনী লেখক তাঁর জীবনকথায়, তিনি পান খেতে অভ্যস্ত ছিলেন কিনা এসব না লিখতেও পারেন। আমি পান খাই, আমার সতীর্থ যে ছিল সে মদ খায়। মদের উপর সভ্য সমাজের যেমন একটা ঘৃণা আছে, তাই শুনতে খারাপ ওটার অপব্যবহারের অনেক দোষ আছে,—শরীর ধ্বংসকারী জিনিস আছে ওর মধ্যে। কিন্তু তখনকার দিনে পরিমিত ব্যবহারের কথা অনেক যোগীর জীবনেও দেখা যায়। নিত্যানন্দেরও ঐ বিলাসটি ছিল—কিন্তু তাকে কেউ কখনও অপব্যবহার করতে দেখেনি। স্ফূর্ত্তির জন্য একটা কিছু ঐ ভাবের নেশা তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল। এতে দোষ হয় না। এসবগুলি তোমরা যথাযথ নিতে না পারো, আলোচনা না করাই ভালো। একটা জিনিসের দোষগুণ তোমাদের সংস্কার মতই বিচার করবে তো। ওদিকে একটু উদারমনা হওয়া ভালো। এটা ভালমতেই জেনো, মানুষের মধ্যে শুদ্ধচিত্ত যারা মাদক-দ্রব্যগুণ বা অপগুণ তাদের কখনও অসৎ ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। এমন, কি সিদ্ধযোগার শরীরে বিষের কাজ হয় না।

আচ্ছা ফটিক, কি পেলে বল তো আজ কলকাতা থেকে এসে?

আত্মদর্শনই সার কথা, তার পর তাতে সিদ্ধ হয়ে যা করবে সেই আত্মশক্তির স্ফুরণের পর, সকল কাজই যথার্থ সর্ব্বলোকহিতায়, সৎকর্ম্ম হবে, তাতেই জগতের কল্যাণ হবে। সবার আগে চাই নিজের কল্যাণ।

তার পথ? প্রাণকে ধরে আত্মস্থ হওয়া?

কেমন করেই বা তা সুসম্ভব করে তুলবে?

সহজ যোগের সাহায্যে;—তা পঞ্চকোষস্থ আত্মাকে একটার পর একটা কোষ ছাড়িয়েও ধরা যাবে অথবা ষঠচক্রের ছাঁচে মূলাধার থেকে প্রাণকেন্দ্র প্রজ্ঞাচক্র অর্থাৎ মূর্দ্ধায় স্থিত হয়েও আত্মাকে ধরা যাবে। মোট কথা এই যোগের পথই সহজ পথ। এর ভিতর কল্পনার হাত থেকে বাঁচতে হবে। এর সবটাই প্র্যাকটিক্যাল। কোন সময়ে এটা ভুল না হয়।

১১

প্রয়াগে সাধু-সঙ্গমে

ওখান থেকে সে-রাত্রে এলাম এই একটা প্রবলচিন্তা নিয়ে যে, কেমন করে এই মহাত্মার সঙ্গে গভীর ভাবে মিলতে পারবো, কেমন করে তাঁর বর্ণিত যোগতত্ত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করতে পাববো। উনি কি আমায় স্থান দিবেন ? ঐ ভাবেরই সিদ্ধযোগী, আপ্তপুরুষের কাছেই না যোগসাধনের ক্রম এবং সিদ্ধির পথ পাওয়া যাবে ? এতাবৎকাল যোগী মুক্তিনাথ বাবার কাছ থেকে যে পথ পেয়েছি, যে ক্রমে আনন্দেই সাধন চালিয়ে যা করে এসেছি বুঝলাম ঠিক পথে ঠিক কাজেব ফল তো পেয়েছি, তার পরের অবস্থাটা যেন লাফিয়ে পার হব বলেই একটা অস্থিরতা এসেছে আর একজন সিদ্ধযোগীকে পেয়ে। এতদিন যা পাওয়া গিয়াছে সে সব যেন ফেলিয়া এক অপর নতুন গুরুর কাছে নতুন পথের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। নিজের মধ্যে এই ব্যাপারটা তখন ভাল বুঝিতেই পাবি নাই। তখনই বুঝিতে পারিলাম যখন পরদিন জজসায়েবের বাড়িতে সকালে গিয়ে তাঁহাকে ধরিলাম। তিনি বড়ই স্নেহ ও প্রীতিময় সম্ভাষণে আমায় গ্রহণ করিলেন। প্রসন্ন মূর্ত্তি, বোধ হয় কালকের আসরে আমায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেটা মনে আছে। যেন পরিচিতের মতই আমাকে কাছে বসাইলেন , আরও আশ্চয্য করিয়া দিলেন এই কথাটি বলিয়া,—কি বাবা, এবার চ্যালা হবার সাধ নিয়ে এসেচো, চমৎকার তো,—পড়ে বইলো পুবানো গুরুমশাইয়ের পাঠ যা কিছু। সেখানে আর একটি যুবা, বোধ হয় ১৮।২০ বৎসর বয়স হইবে, তাঁর কাছেই বসিয়া ছিল দেখিলাম।. তার সামনে আমি তো মহা অপ্রতিভ !

ধীবে ধীরে প্রণাম করিয়া সেখানে বসিতেই তিনি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন আমার মুখের দিকে, তার পর বলিলেন, কাছে সরে এসো। আরও কাছে আসিয়াই বসিলাম। তিনি এবার সোজা কথায় বলিয়া দিলেন আমার চিত্তের মধ্যে যে ভাবটি তোলপাড় করিতেছিল। আসল কথাটা হইল, যখন গুরু লাভ হইয়াছে, পথ পাওয়া গিয়েছে, সে পথে চলতেও শুরু করেছি, কোন সংশয় ওঠেনি, দিব্য স্ফূর্ত্তিতে সকল সময়ে আপনাতে আপনি সদা জাগ্রত ভাবেই রয়েছি, তবুও নূতন খাবার দেখে ছেলেদের যেমন হয়, খিদে থাকে বা না-থাকে নোলাটা যেমন শকশকিয়ে ওঠে, তেমনি একজন নূতন মানুষকে দেখে অমনি তোমার মধ্যেও ছটফটানি আরম্ভ হয়ে গেল—কেমন করে এর কাছ থেকে কিছু আদায় করবো !

আমি চুপচাপ., স্তম্ভিত। দেখিয়া আবার বলিতেছেন, দেখো ! চুনারে আমার এক বান্ধব আছেন, সেদিন আমরা একত্রই ছিলাম, বোধ হয় গত একাদশীর দিন, গঙ্গা-ধারেই

তার কুটিরে। ঐখানকার এক বাঙ্গালীবাবুর ছেলে এসে তাঁকে খুব সেবা লাগিয়েছিল দেখলাম। একাদশীর দিন একাহারের কথা শুনে থাকবে, তাই বাড়ি থেকে ফলমূল, দুধ, মিষ্টান্ন এসব নিয়ে এসে—বেশ ভক্তিভাবেই নিবেদন করে তাঁর পায়ের কাছে বসল, তার পর ধীরে ধীরে নিজের কথাটা প্রকাশ করলে, বাবা—আমায় দীক্ষা দিন। শুনেই তিনি হাসতে হাসতে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আরে বাচ্চা ঠার্ যা, ঠার্ যা। তার পর বেশ মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিলেন, তার এখনকার তপস্যা বিদ্যালাভ আর ব্রহ্মচার্য্যপালন,—এ ছেড়ে অন্য ভাবের দীক্ষায় এখন উপকার তো হবেই না বরং অপকার হবে; পড়াশুনার ক্ষতি হবে, নিজের ভাবে নিজের তালে চলেছে সে, তালভঙ্গ হবে। এই সবই বুঝিলাম, আমাকেই ঐ শিক্ষাটা দেওয়া হইল, আবার মনে হইল—হয়তো ঐ যে ছেলেটি তাঁর কাছে রয়েছে, তার প্রত্যেকটি কথাই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছে, তাকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে, এর কোনটি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না,—তবে আমার পক্ষেই ধরিয়া লইলাম। বোধ হইল সেও যেন তার পক্ষেই ধরিয়া লইল। কারণ এর পরেই দেখিলাম তার মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। যাই হোক এখন অবস্থা বুঝিয়া কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেও আমার বিলম্ব হইল না। সাময়িক এই দুর্ব্বলতায় আমি যে একটু লজ্জা পাইয়াছি এটাও তিনি বুঝিলেন।

এখন আমায় সযত্নে কাছে বসাইয়া অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অথচ বেশ ধীরে ধীরে চমৎকার বুঝাইয়া দিলেন, যোগীর নিজ সাধনধারা বজায় রাখা সবার বড় কথা,—আত্মসম্মানেরও উপরে। আমার যে উদ্দেশ্যে আসা সেটা বিক্ষেপ, এতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। নিজ সাধনায় স্থির থাকবার জন্য একস্থানেই বেশ কিছুদিন থাকা দরকার, বেশী ঘোরাঘুরিতে বিক্ষেপ আসবেই। সময় হলে তখন বুঝা যাবে যে এইবার একটু নড়া দরকার। সিদ্ধযোগী, পাকা গুরু তিনি, উত্তম চিকিৎসক,—তিনি শেষে বলিলেন, তোমার সবই ঠিক আছে, কেবল এখন ঘোরাঘুরি না করে এক জায়গায় আসন করে বসে যাও। সাধুসঙ্গ কোরো তাতে ভালই হবে, তবে তাতে জড়িয়ে যেও না যেন।

কথাটা এমনই মনে লাগিয়া গেল যে আর কিছু জানিবার এমন কি এখানে থাকিবারও দরকার মনে হইল না। তখনই স্থির মনে সংকল্পই করিলাম। এখন হইতেই কোথায় আসন পাতিতে পারিব চিত্ত আমার সেই অনুসন্ধানেই রহিল। আবার এখন নৈনিতালের সেই গুহাটির কথাই মনে হইল। নিশ্চয়ই সেখানে আর আমার স্থান নেই, বোধ হয় সেখানে সেই সিদ্ধবাবাই আছেন অথবা আর কেহ গিয়া আসন করিয়াছে। এখানে কোথাও যদি স্থান পাওয়া যায়!

আমি তো আসনে স্থির, একস্থানে থাকিতেই সংকল্প করিলাম কিন্তু আমার বিধাতার বিধান হইল অন্য রকম। সংকল্প তো করিয়াই ছিলাম এলাহাবাদ হইতে কাটিয়া পড়িব,

এমন স্থানে যাইব যেখানে আমি দীর্ঘকাল বাসের স্থান পাইব, কোন আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কও থাকিবে না, এই রকম কত কি।

পরদিন কিন্তু একটা স্নানের ব্যাপার ছিল। মাসিমা বলিলেন, আমায় রাজবাসুকীর ঘাটে স্নানে নিয়ে যাবি? আমি বলিলাম, মেসোমশাইকে বলো না, তিনি তো সহজেই নিয়ে যেতে পারবেন।

তিনি তো কাল কাশীতে গিয়েছেন তোর বড় মাসিকে আনতে, তিনি থাকলে তোকেই বা বলতে যাবো কেন?—এমন অবস্থায় যাইতেই হইল। এক্কা আসিল, মাসিমা উঠিলেন আর তার মধ্যে চাল, ডাল, আটা, ঘি, তরকারী ভরা এক ঝুড়িও উঠিল, ঝোড়াটা কাং নয়, বড। তাকে মাঝে রেখে তিনি ধরিয়া বসিলেন নিজ হাতে। সে যত্ন একটা দেখিবার জিনিস। আমি চালকের পাশে বসিয়া যাত্রা করিলাম।

সোজা রাস্তা, ক্যানটনমেণ্ট্ এরিয়ার মধ্য দিয়া বেশ পাকা রাস্তা বরাবর গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সারা পথ আসিয়া পথের শেষ বরাবর ডান দিকে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, তার পাশেই একটা ছোট কাঠের জাফরী দেওয়া কপাটওয়ালা ফটক। মাসিমা বলিলেন, এখানেই দাঁড়াতে বল। এক্কা দাঁড়াইলে তিনি নামিলেন এবং সেই ফটকের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, আয় আমার সঙ্গে। বাধ্য হইলাম তাঁর পিছনে যাইতে। ছোট একটি বাগান, তার মাঝে ফুলের গাছে নানা জাতির গন্ধপুষ্প, বেলগাছ, আমগাছ, পেয়ারা গাছ চার দিকেই, মাঝবরাবর একটি বাঁধানো চৌতারা, তার ধারেই একখানি প্রশস্ত বারান্দাওয়ালা বেশ মাঝারি ঘর। বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে গৈরিক পরিহিত একটি শান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়বয়স্ক বৈরাগী ধরনের মূর্ত্তি বসিয়া বসিয়া গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিলেন।

মাসিমাকে দেখিয়া তিনি উঠিলেন এই যে সারদা, গঙ্গাস্নানে এসেছ বুঝি! মাসিমাকে নাম ধরিয়া ডাকা, এ তো বড় সহজ ব্যাপার নয়! মাসিমা একগাল হাসিয়া প্রণাম করিলেন গলায় আঁচল দিয়া, তারপর বলিলেন, বাচুয়াকে বলুন, এক্কা থেকে ঝোড়াটা নামিয়ে আনুক। ঝোড়া নামানো হইলেই,—আমার পরিচয়ও দিলেন, এটি আমার বোনপো, কলকাতায় এদের বাড়ী, এখন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে,—ইত্যাদি। প্রণাম করিলাম। তারপর মাসিমা বলিলেন, এখন চান করে আসি তারপর বসবো। চ' যাই; —বলিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন।

এই সাধুটিকে দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। বেলুড় মঠে রাখাল মহারাজকে তামাক খাইতে দেখিয়াছি গুড়গুড়িতে, সেজন্য কিছু নয়; কিন্তু এঁর মুখে একটি চমৎকার সুগম্ভীর শান্তভাব, যা দেখিয়া একটি আকর্ষণ অনুভব করিলাম। মনে হইল যেন ইনি সব সময়েই একটি অন্তঃশীলা ধ্যানের অবস্থায় আছেন। আমরা স্নানের পর ঐখানেই খাওয়াদাওয়া করিয়া তারপর প্রায় সারাদিনই ছিলাম, তার মধ্যে একবারও তাঁর বিক্ষেপ দেখি নাই।

সদ্য ব্রহ্মচেতন সিদ্ধযোগীর স্পর্শ পাইয়া আসিয়াছি; যেন অন্তর্দৃষ্টি খোলাই ছিল। বিকালে মাসিমাকে বাসায় পৌঁছাইয়া আমি অতি তাড়াতাড়ি আবার গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, এখন দেখচি তুমি আমায় সহজে ছাড়বে না, কিন্তু আমায় ধরে টানাটানি করলে হবে কি, আবও ঘোরো, এখনও তোমার সময় হয়নি, তোমার মুখের দিকেই দেখে বুঝলাম তোমার আসন নিতে দেরি আছে। তোমায় এখনও বেশ ঘুরতে হবে যে। তবে ঘুরতে ঘুবতেও কাজ, হবে তোমার। বয়সটা কাঁচা তাই ঘোরাঘুরি। আরও বছর তিনেক করো ঐ কাজ, তাবপর আসন করবে। দেখো না আমি এখানে আসন করেচি, আর কোথাও ন গচ্ছামি। যার দরকার হবে এসো এখানে। তিনিই পাঠান, আত্মার ইচ্ছায় আসে, অন্ন জোটান, আমাব কিছু বলতে হয় না মুখ ফুটে। সব আপনাআপনি আসচে তাঁর ইচ্ছায়। কেবল এইটুকু সাবধান থাকি যাতে বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। টাকা ভয়ানক চিজ বাবা, কখনও কারো কাছে টাকা চেয়ো না। দর-হত রায় চামারিয়া এসেছিল, বলে, দুই-চার হাজার ফরমাস করুন। আমি বললাম, দুটো বেগুন আর একটু সৈন্ধব নুন, আর একমুষ্টি চাল,—ব্যাস, উরকুছ নহি।

আমার দরকারের বেশী নিলেই মরে যাবো,—সর্ব্বনাশ হবে। একবেলা খেলাম, রাত্রে একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম—শিব শিব বলে উঠলাম।



আর একজনের কথা আছে, সিদ্ধবাবার কথা, সেটি হইলেই প্রয়াগের সম্বন্ধ প্রায় শেষ হইয়া যাইবে।

যাঁরা এলাহাবাদ বা প্রয়াগ গিয়াছেন, অবশ্য একটু তীর্থমনা হইয়াই গিয়াছেন, তাঁরা অনেকেই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দেখিয়াছেন। জায়গাটা কর্ণেলগঞ্জ পাড়ার মধ্যে। প্রাঙ্গণের ধারেই একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে আর তার সঙ্গে ধ্বজাসম্বলিত মন্দির-সংলগ্ন একটি কুটিরের আকৃতি আছে, তারপর মন্দির একটি। তারই পাশে অবশ্য পাকা বাড়িঘর আছে। বাহির হইতে তাকে তীর্থস্থান বলিয়াই মনে হয় না। গঙ্গার দিকে যাইতে রাস্তার ডান দিকেই পড়ে। আমি তখন এইখানেই থাকি। আমাদের বাসা হইতে দুই মিনিটের পথ

ঐ ভরদ্বাজ, ওখানে শুধু ভরদ্বাজই বলে। আশ্রমে দুই-একজন ভস্মঅঙ্গ, জটাজুট, চিমটা গাড়া, ধুনী সামনে বা পাশে জ্বলিতেছে সাধু নিত্যই থাকে দেখিয়াছি। তাদের কাছে যাবার প্রবৃত্তি আমার কোন দিনই ছিল না, তাই তাদের কাছে যাই নাই কিন্তু তবুও ঐ স্থানে আমি যাইতাম আর এক উদ্দেশ্যে। শুনিয়াছিলাম কখনও কখনও এমন একজন আসেন, যাকে সবাই সিদ্ধবাবা বলে। একবার মাত্র তাঁকে দেখিয়াছিলাম। আমার কোন আত্মীয়, যিনি ঐখানেই থাকেন এবং যাঁর আশ্রয়ে আমি অনেকবারই গিয়াছি —একদিন বৈকালে তিনিই দেখাইয়াছিলেন, ঐ সিদ্ধবাবা, ভরদ্বাজে যাচ্ছেন। তখনই আমার এতটা ঐ সাধুদর্শনের আগ্রহ ছিল না। তবুও যাইতেছিলাম তাঁকে ধরিতে। তিনি বারণ করিলেন, এখন নয়, উনি এখন ঐখানেই থাকবেন, পরে যেও। তাই আমি তখনই গেলাম না। কারণ শুনিলাম অনেক লোক বসিয়া অপেক্ষায় আছে, তাই এখন গেলে কাছে পৌঁছাতেই পারিব না, তাই খানিক পরেই যাইব ঠিক করিলাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে গিয়া শুনিলাম তিনি নাই, চলিয়া গিয়াছেন। তবে যে শুনিলাম থাকিবেন আজ এখানে? তাঁর মর্জি, তাঁর থাকার কথা কেউ কি বলতে পারে?

সেইদিন হইতে আমি সন্ধানেই আছি, যদি একদিন দর্শন পাই। কিন্তু আজ সাত দিন, তিনি যে একেবারেই ওখানে আসেন নাই তা নয়, দুবার আসিয়াছিলেন আর এমনই সময়ে আসিয়াছিলেন যখন আমি অনুপস্থিত, এইভাবে সাত-আট দিন পর এক বিকালে আমি তাহাকে পাইয়া গেলাম।

সেদিনও বেশ ভিড় ছিল, চৌতারায় বোধ হয় পনেরো-বিশজন; তার মধ্যে বৃদ্ধ বয়সের সাধুই বেশী, আর কয়েকজন প্রৌঢ় বয়সের গৃহস্থ শেঠ বা সাউকার শ্রেণীর, বাকী সাধারণ গরীব লোক বলিয়াই যাদের আমরা জানি। মজুর, ছুতোর, ফেরিওয়ালা শ্রেণীর লোক। সবাই তাঁহারই অপেক্ষায় ছিল বেশ বুঝা গেল যখনই তিনি আসিলেন. সবাই, বিশেষতঃ যারা গরীব, সাদাসিধা পোশাক, বেশীর ভাগই ময়লা কাপড় ময়লা পাগড়ি তারাই এমন ভাব করিল যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তাঁহার হাতে একটা বাঁকাচোরা লাঠি, তিনি আসিয়াই আবার তাদের মাঝেই বসিয়া পড়িলেন। আপন আসনে নয়,—সবার সঙ্গে এক আসনে। এত মৃদু কথা যে, যাহাকে বলিলেন সে ছাড়া আর কেহই শুনিতে পাইল না।

দেখিতে তাঁকে রোগা, অল্প দাড়ি, গোঁফ শুভ্র, পাগড়িতে ঢাকা মাথাটি ছোট্ট সাদা চুলে ভরা, সেটা দেখা গেল যখন বসিয়া পাগড়ি খুলিয়া ফেলিলেন। গায়ে জামা নাই, কেবল একটা মোটা চাদর জড়ানো, পায়ে নাগরা—ধুলায় ধূসরিত। ক্রমে দেখি, তিনি প্রথমে যেখানে বসিলেন সেখান হইতে, ডাইনে বাঁয়ে সকলের সঙ্গেই কথা কহিলেন, তারপর তারা উঠিয়া গেল। তারপর শেঠ-সাউকারদের সঙ্গে কথা হইল;—সেটা খুব শীঘ্রই শেষ হইল, এখন বাকী রহিল তারা সবাই সাধু-মূর্ত্তি, আমি সবার পিছনে। একে সন্ধ্যা,

তার উপরে ওখানে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা তো ছিল না, কাজেই আমাকে দেখবার সম্ভাবনা মোটেই ছিল না কিন্তু অদ্ভুত লাগিল সেই দৃষ্টি তাঁর,—সাধু-দল অতিক্রম করিয়া আমার দিকে পড়িল, আঙ্গুল দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, ইধার আও।

প্রণাম করিয়া বসিতে না বসিতেই প্রশ্ন, ক্যা মতলব? আমি খানিকটা সামলাইয়া শেষে বলিলাম, ঔর কুছ নহি, দরশনকো। শুনিয়াই বলিলেন, দরশন তো বৈঠ যা। সেখানে যাহারা ছিল তাহাদের দিকে ফিরিয়া এক অদ্ভুত ভাষায় কথা আরম্ভ কবিলেন, আমি তার এক বিন্দু বুঝিতে পাবিলাম না। হিন্দির মতই ঢংটা, কিন্তু হিন্দি শব্দ একটিও নয়, উর্দ্দুও নয়। আমার মনে হইল এটা তাঁদের এক সম্প্রদায়ের ভাষা, যোগী সাধক-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত। এক-একজন প্রশ্ন কবেন, ইনি তার উত্তর দেন। এইভাবে কতকক্ষণ কথাবার্ত্তার পবেই মন্দিরে সন্ধ্যাবতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কথা বন্ধ হইল, যে যেভাবে বসিয়া আছেন সেইভাবেই বসিয়া বহিলেন। বাবাও তাঁর ভাবেই ঠিক যেমন ছিলেন তেমনিই রহিলেন,—কেবল এইটুকু দেখিলাম, স্বস্তিক আসনে সোজা হইয়া রহিলেন,—অচল অটল স্থিব।

আমারও শবীর স্থিব হইয়া গেল,—ঠিক ঐখানকার সবার সঙ্গে যেন এক হইয়াই গেলাম। কোন চাঞ্চল্য নাই, শরীর স্থির, শ্বাস-প্রশ্বাসেব কাজ কিভাবে চলিতেছিল তা আমার লক্ষ্যই ছিল না। একেবাবেই যেন আপন আসনে আছি। পার্থক্যেব মধ্যে, যেখানে খানিক কসরতেব পর স্থির শবীর-মন, এখানে যেন যন্ত্রেব মতন হইয়া গেল,—আটঘাট বন্ধ। মনে মনে একটি অপূর্ব্ব ভাব লইয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন আরতি শেষ হইয়াছে।

তারপর অল্পক্ষণ পবেই আসিল প্রসাদ একটি থালায়, এলাচদানা কিসমিস বাদাম মিছরী। দুটি দুটি সবার হাতেই পৌছাইল। সবাই মুখে ফেলিয়া দিল, আমিও দিলাম। তারপর দেখিলাম একে একে উঠতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। যখন আর একজন মাত্র আছেন, এমন সময় আমিও উঠিতে যাইব, তখন তিনি হাত ধরিয়া বসাইলেন। বাকী লোকটা উঠিয়া গেলে তিনি বলিলেন, আব বোল্ তোহার ক্যা বাত্।

আমি সত্য সত্যই কিছু মনে তো করি নাই, কাজেই বলিলাম, কুছতো নহি মহারাজ!

কুছ নহি, তো আও মেরে সাথ। বলিয়াই উঠিলেন, লাঠি লইয়া।

ওখান হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিলেন। নেহেরুর উদ্যান ছাড়াইয়া বাঁকের মুখে আমার কাঁধে বাঁ হাতটি দিলেন, ডান হাতে লাঠি। আমি যেন স্বর্গের আনন্দ প্রাণে অনুভব করলাম। কোন কথা নয়, পা চলিতেছে চলার গতিতে, আমার শরীর আছে কি নাই সে বোধ রহিল না, এমনই একটি অবস্থা হইল যা বর্ণনা

করিতে চেষ্টা করিলেই ভুল হইবে। এইভাবে কতক্ষণ, চলবার কথা মনে ছিল না, যখন আমার জ্ঞান হইল আমরা চলিতেছি, তিনি আমার কাঁধ হইতে হাতটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, অব ঘর যা। একটা বিষম আঘাত পেলাম কথাটায়—তিনি কিছুই বলিলেন, না, তবে দাঁড়াইলেন পথের মাঝখানে। তখন আমাব মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল বাবা, ঔর দরশন!

তখন প্রায় লালকুটিব কাছাকাছি আসিয়াছি, ঐ যে দেখা যায় আবছা-আবছা,—সেই কুটির দিকে চাহিয়া একবার দেখিয়া যেমন ফিরেচি দেখিলাম তিনি হনহন করিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া গেলেন, আমাব সেদিকে যাইতে শক্তি ছিল না। এত দ্রুত গেলেন যেন দেখতে দেখতেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি বিষণ্ণ মনে ফিরি নাই,—আমার মধ্যে তাঁর পরশ সম্পূর্ণভাবেই আমাব অনুভূতিকে অব্যাহত রাখিয়াছিল অনেকক্ষণ। সে-রাত্রে আব কারো সাথে কথা বলিতে পাবি নাই। মনে হইল ঐ সঙ্গমের দিকেই তাহাকে পাওয়া যাইবে।



পরদিন ঠিক করিলাম, যতদিন মনেব মধ্যে আমাব গন্তব্য স্থির না করিতে পারি ততদিন গঙ্গাধাবে সঙ্গমের কাছেই থাকিব। মনের ভাবটা এই যে, ঐ পুণ্যক্ষেত্রে কিছুকাল কাটাইতে পারিলেই তখন ঠিক একটা সঙ্কল্পে স্থিব হইতে পারিব। মনটা এমনই অস্থির হইয়াছিল,—কিছুতেই বুঝিতে দিল না যে এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য। কাল সাধুসঙ্গে অমন সিদ্ধবাবার স্পর্শ পাইয়াও যখন স্থির হইতে পারিলাম না, তখন বুঝিলাম অদৃষ্টে আমার কিছু দুর্ভোগ আছে।

সঙ্গমের স্নান-মাহাত্ম্য, আমার মত শাস্ত্রজ্ঞানহীন নবীন একজনের যদি না থাকে তা হইলে কি অপরাধ হইবে? ঐ সঙ্গমে স্নান করিতে গিয়া এই কথাই মনে মনে ভাবিতে-ছিলাম। সঙ্গমের মাহাত্ম্য কিছুই বুঝি না, বহু প্রাচীন কাল হইতেই বহু দূর-দূরান্তের হিন্দু সবাই এখানে স্নান করিতেই আসে, একটি পবিত্র সংস্কার লইয়াই আসে, আর স্নানান্তে পবিত্রও হয়। অবগাহন স্নানে আমাদের শরীর-মন পবিত্র হয়, এটা তো অস্বীকার করি না, কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু যে হয় সেটা ধারণা করিতেই পারি না। আমার কথাই হেথা বলিব;—সোজা এই কথাই বুঝিয়াছিলাম যে অতি প্রাচীনকালে যখন

আমাদের জীবনযাত্রা, অন্নবস্ত্রের সমাধান, যার নাম সংসার-ধর্ম্ম সহজ ছিল ; তখন গৃহত্যাগী সাধুরা, নানা তীর্থে ভ্রমণ ও স্নান করিয়া, নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া নানা প্রদেশের নানা সমাজের মানুষের পরিচয়ের সঙ্গে জীবন কাটাইতেন। তখনকার কালে মানুষ, আমাদের এখনকার মত একজনের ধারণায় হয়তো সরল ছিল। তাহাদের ধারণায় ঐ এক সংসার না হয় ঈশ্বর, এই দুই আশ্রয় ছাড়া অন্য কিছু করণীয় বিষয় ছিল না তাই তখনকার সংসারী লোকেরও ঐ তীর্থ ও স্থানমাহাত্ম্যে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ একটি কাল উপলক্ষে আসিয়া দর্শন, স্নান, তর্পণ, দান, পূজাদি সম্পন্ন করিয়া বরাবরই তীর্থ-সংস্কারটি বজায় রাখিয়াছেন। আমরাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছি মাত্র, তাই ভাবিযাছিলাম তাঁরা কি এব চেয়ে বেশী কিছু পাইয়াছিলেন ? মনে তো হয় না। তাঁরা যেভাবে সরল মনে ধর্ম্ম-সংস্কার লইয়া এই সব তীর্থদর্শনাদি করিয়াছেন, আমরা কি ঠিক সেই সরলতা লইয়া এসব করিতেছি, তা হয়তো নয়। কারণ এটা বুঝিতে পারি যে এখন আমাদের মন অত সরল নয়, জীবনে দ্বন্দ্ব আছে, নানা কৌতূহল আছে, বহু প্রশ্ন আছে,—বিশ্লেষণ, বিচার আছে,—অবশ্য সবার উপর একটা প্রবল স্বার্থবোধপূর্ণ মন আছে,—এ কাজে আমার লাভটা কি বা কতটুকু, এই তার সহজ হিসাব! তারপর শরীর সম্বন্ধেও এখনকার দিনে আমরা সবাই স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ-সবল শরীর বলিতেও পারি না। আমাদের পুষ্টি তাদের তুলনায় কমই মনে হয়, শরীর-মন সব দিকেই দিন দিন যেন কেমন একটা অসহায় ভাবই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া চলিয়াছে। সব মিলাইয়া আমাদের মনে সন্দেহই বেশী স্থান জুড়িয়া আছে। এই সকল ভাবিতেছিলাম স্নানে গিয়া,—কাছেই দু'তিনজন ব্রহ্মচারীর মত দেখিতে, তারা বেশ আনন্দেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তারাও বোধ হয় স্নান করিবে, তার আগে বসিয়া বসিয়া খানিক দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল দেখিলাম। সামনেই ঝুসীর কেল্লার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা কথা কহিতেছিল।

তার মধ্যে একজন,—কল্পনাথ, কল্পনাথ বলিয়াই ঐ কেল্লার দিকে দেখাইয়া যেন বিশেষ কিছু বলিতেছিল। প্রথমে নিজের কথাই মনের মধ্যে চলিতেছিল, তখন ইহাদের অতটা লক্ষ্য করি নাই, এখন এদের একজনের হাসিতে লক্ষ্য করলাম। বাঁধের উপরে যেখানে আমি বসিয়াছিলাম, তার কাছেই এরা বসিয়া বেশ আড্ডা জমাইয়াছে। তখনই এদের কথায় একটু কান দিলাম। ঐ যে একজনের কথা বলিয়াছি যার মুখে কল্পনাথ কথাটি বা নামটি শুনিলাম, তাকে দেখিয়া ভাল লাগিল,—তিনজনের মধ্যে তার মূর্ত্তি চিত্তাকর্ষক। তিনজনেই গৈরিকধারী, জটাধারীও বটে, অল্প গোঁফদাড়ি, এইটি বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু মনে হয় না যে একই আশ্রমের এরা। দেখতে দেখতে দুজনে উঠিল, আর বাঁধের উপর দিয়াই দারাগঞ্জের দিকে চলিয়া গেল ; কেবল ইনি এখনও বসিয়া রহিলেন দেখিলাম, বেশ চিন্তিত মন। আমার আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু হঠাৎ

কাছে যাইতে ইচ্ছা হইল না, মনে হইল একটু দেখি ;—একে সাধু-মূর্ত্তি, তার উপর অল্পবয়স্ক যুবা, শ্রীমান, পবিত্রতা মাখানো মুখ। মনে হয় যেন যোগী, কেবল লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরিয়া বোধ হয় ধরিয়া লইল আমিও তার মত কোন সম্প্রদায়ের সাধু। বোধ হয় তাই ভাবিয়াই সরল মধুর হাসিতে আমায় আকৃষ্ট করিয়া বলিল, সন্তজী! আপ কিধারসে আ রহা? বলিলাম, মৈ কলকত্তা সে আরহা হুঁ। সে বলিল, হামনে গুরুস্থান পুঁছরহা হুঁ। আমি বলিলাম, অব তক্ তো মেরা তিন গুরু হো চুকা, লেকেন, কিসিকো সম্প্রদায় কো পরিচয় অভিতক মুঝে মিলা নহি। শুনিয়া সে বলিল, ই বডি তাজ্জব কি বাত, মুঝে মালুম হোতা আপকা মার্গ ঠিক নহি। আমি বলিলাম, ইয়ে তো হাম বোল নহি সকতে, আপনা মারগ্ তো সবকোই কো ঠিকই রহতা, এইসা তো মুঝকো মালুম রাহা।

তখন সে নহি, নহি, হাম ঐসা নহি বোলতে, আপ কুছ নারাজ না হো। হামরা ইয়ে বোলনে কা মৎলব থা, সায়দ আপনে কুছ ভিন্ন ভিন্ন মারগমে চলনে মাংগতা হোগা। এইসে ভি হো সকতা, আপ কোই যোগীকো পাস যোগকো উপদেশ লিয়া ঔর কোই দুসরে তন্ত্র কি পাস ঔর উপদেশ ভি লিয়া হোগা, কোই বৈষ্ণব পন্থিকো পাস বৈষ্ণব সাধন কো উপদেশ লিয়া হোগা, মইনে ইয়ে সমঝ কে বোলা থা।

আপকো বাৎ ঠিক হৈ, আপনা সাধন কী বাৎ তো আপনা অন্দর রহযাতা, কোই কো বোলনেকী বাৎ নহি। শুনেই সে আর কথা বাড়াইল না, জিজ্ঞাসা করিল, আপ স্নান করোগে না? বলিলাম, জী হাঁ। তখন সেও স্নান করিবার জন্যই আসিয়াছে বলিল। তখন দুজনে কম্বল রাখিয়া স্নান সারিয়া, বাঁধের ওপর কাপড়টা শুকাইতে চলিলাম। সে বলিল, হামরা গুরুকা এক গুরুভাই, বহোৎ বড়া যোগী, ঝুসি মে আসন কিয়া, চলিয়ে না উঁহাই ভিচ্ছা হোগা। তখন দুজনেই চলিলাম, পুলপারে ঝুসির দিকে।

ঝুসির কেল্লার ভিতরে বেশ অনেকগুলি গুহা আছে। সেগুলি মাটির নীচে, চমৎকার ব্যবহার উপযোগী ঘরের আয়তন,—তবু একটু অন্ধকার। উপরে যে সব ঘর আছে তারই মধ্যে একটি দালানের শেষদিকে কয়েকটি ধাপ, আট-দশটি ধাপ নামিয়াই এই আঁধার রাজ্যের আরম্ভ। সামনেই একটা গলিপথ—তারই দুধারে গুহা বা ঘর। সবই মাটি কাটিয়া ইচ্ছামত প্রশস্ত করা হইয়াছে। আমরা দুজনেই চলিয়াছি, সে আগে পথ দেখাইয়া যাইতেছে, আমি পিছনেই আছি।

এমনই একটি মাটির গহ্বরের মধ্যে দীপ জ্বলিতেছে ; আর সেই আলোটুকুতে দেখা যাইতেছিল এক সাধুর মূর্ত্তি। তিনি একখানি মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া আছেন। আমার সঙ্গী বলিলেন, ইনিই বাবা কল্মনাথ। অশীতিপর বৃদ্ধই মনে করিয়াছিলাম প্রথমে, তাঁর নাম শুনিয়া, এখন দেখিলাম প্রৌঢ়-মূর্ত্তি। তবে তাঁর চক্ষে যোগীর যুক্তভাব বর্ত্তমান ;—

তার জ্যোতি দীপালোকেও স্পষ্ট। আমার সঙ্গী যে ভাবে তাঁর কথা আমায় বলিয়াছিল, দেখিয়া তার কিছুই ধারণা হইল না—তবুও প্রণাম করিলাম। বসিবার আগেই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদেব ভাবেই বলিলেন, যাও অব বাহাব দেখো, সব কুছ দেখ লেও তব পিছে আনা। আমিও তৎক্ষণাৎ উঠিলাম, আমার সঙ্গীও প্রণাম কবিয়া চলিল আমার সঙ্গে। পথে আসিতে আসিতে বলিল, আবে, বাবা তো বৈঠনেই বোলা নেহি, প্রসাদ ভি দিয়া নেহি, যাতে ভাগায় দিয়া।

আমিও মনে একটু আঘাত পাইয়াছিলাম, আবাব ভাবিতেছিলাম, আমাব শ্রদ্ধার অভাব তিনি কি বুঝিযাছিলেন? আগেই যদি শ্রদ্ধা না জন্মায়, সে কি আমার দোষ? হিন্দুস্থানী ভাষা-ভাষী সাধুও আমি কম দেখি নাই। কিন্তু যখন অপর স্থানে গেলাম, সেও একটি সাধু, তবে মনে হইল ভোগী, চমৎকার নাদুস-নুদুস শবীর, গৌববর্ণ চন্দনচর্চ্চিত দেহ।



যাওয়া মাত্রই তিনি একেবারেই বলিয়া বসিলেন, আইয়ে, বিরাজিয়ে,—আজ ইহাই ভিচ্ছা করনা। আমার সঙ্গীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে বেচারা তার গুরুর ভাইয়ের কাছে একটু বসিবার আশায় গিয়াছিল, সাধুর মাহাত্ম্য আমাকে দেখাইতে পারিবে সেই আশায়, কিন্তু সেখানে একেবারে নিরাশ হইয়া দমিয়া গিয়াছিল। ক্ষুধার উদ্রেক আমারও কম হয় নাই, প্রস্তুত অন্ন পাইয়া আমরা দুজনেই বসিয়া গেলাম। দুইখানা বড় বড় ঘৃতসিক্ত রুটি, একটু শাক, একটু আচার আর দহি, একখানা পুড়া অর্থাৎ মালপুয়া। পেট ভরিয়া গেল। ওখানে বসিয়া একটু বিশ্রামের পর আমরা আবার গুহামুখী হইলাম।

এবার বাবা কল্পনাথের কাছে আসন পাওয়া গেল। আমার সঙ্গীর বোধ হয় মনের

ক্ষোভ মিটিল। আমার দিকে বাবার লক্ষ্য করাইয়া দিবার জন্য বলিল, আপনে কলকাতা সে প্রাগজি দর্শন করনেকো আয়া হৈ!

বাবা কিন্তু আমার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না, সঙ্গীর দিকেও চাহিলেন না, তিনি আপন ভাবেই কতক্ষণ রহিলেন, তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—চঞ্চল, দেখিলাম উলঙ্গ মূর্ত্তি। দাঁড়াইয়া তিনি যেন কিছু কাজেই অল্পক্ষণ নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন, তারপর আবাব বসিয়া পড়িলেন। তখন আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, ক্যা হুয়া বাবা, কুছ তরিয়ৎ—বিগ্‌ড়ে হুয়ে—

নহি নহি,—মেরে কুছ বিগাড়া নহি,—হায় হায়, পবমাত্মা কো খেল, ক্যা সমঝু, ঔর কিসিকো সমঝাঁউ,—রেল লাইনমে এক মরদ কো কুছ এইসি বিগাড়া, দোনো চাক্কে পব কাটা গেয়া, ঔর এঞ্জিন ভি রেল সে উতার গেয়া, যাও দেখানা।

আমি তো অবাক, এই ধবণীর গর্ভে অন্ধকার গুহায় বসিয়া ইনি বলেন কি? রেল লাইনে একজন মরদ কাটা পড়িয়া ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হইয়াছে! তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, যাও, যাও, যায়কে দেখো না, বহুত দুর তো নহি!

বার বার বলাতে আমরা উঠিলাম, ওখান হইতে বাহির হইয়া ফাঁকায় আসিয়া উঠিলাম পথে। পথে আরও কতকটা আসিয়া দেখিলাম, কয়েকটা লোক দ্রুতপদে চলিয়াছে। দেখিলাম রেল লাইনের দিকে সারি সারি লোক যাইতেছে। বি এন ডবলু আর-এর গঙ্গার উপর পুল হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা লোক কাটা পড়িয়াছে, আর এঞ্জিনখানা লাইন হইতে নামিয়া পড়িয়াছে, অনেক লোক সেইদিকেই ছুটিতেছে। আমার সঙ্গী সেইদিকেই গেল, আমিও খানিক গেলাম,—শেষে ভাবিলাম আমি ওখানে গিয়া কি করিব, যে যায় যাক আমি যাইব কেন? আমি বরং যে যোগীর কাছ থেকে এই সংবাদে উঠিয়া এলাম, তাঁর কাছে যাই। যেখান হইতে ফিরিলাম, যেখান হইতে দেখা যাইতেছিল অনেক দূরেই ট্রেনটা দাঁড়াইয়া আছে। ফিরিয়া ফের যখন সাধুর গুহায় যাইতে চেষ্টা করিলাম, মাটির নীচে সেই পথেও নামিলাম, যেখান হইতে এইমাত্র বাহিরে আসিয়াছি। আশ্চর্য্য, কিছুতেই তাঁর আসন যে গুহায় সে স্থান আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। কোনরকমেই পারিলাম না। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কল্পনাথ স্বামীকে গুহা কাঁহা? সে বলিল, মুঝে মালুম নহি। বলে অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

১২
অবধূত-সঙ্গ

এর পরেই এক মহাত্মা অবধূতের কথা। যাঁর সঙ্গ আমার জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াই আজও পর্য্যন্ত কাজ করিতেছে। এমন আশ্চর্য্য মানুষ দেখি নাই, যেমন তাঁর মূর্ত্তি তেমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব। এ পর্য্যন্ত কখনো কাকেও এতটা ভয় করি নাই। মূর্ত্তিতে তাঁর এমন কিছু ছিল না যাতে আকর্ষণ করে। তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও আমার কিছু কম ছিল না। তাঁর সব কিছু যেন রহস্যময়। তবে ওদিকে যেমন সব কিছুই প্রচ্ছন্ন, ঢাকা দেওয়া, তেমনিই আমার দিকেই তাঁর স্নেহ ছিল গভীর। তাঁর নিয়ম ছিল ত্রিরাত্রির অধিক কোথাও বাস করিবেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁর সহবাসে, ঐ সব নিয়মের কথা যখন শুনিলাম, মনে হইল এই অবধূতই হইবেন আমার কর্ণধার। ঠিক আমার ঔষধও বটে, কারণ আমি ছিলাম আলস্যপরায়ণ, এক জায়গা যে কোন কারণেই হোক, যখন ভালো লাগিল তখনই সেখানে শিকড় গাড়িবার চেষ্টা করি। কাজেই এঁর সঙ্গেই বনিবে ঠিক। নিজ স্বাধীন প্রকৃতির উপর,—চমৎকার এক বিধাতার দণ্ডবিধান, এমনটিই মানিয়া লইলাম। তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণেই যেন আমায় বাধ্য করিল।

হইয়াছিল কি, গত কাল যে যোগীর কাছে ঐ মানুষ কাটা পড়ার কথা শুনিয়া বাহির হইলাম, তার পর তাঁর সন্ধান না পাইয়া চলিয়া এলাম। পরদিন আর একবার চেষ্টা করিব এই ইচ্ছাই ছিল। তাই আজও প্রয়াগে সঙ্গমে স্নানের পর রেলপুল পার হইয়াই ঝুসিতে আসিব একবার ঐ যোগীকে দেখিয়া তারপর ইচ্ছামতই পাড়ি লাগাইব এই সংকল্প। যাই হোক স্নানের পর ক্ষুধায় একটু কাতর হইয়াছিলাম, বোধ হয় সংকল্পটা বিকল্পেই দাঁড়াইল। ঝুসির দিকে যাইব কি দারাগঞ্জের দিকে যাইব ভাবিতেছিলাম,—দারাগঞ্জে গেলে ভিক্ষা করিতে হইবে, তাহাতেই বড় সঙ্কোচ এখন রহিয়াছে;—ঝুসিতে গেলে, সাধুদের আড্ডাতেই, খাওয়া হয়নি শুনিলেই তখনই খাইতে দিবে। কিন্তু ওখানে যাইবার একটু বাধা এই যে খানিকটা হাঁটিতে হইবে এই প্রচণ্ড রৌদ্রে; দারাগঞ্জটা কাছেই। এই সব কল্পনা-জল্পনা, দর্শনের ভাষায় সংকল্প-বিকল্পটা চলিতেছে, এমনই সময়ে এক মূর্ত্তি,—প্রকাণ্ড মাথা, মাথাভরা মিসমিসে ঘন কোঁকড়ানো চুল, মুখভরা দাড়ি-গোঁফ আর চক্ষুভরা চাহনি, সামনেই আসিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইলেন যেন কিছু ভিক্ষা। আমি মুখখানা দেখিয়াই প্রথমে একটু ভয় ও বিস্ময়ে যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ভাবিয়া লইলাম হিন্দুস্থানী হইবে। মাথায় পাগড়ি থাকিলেও, কাঁধে যে লম্বা পাকানো একটা চাদরের মত কিছু ছিল সেটা দেখিয়াও হইতে পারে, এই মূর্ত্তি হিন্দুস্থানী সাধু বলিয়া মনে হইতে বাধে নাই।

একখানা বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো বুকে গাঁটবাঁধা যেমন সাধারণ ভিখমাঙ্গা সাধুদের হয়, কেবল ঝোলা নাই কাঁধে,—তবে হাতে একটা দণ্ড আছে। শরীরটা দীর্ঘ, লালচে গৌরবর্ণ, জলে-রোদে পোড়খেকো এমনই মুখের ও হাতের গোছের রং,—গায়ের রং আরও উজ্জ্বল, বয়স পঞ্চাশ হইবে। অত্যন্ত ভালোমানুষের মত আমার মুখের দিকে করুণভাবে চাহিয়া সোজা বাংলায় বলিলেন,—কি বাবা! ভয় পেলে নাকি?



আমাব নিজ মাতৃভাষায় সম্বোধনটা কানেব ভিতব মরমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহিব হইল বটে, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিপাতেই মনে হইল যেন অতি আপন। ভিতরটা হালকা হইয়া গেল এই যুক্তিতে, তাহলে ইনি বাঙ্গালী। বুঝিয়াই অমনি বলিলাম, ভয়? কেন, ভয় পাবো কেন? আমার অন্তরস্থ বিস্ময়ের সঙ্গে ভয়টা যে মুখে ছাপ লাগিয়াছে তাহা তো ভাবি নাই, তাই অস্বাকারের সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়িয়া গিয়াছি, যেহেতু স্পষ্টই বলিলেন আমায় তখন সেক্ষেত্রে অব্যাহতি না দিয়া—ভয়টা যে মুখে মাখানো রয়েছিল, বাবা, তবে এখন আর নেই। এখন কিছু খাওয়ার যোগাড় করলে হোতো, নয় কি? আমিও স্নান সেরেই উঠেছি,—উঠেই দেখি দেশের একজন, তাই তো সামনেই এসে দাঁড়ালাম; তখন কি জানি আমার এ মূর্ত্তি ভয়ের উদ্রেক করবে!

আমার মুখে আব কথা নাই, অন্তরে অন্তরে একটা পরিচয়ের ধারা চলিতেছে। তাঁর কথায়, তাঁর স্বরে, বলার ভঙ্গিতে মনোনিবেশ করিয়া মানুষটিকে চিনিবার অথবা তাঁর সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিবার চেষ্টাই করিতেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, এই ভাল মানুষটি তাঁব করুণ চক্ষু দুটি আবার আমার মুখের উপর একনজর মারিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—এত তাড়াতাড়ি পরিচয় কি পাওয়া যাবে, মানুষ কি এতটা সহজ পদার্থ ভাবো,—এখন চলো, খাবার যোগাড় করা যাক, দুজনে আছি, কাঁচা ভিক্ষে পেলে রেঁধে নিতে পারা যাবে। শুনিয়াই আমি বলিলাম, কেন, তৈরী পাওয়া যাবে না? বোধ হয় যাবে।

আমার যে একটা বদ নিয়ম আছে, ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া নিজের হাতে না পাকিয়ে খেতে পারি না। কিন্তু তোমার খিদে পেয়েচে, তাতে তোমার কি তাই করা উচিত!

বলিলাম, খিদে পেয়েচে সত্যি কিন্তু তা বলে খানিক সহ্য করতে পারবো না, এই বা কেমন কথা, উপরি উপরি দু'দিন তিনদিন অনাহারেও কেটেচে এমনও তো হয়েচে।

তা হয়েচে, এখন চলো তো, দেখা যাক কি আছে নসীবে! বাবাজীর কথায় একটু পূর্ব্ববঙ্গের টান ছিল। তা হোক, কিন্তু ভারি মিষ্ট।

দারাগঞ্জে যাওয়া মাত্র ভিক্ষা পাওয়া গেল, আটা আর কয়টা ঝিঙে, একটু ঘি, দুজনের মত সব কিছুই মিললো দা কাঠ, পাকাবার চাটু সব। আমিই পাকাতে যাচ্ছিলাম, তিনি বলিলেন, তা হবে না, তুমি আমার অতিথি। এত শীঘ্র সব কিছু পাকাইলেন, তাঁর অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সর্ব্বক্ষণই চেয়ে রইলাম তাঁর প্রত্যেকটি কাজের দিকে। মনে মনে বুঝিলাম যোগী ইনি নিশ্চয়ই। না হলে এমন পাতলা শরীর, জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, একটা অসাধারণ লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁর কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তের গতির মধ্যে! তিনি, একটিও কথা নাই, কিন্তু গুনগুনিয়ে বেশ একটা সুর ভাঁজিতেছিলেন। আমায় তাহাতেই মগ্ন করিয়াছিল। মনে হইল রাগিণীটি কামোদ, কি মধুর গানটি, তাতেই আমায় মোহিত না বলিয়া সম্মোহিত করিলেন বলিলেই ঠিক হয়। তাঁহাকে সেবা, তাঁর প্রীতিলাভের জন্য আমায় যেন ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

ভোজনের পর চুপচাপ চলিতে শুরু করিলাম আমরা। বলা বাহুল্য এখন হইতে আমার গতিক বুঝিয়া আমাকে একটু আস্কারা দিয়া তাহার সঙ্গে ব্যবহারে উৎসাহিত করিলেন। যে ভাবের এবং যে স্তরের মানুষ তিনি, আমার মনে হইল ইতিপূর্ব্বে যত সাধু যত মহাত্মা সিদ্ধ যোগী দেখিয়াছি, ইনি সবার তুলনায় অনেক উচ্চস্তরের মানুষ। এই মহাত্মার সঙ্গের গুণেই আমি বুঝিলাম, লোকালয় সংশ্লিষ্ট যত গুরু শিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য লালায়িত, অথবা বিশেষ বিশেষ তীর্থে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত এবং জনসমাজে পরিচিত যে সকল সাধু আমরা দেখি তাহাদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম এই শ্রেণীর মহাত্মা যারা নামপ্রচার অথবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা অথবা নিজ গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা, যার নাম লোকৈষণা বিত্তৈষণা এবং সর্ব্ববিধ এষনা শূন্য, অজ্ঞাত নির্জন কাননে প্রস্ফুটিত পারিজাতের মতই লোকসমাজের বাইরে অবস্থিত। এঁর সঙ্গ করিয়া এই জ্ঞান আমার হইয়াছিল যে সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-শূন্য এমনই মহাত্মা, সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন তাঁহারা এখানেই প্রচ্ছন্নভাবে যাতায়াত করেন, যাঁদের কথা সাধারণ গ্রাম বা নগরবাসীর চিরদিন অগোচরেই থাকিয়া যায়। তাঁহাদের আত্মগোপনও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আসেন বাহিরে আবার বাহিরে থাকিয়া বাহিরেই চলে যান, কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কখনও করেন না। পরমাশ্চর্য্য তাঁদের আত্ম-গোপন-পটুতা। সিদ্ধকল্প এবং সিদ্ধসংকল্প বলেই তাঁরা সমাজকে ফাঁকি দিতে পারেন।

হিমালয়ের অজগর দুর্গম জঙ্গলময় প্রদেশে এমন সব ফুল ফোটে, যে ফুল সমতল প্রদেশের কোন সৌখিন ব্যক্তির চক্ষে পড়িলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবেন, ফুলের গঠন-সৌন্দর্য্য, বর্ণ-মাধুর্য্যে স্বর্গের বার্ত্তাই বহন করে।

সেই ফুল ঐ বিজন প্রদেশে, প্রকৃতির কোলেই আপনিই ফোটে, আপনিই তার রূপে বসে বিভোর থাকিয়া যথাকালে ঝরিয়া পড়ে, পঞ্চভূতে মিশায়। কেউ দেখে না। বিধাতার অপূর্ব্ব এই সৃষ্টিও দেখিলাম, হয়তো মহাভাগ্যে কারো চক্ষে পড়িলে, হয়তো কেউ বুঝিলেন বা বুঝিলেন না—তাঁরা নিজ জীবনের সকল করণীয় সুসিদ্ধ করিয়া বাহিরেই দেহত্যাগ করিলেন এমন স্থানে, এমন পরিস্থিতির মধ্যে, তাঁর কথা যেখানে কেউ জানিতেও পারিলেন না যে ইনি কে ছিলেন এবং কি করিতে আসিয়াছিলেন বা কি দিয়া গেলেন এই অন্ধ সমাজকে।

গড়পড়তা পথ-চলা পর্য্যটক সাধুর সঙ্গে আশ্রম-অবলম্বনকারী বৈঠগেয়া সাধু ঢের কম, আর এই শ্রেণীর সাধুই ধনী ও মধ্যবিত্ত গরীব গৃহস্থ সাধারণের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আমি পথ চলিতে চলিতে একসময় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আপনি কি সন্ন্যাসী, কোন্ সম্প্রদায়ের? তিনি ইঙ্গিতে বলিলেন, চলতে চলতে কথা কওয়া নিষেধ, এইটি বুঝাইলেন তর্জ্জনী অধরোষ্ঠের উপর চাপিয়া।

নিঃশব্দে নগ্নপদে তিনি চলিতেছিলেন। প্রথমটা ধীরতালে, তারপর কি বেগ বাড়াইলেন—আমায় বহু দূর ফেলিয়া গেলেন অদৃশ্য হইয়া। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া আমরা চলিতেছিলাম, সূর্য্যাস্তের পরেই ছোট একখানি গ্রাম পেলাম পথের ধারে। একটি ইঁদারা, তার পাশেই ছোট একটি মন্দির। মেয়েরা কলসী মাথায় জল লইয়া যাইতেছিল। সেই মন্দিরের একটা ধাপের উপর বসিয়া বসিয়া স্নিগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন,—গিয়া আমি তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে বসিলাম, আর বসিয়া তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলাম।

এখন বলিলেন,—দেখো কাছে এইখানেই থাকবো আমরা,—কেমন? আমি বলিলাম, ভাল। এবার তিনি বলিলেন,—আমরা সন্ন্যাসী, এবং কোন্ সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করছিলে? আমরা অবধূত,—বুঝলে? যেই বললাম হাঁ, আবার অমনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বুঝলে? মহা মুশকিল,—বলিলাম, অবধূত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী।

না, না, সন্ন্যাসী বলতে হয় বলো, অবধূত কোনো সম্প্রদায় ঠিক নয়; এবং গৃহসংসার ত্যাগী যারা, সাধারণতঃ যাদের সন্ন্যাসী বলে, তাদের সম্প্রদায় আছে যেমন তীর্থ, সরস্বতী, গিরি, পুরী, ভারতী, শঙ্করের দশনামী প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়, অবধূত তারাই যারা কোন সম্প্রদায়ের নয়, যথার্থ আশ্রমত্যাগী, অবধূত মুক্ত, আশ্রম আশ্রয় করে না। বুঝেচ এবার? আমি আবার বললাম, হাঁ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যানন্দ

অবধূতের কথা আমার মনে উঠিল। বলিলাম, নিত্যানন্দও অবধূত ছিলেন, নয় কি ?

তিনি বলিলেন, হাঁ, তিনি মুক্তপুরুষ, অবধূত ছিলেন এবং গৌরাঙ্গের টানে নবদ্বীপে এসে তাঁর লীলাসহচর হয়েছিলেন। মুক্ত, পাশমুক্ত সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত হলেই অবধূত হয়। নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ এ দুটি বস্তু—ছেড়ে দাও এখন ও-কথা।

কতদিন পর এক অবধূত পাইয়া আমার যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা আব বলিবার নয়। শুনিলাম অবধূত তো অসাধারণ, —উচ্চস্তবেব সিদ্ধযোগী না হইলে অবধূত হয় না। আরও জানিতে প্রবল একটা আগ্রহ। ভাগ্যক্রমে এই অবধূতের সঙ্গ পাইয়াছি, এখন আমার জীবন ধন্য। পূর্ব্বে আমাব তো অবধূত সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। আজ আবার এই প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, অবধূত কি সকল সন্ন্যাসীই হইতে পারে ?

তিনি তখন নিজ ভাবেই মগ্ন ছিলেন অতটা লক্ষ্য করি নাই, কবিলে অসময়ে কখনই এই বেফাঁস প্রশ্ন উপস্থিত করিতাম না। এ মানুষেব বাগ নাই, বিরক্তি নাই, বলিলেন, অবধূত জাত ও পাশমুক্ত যাবা তাঁবাই হলো অবধূত, রামানুচার্য্যের এক মহাশক্তিশালী শিষ্য রাঘবাচার্য্য বা রাঘবানন্দ, তখন তিনি প্রয়াগে গঙ্গাতীরে বাস করছিলেন। তাদেব সম্প্রদায়ের ভয়ানক বকমের আচাবেব বাঁধুনি, ঐ আচাব নিয়েই তাঁরা থাকেন। এখন রামদত্ত নামে প্রয়াগে এক ব্রাহ্মণের সন্তানেব অদ্ভুত শক্তি ও অধ্যাত্ম-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে শিষ্য করেন। দীক্ষাব পব তার গুরুদত্ত নাম হল রামানন্দ। অল্পদিনেই তিনিই গুরুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু গুরুর অপরাপর শিষ্যেরা ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আচারভ্রষ্ট, আশ্রমের সকল আচার নিখুঁত পালন করেন না বলে অভিযোগ করতেন। কারণ রামানন্দ বলতেন, আচার আর জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্বে ফুলে থাকলে ভগবানের কৃপালাভ হবে কি করে ? জাতি কখনও অপবিত্র হয় না। সুতরাং কোন জাতিই ঘৃণ্য নয়, মানুষ অসঙ্গত অন্যায় অপবিত্র কর্ম্মেব জন্যই পতিত হতে পারে, কিন্তু ঘৃণ্য হয় না।

এই ভাবের আচারের বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করতে পারতেন না আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চিহ্ন ধারণ প্রভৃতি গোঁড়ামিও পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন, অতিরিক্ত ঐ শুদ্ধাচারই ভগবান বা জ্ঞান লাভের বড বাধা। আসলে তিনি ছিলেন যোগী, তাঁব সিদ্ধির পর তাঁর ঐ সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত গোঁড়ামি সহ্য করতে না পেরে তিনি পৃথক হয়ে নিজ মত প্রচার করেন। তিনিই প্রথম অবধূত, তাঁর উদার মত নানা জাতির ধর্ম্মাত্মাদেব আকর্ষণ করতো। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসর বেঁচে ছিলেন। তাঁর ভালবাসা ছিল অসাধারণ, নানা জাতির ধর্ম্ম-সাধনেচ্ছু লোক তাঁকে গুরু করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল। তিনি অধিকারী বিচার করেই দীক্ষা দিতেন—আর অবধূত তাঁদেরই বলতেন যাঁরা যথার্থই সমাজবন্ধন এবং পাশমুক্ত হতে পেরেচে।

তাঁর শিষ্যদের কাকেও অবধূত, কাকেও হংসও বলতেন, কাকেও সিদ্ধিলাভের পর পরমহংসও বলতেন। রামানন্দের গুরু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ রামানুজাচার্য্যের শিষ্য যাঁরা, গৃহী বা সন্ন্যাসী সম্প্রদারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ, আর তাঁরা ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি। রামানন্দ অবধূত হয়ে রামচন্দ্রকেই ইষ্ট বলে প্রচার করেন, তাঁর উদার মতো প্রভাবে বহু ভক্ত তার মতাবলম্বী হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, উত্তর ভারতের সকল জাতির লোকই ছিল। কবীর ছিলেন তাঁর একজন বড় শিষ্য,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষেই তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল তখনকার দিনে। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন বারোজন, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও চামার, নাপিত জাঠ মুসলমান, উত্তর ভারতের জোলাহারা। এ সকল শিষ্যেরাও উচ্চ অবস্থার অধিকারী হয়েছিলেন। এই মুক্তআত্মা রামানন্দ থেকেই অবধূতের সৃষ্টি, আর তার লক্ষণ হল জাতি ও আচার, শুচি-অশুচির বন্ধনমুক্তি। মহৎ ও উদার ভাবই অবধূতকে এতটা প্রসিদ্ধি দিয়েছিল। কিন্তু তার গুরু রাঘবানন্দের শিষ্য-প্রশিষ্যের কাছে অবধূত হোলো গালাগাল। তাদের কাছে এর ব্যাখ্যা হোলো আচারভ্রষ্ট মূঢ় জীবই অবধূত। কাজেই তখনকার গোঁড়া সমাজের পক্ষে রামানন্দ একজন কত বড় সমাজ-সংস্কারক তা হয়তো এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য্য শক্তি তাঁর,—ঐ বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর উদার মতের প্রভাব এতদূর পৌঁচেছিল যে রাজকুমারী এবং রাজরাণী মীরা, গুরু রামানন্দের চামার শিষ্য রুহিদাসকেই গুরু বলে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। রামানন্দের সমাধির পর তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্য অবধূত নামেই পরিচিত হয়ে রইলেন এবং উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়লেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীগৌরাঙ্গ তখন নবদ্বীপে, তাঁর মধ্যে যখন ভগবান-ভাবের বিকাশ হয়েছে তখনই নিত্যানন্দকে পেলেন আর একেবারে জ্যেষ্ঠের আসন দিলেন। তার কারণ তিনি অবধূতের স্বরূপ জানতেন। তারপর ইতিহাস প্রমাণ করছে অবধূত কি পদার্থ। এই হোলো অবধূতের ইতিহাস। কেমন হয়েছে তো শোনা তোমার অবধূতের কথা? বলো তো এখন, তোমার অবধূত-পরিচয় পিপাসা মিটেছে কিনা?

হাসিয়া বলিলাম, সত্যই বলেছেন, অবধূতদের সহ্যগুণ বেশী। যথার্থ এমন নমনীয়তা দেখা যায় না, নিত্যানন্দের জন্যই পাষণ্ডী উদ্ধার—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, শুধু নিত্যানন্দ কেন, অবধূতেরা পূর্ব্বাপর এতই অন্যান্য দাম্ভিক সম্প্রদায়ের হাতে অত্যাচার সহ্য করেছে শুনলে মনে হবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের আঘাত সহ্য করতেই যেন অবধূতের সৃষ্টি। না হলে অবধূত কেন? নিত্যানন্দ যথার্থ অবধূত। আগাগোড়া যতই তাঁর জীবন আলোচনা করে দেখবে কি অপূর্ব্ব বিস্ময়কর জীবন! তাঁর এক জীবনের কর্ম্মের ফলেই সারা বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। তখনকার

তান্ত্রিক শাক্তদের এত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন যার তুলনায় জগাই-মাধাইয়ের প্রহার তো সামান্য। বিনয়—এমন বিনয় আগে কেউ দেখেনি,—গানে যা আছে তার প্রত্যেক অক্ষরটি সত্য ; তিনি কি ভাবে প্রচার করেছিলেন জানো তো ? বলিয়া তিনি কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেন,—

অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় রে,
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে,
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে,
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে,
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় রে।
যারে দেখে তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি রে, –
আমারে কিনিয়া লহ, বলে গৌর হরি রে। ইত্যাদি

ঐ রকম করেই দাঁতে তৃণ ধরে, সে-বিনয়ে পাষাণ গলেছিল। এই ভাবেই বাংলায় প্রচার হয়েছিল। জয় গুরু, জয় গুরু বলিয়া তিনি জোড় হাত কপালে ঠেকাইলেন।

পরে যেন নিদ্রোত্থিতের মতই জাগিয়া বলিলেন, নাও, তোমার হয়েচে তো, এখন শোনো, বলিয়া একখানি জয়দেবের পদ—

রাধা বদনবিলোকন বিবিধ বিকার বিভঙ্গম, –
জলনিধিমিব বিধু মণ্ডল দরশন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পদ পূর্ব্বের বড় বড় কীর্ত্তনীয়ার মুখে শুনিয়াছি কিন্তু এমন সুললিত ভঙ্গিতে গানের মধ্যে ভাবের আকর্ষণ জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। এ রসোদ্গার কীর্ত্তনীয়ার মুখে সম্ভব নয়, কণ্ঠে নয়, ভাবে নয়, উচ্চারণে নয়। এইভাবে কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে আমাদের হুঁশ ছিল না, হুঁশ হইলে দেখা গেল চারিধারে গ্রামের লোক নরনারী জড় হইয়াছে। কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছে আর সবারই জোড়হাত।

চাঁদ উঠিয়াছে পূর্ব্ব গগনে, কতকটা উপরে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে আমিও দাঁড়াইলাম। কিন্তু তিনি যেন মাতাল হইয়াছেন, পা টলিতেছে। আমার ঐদিকে লক্ষ্য পড়িতেই নিজকে সুন্দর সামলাইয়া লইলেন। আর যেন সে অবস্থা কাকেও জানিতে দিবেন না। তবুও আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মনোভাবটি বুঝিয়াই যেন আমায় অনুগ্রহ করিতেই কাঁধে হাতটি রাখিলেন, কিন্তু নড়িলেন না। তখন একজন আসিয়া প্রণাম করিল। তারপর রাত্রের মত তাদেরই গ্রামে একস্থানে থাকিতে সযত্নে আহ্বান করিল।

তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম তিনি এখন কোথাও যাইবেন না এখানেই থাকিবেন, তোমরা ঘরে অথবা আপনাপন স্থানে যাও। খাওয়ার প্রশ্নও তারা করিল, এখানে কিছু

আনিয়া দিবে কিনা জিজ্ঞাসাও করিল ;—শেষে নিরাশ হইয়া তাহারা চলিয়া গেল। গরমের সময় এখন ফাঁকায় থাকিতেই ইনি চান, বলেন একেবারে ফাঁকা মাঠই চমৎকার। যাহা হউক তাহারা চলিয়া গেলে বলিলেন,—কি সুন্দর! আর কোন কথাই নাই। আমিও চুপ করিয়া আছি। দেখিয়া আমার দাড়িতে হাত দিয়া বলিতেছেন,—এমন সুন্দর,—তুমি কেন আমার সঙ্গে কষ্ট পেতে এলে, বাবা! যাও আপন ঘরে যাও।

আমার অন্তরটা মোচড দিয়া মুখে বাহির হইল ;—আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

তিনি বলিলেন, রাম রাম, তাডিয়ে দেবো কেন,—আমাদের ভবঘুরে জীবন, শহরে যাবো না, গ্রামেও পারৎপক্ষে নয়, আমার রাস্তাই আশ্রম আর চলাই কর্ম্ম, তুমি কেন কি জন্যে এ কষ্ট স্বীকার করবে? তাই বলচি—ঘরে তোমার আশায় পথ চেয়ে আছে, এইবার কবে ফিরে আসে আবার কিভাবে দেখা ঘটবে বলে একজন অপেক্ষায় আছে যে।

অবশ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই তাঁহাকে লুকাই নাই, যদিও তিনি নিজেও জানিতে চাহেন নাই। সুতরাং তিনি সত্যই বুঝিয়াছিলেন, বাড়িতে ধৈর্য্যশীলা আমার এমন একজন আছেন তিনি সত্যই ঐভাবে অপেক্ষাই করিতেছেন। ঐ একজনই আছেন অপর কেহ নয়। এই সময়েই আমারও মনের মধ্যে তাঁহার নিজের পূর্ব্ব জীবন-কথা প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম হইতে কিভাবে বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহাকে এইভাবে পথের বাহির করিয়াছে। যদিও আমি মুখ ফুটিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি নাই তথাপি ইনি আমার মনের ভাবটি টের পাইয়াছেন ইহা আমি বুঝিয়াছিলাম, পরে ইহার নির্ঘাত প্রমাণও পাইয়াছিলাম যখন একদিন সত্যসত্যই তাঁর অতীত জীবনের কথা তিনি আমার নিত্য পুঞ্জীভূত কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য খুলিলেন।

সেটা ইহার আরও কিছু দিন পরে। এখন তাঁহার কথায় আমি একটু সঙ্কুচিত হইয়াছি দেখিয়াই তিনি সামলাইয়া লইলেন। এতো কোমল অন্তঃকরণ মানুষের, একজন এইরূপ লম্বা-চওড়া তাহার মত পুরুষের হইতে পারে ইহজীবনে আর দেখি নাই। কাহারও প্রাণে বেদনা তিলমাত্র সহ্য করিতে পারেন না। ইহা দুর্ব্বলতা বা সবল হৃদয়ের কথা যাহাই হোক এখন কিন্তু আমায় বলিলেন,—এসো, একটু বসি, বলিয়া বসিয়াই পড়িলেন। সুতরাং আমিও বসিলাম, কোন কথাই নাই। আমি ভাবিতেছিল, আজ কোথায় থাকা যাইবে? এই মন্দিরের চাতালে থাকিলে কেমন হয়,—মনে মনে কথাটা উঠিয়াছে মাত্র, অমনি তিনি বলিতেছেন, এখানে নয়,—রাত্রে এমন কেউ কেউ এখানে আসে, আমরা থাকলে তাদের অসুবিধা হবে।

বলিলাম, আমরা তো একধারে পড়ে থাকবো, তাতে তাদের কি বা ক্ষতি হবে?

তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, সেটা ঠিক নয়—এখানে থাকা হবে না—না থাকাটাই

ভালো। আর কিছুই বলিলেন না, যেন আত্মসমাহিত হইয়া পড়িলেন। আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার ভাবটাই দেখিলাম—দৃষ্টি স্থির কিংবা মুদিত চক্ষু বুঝিতে পারি নাই, কারণ খানিকটা তফাতেই ছিলেন তবে তিনি আসনেই বসিয়াছিলেন।

কতক্ষণ পর আমারই প্রথম উঠিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু ইনি যে এখনও বসিয়া, উঠিবার গা দেখিতেছি না। যেই ডাকিব কিনা ভাবিতেছি, তিনি একটু নড়িলেন.—যখন ঐভাবে একজনকে স্থির দেখা যায় তখন যে তাহাকে ডাকিতে নাই সে-বুদ্ধি আমার ছিল কিন্তু। অনেক সময় বুদ্ধি থাকিলেও মনের চাঞ্চল্য হেতু তা যোগায় না, আমার তাহাই থাকিবে। উঠিবার জন্য চঞ্চল হইলেও ভাগ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করি নাই, না হইলে অনুতাপ করিতে হইত। এহ যে তিনি নড়িলেন বলিলাম, এই নড়ার মধ্যেই দেখিলাম সহজ প্রাণায়াম চলিতেছে। সহজ প্রাণায়াম তাহাকেই বলে, দীর্ঘকাল প্রাণায়ামাভ্যাসে সিদ্ধ হইলে ধ্যানাবস্থায় স্থিতির আগে এবং পরেও সহজেই উহা হয়, আয়াসের আর প্রয়োজন থাকে না। এখন অল্পক্ষণেই তিনি হাতটি সরাইয়া হাঁটুর উপর রাখিলেন। আমি বুঝিলাম, এইবার আসন ভাঙিবেন।

অল্পক্ষণেই তাহা হইল,—ধীরে ধীরে উঠিলেন, আমিও উঠিলাম। আমার কাঁধে হাতটি রাখিয়া বলিলেন, চল। কিন্তু চলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়াই রহিলেন। বোধ হয় পায়ে ঝিঁঝি ধরিয়াছিল, অথবা আমার উঠিবার জন্য ছটফটানিটা সংক্রামিত হইয়াছে, অন্ততঃ আমি এই কথাই মনে করিলাম। যদি আমি মনে চঞ্চল না হইতাম তাহা হইলে বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ আসনে থাকিতেন।

আমি যেন একটু ঘনিষ্ঠ ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম,—এখন কোন্ দিকে যাবেন ?

এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে, আপনা থেকেই অন্তরে কেমন একটি অস্বস্তি অনুভব, তারই সঙ্গে কেমন যেন কুণ্ঠা, তীব্র একটা সঙ্কোচ আসিয়া আমায় স্তব্ধ করিয়া দিল। উত্তরে তিনি কিন্তু এমনই সহজভাবে শুধু একটি প্রশ্ন করিলেন,—কেন ? যেন তাঁর মুখ হইতে সহজেই বাহির হইল, অন্যমনস্ক থাকিলে যেমন হয়।

তাহাতেই আমায় উপস্থিত বুদ্ধি মত যুক্তি দিয়াই বুঝাইতে হইল যে, কাছেই গ্রাম রয়েচে, তা দেখেও আপনি তখন সেদিকে না গিয়ে প্রথমে এইখানেই বসলেন, তারপর এখন বলচেন, চলো, তাই জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে এখন গ্রামের মধ্যেই যাবেন তো ?

ঠিক আবার সেই ভাবেই বলিলেন, যখন এখানে বসলাম তখনও যেমন, এখন যে চলো বলেছি, কোনোটাই হিসেব করে বলিনি ;—যেন তোমার ইচ্ছার উপর আমার গতি ছেড়ে দিয়েচি, এখন যা হয় করো।

এইটুকুই যথেষ্ট হইল আমার পক্ষে। যে গ্লানি ফুটিয়া উঠিল আমার ভিতরে এখন তার

ভাষাও পাইলাম। মূঢ় আমি, কতটা স্থূলবুদ্ধি। এঁর সঙ্গে থাকিবার উপযুক্ত নই। এত বড় অস্থির, জ্ঞানশূন্য, অন্যমনস্ক যে এমনই স্নেহময় আপনভোলা একজনকে এতটা কাছে পাইয়াও আপন করিতে পারি নাই। অহম্ উদ্ভূত মনের ঐ বিষম গলদটা এইখানেই ধরা পড়িয়া গেল, যা এর আগে এতটা স্পষ্ট উপলব্ধি করি নাই। আমার ব্যক্তিগত অহঙ্কারের সঙ্গে গরিমা-গ্রন্থির একটা বেশ বড় জটা পাকানো আছে, আর ভিতরে ভিতরে সেটা এমন কৌশলে ঢাকা দেওয়া আছে—সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, সেইটাই আমার ইষ্টলাভের প্রধান অন্তরায়। এখন এই অবস্থায় আমি যে কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছি না, তারও কারণ এইটাই। সেজন্য সাধু-মহাত্মার দর্শন পাইলেও, তখনকার স্বার্থমূলক কৌতূহল মিটাইবার জন্যই তাঁদের কাছে জ্ঞান অথবা সাধনা সম্বন্ধে কিছু আদায় করিবার মনোভাব লইয়াই যাওয়া, বসা প্রভৃতি প্রণামাদি ব্যবহার করিতেছি। অপর একজনের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের পরিচয় পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাকে ধূর্ত বা স্বার্থপর বলিতে মুহূর্তও দ্বিধা করিতাম না। সত্যসত্যই তো,—ভাবিয়া দেখিলাম যে, কখনও সেবার মনোভাব লইয়া যাই নাই। তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি কিনা তা এখন মনে হইতেছে না, কিন্তু অহমিকার গরিমায় সেদিকে আমার লক্ষ্যও যায় নাই। সে লক্ষ্য বা ইচ্ছা প্রবল থাকিলে সেই সুযোগ যে পাইতাম না, তা বলা যায় না। বৈষ্ণব গুরুরা যে কথা বলেন তা মিথ্যা নয় যে, ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রভাবে অন্তঃকরণ নির্ম্মল, শুদ্ধ হইলেই না সেবার অধিকার লাভ হয়? তাই সেবার অধিকার বড় মহৎ, সেটা সবার থাকে না, যার থাকে তারই সে লাভ হয়। স্পষ্টই যেন দেখিতে পাইলাম, সেবা করিতে গেলে যতটা হেঁট হইতে হয়, আমার অহং গর্ব্বে ভরা মাথা কারো কাছে ততটা নুইতে চায় না। এখন অবধূতেরই কৃপায় এদিকে যেন সচেতন হইলাম। এক মুহূর্ত্তে মাত্র এই মহানের পরশের মহিমা বুঝিলাম। আমারই কথায় যেন ইনি আমার অন্তরের অপরাধ বা অভাবটি জানিতে পারিয়া এখন সেদিকে সচেতন করিয়া দিলেন। ভিতরে ভিতরে এই সব হইয়া গেল। অতি অল্পক্ষণেই সবটাই ঘটিল, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় না যে কোনও বাহ্য বিষয়ে নিবিষ্ট-চিত্ত হইবার মত অবস্থা তাঁর এখন আছে।

যাই হোক এখন আমরা গুটি গুটি চলিলাম গ্রামের দিকে। পথে আর কোন কথাই হইল না।

রাস্তা হইতেই গ্রামের মধ্যে যে পথটা সোজা গিয়াছে সেই পথের ধারেই একটা ঘর সামনে, নীচু দাওয়া, সেই দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া এক বুড়োমানুষ হুঁকায় তামাক খাইতে-ছিল। সামনে একটু ফাঁকা জমি সেখানে, একটা অর্জ্জুন গাছ। সেই গাছটা দেখিয়াই অবধূত বলিলেন, এইখানেই থাকা যাক কি বলো? আমি এটাও লক্ষ্য করিলাম, হয়তো ঐ বৃক্ষের দিকেই যাইতেছিলেন, কিন্তু তাকে তামাক খাইতে দেখিয়াই বৃক্ষতল আশ্রয়ই

ভালো মনে করিলেন। পরেও বুঝিয়াছিলাম, তামাকের উপর একটা বিতৃষ্ণা ওঁর আছে, বলিয়াছিলেনও কথাপ্রসঙ্গে,—তামাক একটা বিষ। সমাজের মানুষ এক বিষ থেকে বাঁচতে আর এক বিষ ব্যবহার করে। বিষে বিষক্ষয় আর কি! ঠিক দেখেছি স্বর্গ-নরক মানুষেরই সৃষ্টি, এইখানেই তো সবই। তামাকের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না।

যাই হোক এখন আমরা এইখানেই থাকিব শুনিয়া বুড়োমানুষটি তার দাওয়ায় শুইতে অনুরোধ করিলেন, তারপর ভোজনের প্রসঙ্গ কি হইবে, বলিতেই তিনি বলিলেন, আজ ওর কুছ নহি। গ্রামে প্রবেশ ঘটিল না।

সকাল পর্যন্ত ঐ গাছতলায় কাটাইয়া আমরা আবার পথ ধরিলাম। প্রায় মাইল তিন এলাম আমরা,—ক্রমে এক বড় গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া দেখা গেল একটি বেশ প্রশস্ত নদী, গঙ্গার শাখাই হইবে। উপরে বেশ মজবুত প্রাচীন সেতু, সেই পুলটা পার হইয়াই



ঐ প্রকাণ্ড গ্রামখানি। তিনি প্রস্তাব করিলেন, এখন এইখানেই স্নান করা যেতে পারে। সুতরাং আমরা স্নান করিলাম। পরে বলিলেন, চলো গ্রাম পেরিয়ে গিয়ে ওদিকেই অন্ন-সমস্যার সমাধান করা যাবে। রৌদ্র বেশ খর হইয়াচে বটে, বসন্তকাল, মাঝে মাঝে সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়িতেছিল, তাহাতেই পথ চলার সুবিধা হইয়াছিল। ঐ বড় গ্রামখানি পার হইয়া যখন আমরা তার শেষ দিকে এলাম, মোষের গাড়ি, এক্কা, হাতগাড়ির ভিড়, দোকানের পর দোকান, হট্টগোল পার হইয়া আমরা একেবারেই শেষদিকে এক মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ মন্দিরের পুরোহিত আমাদের ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন। আমরা প্রসাদ পাইলাম। অবধূত সামান্যই খাইলেন,—

তারপর গিয়া বসিলেন বাইরে একটা গাছের ছাওয়ায়। কাছেই ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিতেছে, আনন্দেই দেখিতেছেন।

আমি একটু শুই, তুমি ইচ্ছা কর তো শোও না, বলিয়া তিনি আর কোন কথা না বলিয়া খানিকটা সমতল ঘাস-ঢাকা জমির উপরেই একেবারে আপাদ-মস্তক চাদরখানা ঢাকা দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হইয়া গেলেন। হঠাৎ আমার মাথায় আসিল এটা কখনই ঘুম নয়, কারণ যে ভোজনের পর ঘুম আসে সে ভোজন তিনি কখনই করেন নাই। একখানা রুটি একটু ডাল ও তরকারী দিয়া আর দুধে সিদ্ধ ভাত যার নাম পরমান্ন একটু-মাত্র খাইয়া যে পেট ভরে না, কে না বুঝে একথা ? এ শোয়াটা তাঁর আসনে থাকা। জানিতাম যে সিদ্ধযোগীরা যখন পথে বার হন তখন তো আসনের ব্যবস্থা থাকে না, শবাসনেই আসনে বসার কাজ সারেন। অভ্যাসমত দিবা ও রাত্রে একবার অল্পক্ষণের জন্য হইলেও নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লন।

লক্ষ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের চিহ্নও নেই। এই গরমে কেউ চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমায় না। এ ঘুমটা কেবল লোকচক্ষু এড়াইতে, এইভাবে আসনে থাকা। ঠিক যেন চাদর ঢাকা শব একটি পড়িয়া আছে। তার দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে আমিও স্থির হইয়া গেলাম। কিন্তু আমি ভোজন করিয়াছিলাম এমন যাতে পেট একটু ভার নিশ্চয়ই ছিল, তাই শরীরে আলস্যের আমেজ পাইলাম। ঐভাবে বসিয়া বসিয়া আমিও আলস্যটা ঘুচাইয়া লইলাম।

প্রায় একঘণ্টা হইবে, কাটিয়া গেলে পরে দেখিলাম একবার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার আভাস। দেখিয়া আমি অপেক্ষা করিতেছি, এইবার চাদরের মুড়ি খুলিবেন। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা গেল, তবুও উঠিলেন না, এই সময়টা বোধ হয় একটু নিদ্রা দিয়াই তারপর মুড়ি খুলিলেন এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, দুই হাতে দুই হাঁটু বেড় দিয়া বসিলেন, তার পর বলিলেন, হাঁটবে নাকি,—আরম্ভ করবে ?

আমি বললাম, আপনার ইচ্ছা,—

একটু হাসিয়া বলিলেন, স্থানটি বেশ চমৎকার, নয় ?

বুঝিলাম আজ আর এখান হইতে যাইতে চাহেন না, থাকিবেন। মনে হইবামাত্রই প্রাণ আমার আনন্দেই নাচিয়া উঠিল,—বিশেষ কিছু শুনিতে পাইব, চলিতে আরম্ভ করিলে তো নিশ্চয়ই আর কথা কহিবেন না,—কাজেই তাঁর বসিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে সুবিধা।

পরিবেশ অতীব মনোরম বলিয়াছি,—স্থানটিতে কেমন এক পবিত্র হাওয়া বহিতেছিল। এইখানে রাত্রি অনেকক্ষণ আমাদের ভজন গানে কাটিল। যথাকালে শয়ন ও প্রভাতে যাত্রা। এইভাবে প্রত্যহ তিন-চার মাইলের বেশী নয়, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আমাদের

পর্যটন চলিতে লাগিল। উদ্দেশ্য ঠিক নাই, অন্ততঃ আমি জানি না ইনি কোথায় যাইতেছেন। আমি তাঁহারই আকর্ষণে সঙ্গে চলিতেছি, যখনই কথা কহিতেছেন আনন্দে ভাসিতেছি। কত কত কথাই শুনিতেছি। যতই দেখিতেছি ততই অপরিচয়ই বাড়িতেছে। কারণ আমি ইঁহার আদি জানি না, যেদিন প্রথম দেখিয়াছি সেদিন হইতে প্রতিদিনই এক এক নূতন পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অবাক হইতেছি।

আজই এক কাণ্ড করিয়া বসিলাম। একটা কথা আছে, বাঁদরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে। এমন মহৎ সঙ্গ পাইয়া, বড় স্ফূর্তি বোধ হইল, তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া আমার প্রতি স্নেহ ও প্রীতিতে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছি ভাবিয়া মুহূর্ত্তেব অসাবধানতায় তাঁহাকে এক প্রশ্ন করিয়া বসিলাম। উহারই ফলে অবশ্যই উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল কিন্তু আজ আমার মধ্যে অসংযত বাকের পরিচয় তিনি পাইলেন, এ ঘনিষ্ঠতা হইল একটা বিষম বেদনাদায়ক অবস্থার ভিতর দিয়া। সে কথাই বলিতেছি।

হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আপনি কি পূর্ব্ববঙ্গের? এইটুকু মাত্র কথা। তাঁহার কথায় পূর্ব্ববঙ্গের টান ছিল, তাহাতেই আমার এই অনুমান। তাঁর উদাব মন, যদিও বেশী কথা কওয়া তাঁর স্বভাব নয়, বিশেষ একটা কিছু কারণ না থাকিলে কথা বলিতেই নারাজ, এইরকমই প্রকৃতি তাঁর, তা ছাড়া কখন-কখনও এমন ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁর কাছে কোন কথা কওয়া অসম্ভব। আজ এখন বেশ প্রফুল্ল মন দেখিয়া প্রশ্নটা যেন যন্ত্রের মতই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তিনি বিরক্ত হইলেন না, বরং সস্নেহেই বলিলেন, সন্ন্যাসীকে পূর্ব্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই একথা কি জানো না, কখন কারো কাছে শোনোনি?

শুনিয়া লজ্জায় মাথাটি হেঁট আপনিই হইয়া গেল, তিনি আবার বলিলেন, দেখো আমি তোমায় কখনও ওকথা জিজ্ঞাসা করিনি, যা কিছু বলেচ তুমি আপনিই বলেচ। শুনিয়া আমি বলিলাম, জানতাম কথাটা, তবে ভাগ্যের যোগাযোগেই বলতে হবে এই প্রবাসে এক দেশের মানুষ দুজনেই মিলেচি, তা ছাড়া আমরাও পূর্ব্ববঙ্গের কিনা—এতটা কাছাকাছি হয়ে এই জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। শুনিয়াই তিনি আমাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমি আমাদের দেশের পরিচয় দিলাম—ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর অন্তর্গত খ্যাইল্যা গ্রামেই আমাদের পূর্ব্ব নিবাস। তবে সেটা চার পুরুষ পূর্ব্বের কথা—

তিনি বলিলেন, বেশ আমার কথা কিন্তু অন্য, আমার দেশ কোথা জানি না, তবে লালিতপালিত ঢাকায়। কিন্তু পূর্ব্বাশ্রমে আমার জন্ম ও জীবনের কথা শুনে তুমি কি আর আমার উপর শ্রদ্ধা রাখতে পারবে?

আমি নির্ব্বাক। মুখে কোন কথাই আসিল না। আমায় এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি

কিন্তু নিঃসঙ্কোচেই বলিলেন, তোমার কৌতূহল মেটানো শুধু নয়,—আমায় যখন জিজ্ঞাসা করেছ, তখন এড়িয়ে যাওয়া চলবে না, বলতেই হবে, বলবও, তবে কথাটা এই যে আমি তো সে কথা সহজেই বলতে পারবো কিন্তু তুমি কি সে রকম সহজভাবে নিতে পারবে—যেমন ভাবে অন্যান্য তত্ত্বকথা শুনে নাও! মনে ততক্ষণে সম্ভব-অসম্ভব কত রহস্য, কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে, তিনি কিন্তু তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আমার মনের মধ্যে যাহা উঠিতেছে যেন সেইগুলি দেখিতেছেন। এইভাবে থাকিয়া কতক্ষণ পর বলিলেন, আমি পবিত্র হিন্দু সমাজের বাইরেরই একজন, আমার জনক-জননীর ঠিক নেই, আজ প্রায় বাহান্নো বৎসর আগে একদিন ভোরে, নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে স্নান করতে এসে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক মহাপ্রাণ বৈশ্য পরিত্যক্ত অবস্থায়, ভাগ্যক্রমে শিয়াল-কুকুরের পেটে যাবার আগেই আমায় কুড়িয়ে পান, তারপর ঘরে নিয়ে মানুষ করেন,—এই আমার আদি পরিচয়। এই এক কথায় আমায় স্তম্ভিত করিয়া দিল।

কোথা হইতে কোথা গিয়া পড়িলাম, এ কি ব্যাপার ঘটিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিলাম আরও একটা কিছু,—আমার অন্তরে এতটা শ্রদ্ধা, এতটা ভক্তি এই যোগী অবধূতের প্রতি এতটা আকর্ষণ যেন এই একটি মুহূর্ত্তে সবটুকুই উবিয়া গেল—মনে হইল যেন এঁর সঙ্গে দেখা না হইলেই ভাল ছিল। আরও কত কথাই মনে উঠিতে লাগিল, সে-সব কথায় আর কাজ নাই। আশ্চর্য্য আমার মন,—এই মনেই আমি ইহাকে মহাপুরুষ ভাবিয়া চিরজীবন ইহার সেবা করিবার অধিকার পাইলে ধন্য হইব মনে করিয়াছিলাম, হায় হায়!

যাহা হউক আজ এখানে আমার জীবনের এক মহা সুযোগ আসিয়াছিল; রাত্রে আজ অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তাঁহার বাল্যজীবনের খানিকটা উদ্ঘাটিত করিলেন। যদিও জীবনকথা সম্পূর্ণ করিলেন না। যেটুকু বলিলেন তাহাতেই বুঝিলাম, এই মহাপুরুষ কেন নিজেকে এই হিন্দু সমাজের বাহিরের একজন গণ্য করিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিতেছেন। প্রারব্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বে আরব্ধ কর্ম্ম, উহা ক্ষয় হইলেই জীবনমরণের চাকা বন্ধ হইবে, তখনই দেহত্যাগ করিবেন।

আজ যাহা শুনিলাম তাঁহার মুখে, সেই সরল সহজ এমনই অদ্ভুত মৃদু মিষ্ট ভাষায় কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইলাম। শেষে সস্নেহে বলিলেন, আজ এই পর্য্যন্তই রইলো, বেশীটা বাকী রইলো—তবে এটুকু বলতে পারি যদি তুমি সবটা শোনো তাহলে তোমার কিছু লাভ হতে পারে আর এটি আমি সত্য বলেই নিশ্চিত বিশ্বাস করি। এ পর্য্যন্ত কেউ আমার পূর্ব্বাশ্রমের কোন প্রশ্নই করেনি। আজ এতদিন পরে যখন একজন আমায় ঐ প্রশ্ন করলে, তখন এর মধ্যে একটা ভগবৎ অভিপ্রায় আছে

মনে কবেই আমার সব কথা বলতে একটা ইচ্ছাও হযেচে,—আমি ক্রমে ক্রমে সব কথাই বলবো। অন্ততঃ একজনও জেনে বাখুক আমাব মত একজনেব জীবনে যা যা ঘটছে। এইটি তাঁবই ইচ্ছা।

তাঁব জন্ম ও জীবনকথা এমনই অদ্ভুত, বিশেষতঃ আবাল্য তাঁব জীবনেব গতি বিচিত্র, বিস্ময়কব ব্যাপাব এমন কখনও কোথাও শুনি নাই। কিন্তু তখনকাব কালে তো সমাজেব গোড়া এতটা শিথিল হয নাই। প্রথম দফাতেই আমায প্রতিক্ষণে যে একটা খোঁচা দিতে লাগিল, সেই পৌবাণিক কাহিনীব পুনবাবৃত্তি চিবদিন ধবিযা ভাবতে চলিতেছে। নিদ্রা গেলাম না, সাবাবাত কথাতেই কাটিল।

যাহা হউক পবদিন ভোবে আমবা ঐ স্থান হইতে হাঁটিতে আবম্ভ কবিলাম। পথে কোন কথাই হইল না। যেটুকু জীবনকথা শুনিযাছিলাম তাহাব প্রভাব সম্পূর্ণ ক্রিযা কবিতে লাগিল আমাব মনে। দ্বিপ্রহবে আমবা একটি নির্জ্জন গ্রামপ্রান্তস্থ মন্দিবপ্রাঙ্গণে আশ্রয লইলাম। সেই স্থানটিব দৃশ্য মধুব, নিকটেই নদী ছিল গঙ্গা, বিস্তৃত চবেব উপবেই খানিকটা গমেব ক্ষেত্র, তাব মধ্যে সরু পথ, জল পর্যন্ত চলিযা গিযাছে। ভাবি সুন্দব লাগিল, এইখানেই আজ আমাদেব আশ্রয।

তিনি আজ তাঁহাব জীবনকথাব আবও অনেকটাই প্রকাশ কবিলেন এবং আমাব প্রতি স্নেহবশে তিনি এমন ভাবেই বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল তিনি কিছুই গোপন কবিলেন না, এক-একটি বিষয যখন সম্পূর্ণ কবিতেন শুনিযা আমায যেন বিস্ময়ে অভিভূত কবিযা ফেলিত।

আজ বাত্রেও অবশ্য সব কথা সম্পূর্ণ হইল না, কিন্তু আমাদেব উভযের কেহই নিদ্রায় অভিভূত হইলাম না। এইভাবেই ক্রমে ক্রমে আমাব বিলুপ্ত শ্রদ্ধাভক্তি আবাব ফিবিযা আসিল। সত্যসত্যই আমি কৃতার্থ হইলাম। উহা শেষে একটা এমনই প্রবল আকর্ষণে পরিণত হইল যে আমি তাঁহাকে ছাড়িতে পাবিলাম না।

ইহার মধ্যে আজ বিশেষ এমনই এক প্রেমের কথা হইল যাহাতে আমাব এই ধাবণা বদ্ধমূল হইযাছে যে যেভাবে জন্ম হোক, যাহার মধ্যে এই অপার্থিব প্রেম ও সংযম সম্ভব হইল, ইনি কখনই সামান্য নহেন। পার্ব্বতী নামে একটি গোযালাব মেযেকে ইনি বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন, সঙ্গে খেলা করিযাছিলেন। সেই বালিকার পরবর্ত্তী জীবনেব সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবে এই অবধূতের জীবন জড়িত হয়, তার পর তাহাকে কেমন করিয়া কর্ম্ম ও সাধনের ভিতব দিয়া তাহাবই অভীষ্টপথে আনিয়া উন্নত অবস্থায় তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এইটাই আমার মধ্যে বিশেষ গভীরভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল বহুকাল। আমার চক্ষের সম্মুখেই যেন সব ঘটিয়াছে।

একাংশ এটা, অপর অংশে এক অদ্ভুত দৈবযন্ত্রের কথা আছে। এই অমূল্য দৈবযন্ত্রটি

তিব্বতের এক মঠে তারা-সিদ্ধি-সাধনারত এক লামার হস্তচ্যুত হইয়া শেষে এক ভৈরবের হাতে আসিয়া পড়ে। সেই সূত্রে কিভাবে উহা অবধূতের মধ্যবর্ত্তিতায় যথাস্থানে অধিকারী সাধকের হস্তগত হয় বিস্ময়কর কথা। তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি শুনিয়া মনে হইল হরি যাকে রাখেন*, তাহাকে এইভাবেই তো রাখেন, তাহার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর পাই নাই। তখনই বুঝিয়াছিলাম ইনি মহাপুরুষ, প্রচ্ছন্নভাবে লোকসমাজের অগোচরেই নিজ কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছেন,—কাহাকেও ধরা দিবেন না। নিজ ইচ্ছা না থাকিলে কেহই তাঁহার পরিচয় পাইবেও না।

সত্য মহাভাগ্যেই ইঁহার সঙ্গ মিলিয়াছে, এই কথাই মনে আমার সর্ব্বক্ষণ ক্রিয়া করিয়াছে, যতকাল ইঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছি। এতটা দীর্ঘকাল আর কোন সাধুসঙ্গ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার সাধনতত্ত্ব মধ্যে মধ্যে যখন বলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া দেখাইতেন—এত সহজভাবেই প্রয়োগ করিতেন দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতাম। পথে একদিন এক ভৈরবের ব্যবহারে আমায় বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া বলিতেছেন, খুব অল্প বয়সে, সাত-আট বৎসরের যখন আমি, তখন এক ভৈরবের পাল্লায় পড়েছিলাম, তাঁর সিদ্ধির সহায়তা করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ও আর একজনের সিদ্ধির সহায় হয়ে গেলাম, সেকথা শুনলে তুমি চমকে উঠবে। একজনের সিদ্ধির পাটে আর একজন বসে গেল স্বচক্ষে ঐ অবস্থায় দেখেছি। পরে তিনি সবিস্তারে বলিলেন, কেমন ভাবে তখন সেই ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে এক তান্ত্রিক ভৈরবের কাছে তাঁহাকে বিক্রয় করা হইয়াছিল, তাঁহার সিদ্ধির দিন ঘোর অমাবস্যার রাতে তাঁহাকে গঙ্গায় স্নান করাইতে লইয়া গেলে কেমন করিয়া সেই ভৈরব জলে নামিয়াই পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া পড়েন, তাঁর চেলা আসিয়া তাঁহাকে টানাহেঁচড়া করিয়া তুলিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তারপর সেই পূর্ণ উদ্যোগসাধন ও সিদ্ধির ক্ষেত্রে সকল কিছুই প্রস্তুত, গিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই বিচিত্র ঘটনা পর পর এমন সহজেই ঐ অবস্থা হইতে তাঁহার মুক্তির কথা পর্য্যন্ত বলিয়া শেষে বলিলেন যে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা সব তাঁহার শিশু ও বাল্যজীবনে ঘটিয়া গিয়াছে, মহামায়ার এই সংসারে কত মানুষের কত প্রকার কর্ম্মের কত ভাবের পরিণাম দেখেছি যার প্রভাবে আমার পক্ষে নারীপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে সংসার সৃষ্টি করবার সকল সূত্রই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ঐ শিশুকাল হতেই আমার মনে হতো এখানে সবাই, সাধারণ মানুষের অনেক বেশীর ভাগ মানুষ সোজা পথে যাবে না, বাঁকা পথটাই তারা সোজা পথ বলেই ধরে নিয়েচে, সেই ভাবেই চলচে—তেমনি আঘাতও পাচ্ছে, যখন আঘাত পাচ্ছে তখন মনে করচে এই রকমই হয় বুঝি সবার,—সবার যখন হয় তখন আমার হলে আর কি করা যাবে! এমনি সারাজীবনই

* অবধূতের জন্ম ও জীবনের কথা, তাঁর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবন-রহস্য "হরি যাকে রাখেন" নামে গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত আছে।

কাটাচ্ছে ঐ ধারায়। শুধু যে বড় বড় যাঁরা তাঁরাই ঐ বিপথে যাচ্চেন তা নয়, ছোট বয়সের বালক-বালিকারাও তাদের গুরুজনদের দেখাদেখি ঠিক ঐভাবেই চলচে, ঐ ছক-কাটা পথেই চলছে। কেবল আমার পালক পিতা, তাঁর একটি অতি বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল,—অত বড় সংসারের মধ্যে এই দুজন মাত্র সোজা চলতেন দেখেছি। সেইজন্য তাঁর মনের শক্তি ও শান্তিও ছিল সেই রকম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছোট ছোট বালকেরাও কি ভাবে বিপথে চলচে, যদি একটু বিশেষ ভাবে বলেন যা দেখেছেন, তা হলে বুঝতে পারি।

এ তো খুবই সহজ। ধরো ঐ সত্য আর মিথ্যায় ভেদ, চুরি, তারপর নির্ব্বিচারে সকলরকম ভোগ, সবই তো ঐ বালক অবস্থা থেকেই আরম্ভ হচ্চে। এর প্রথম ঐ মিথ্যা কথা বলা পাপ বা অন্যায়, এটা গুরুজনেরই কথাতে বা বইয়ে পড়ে শিখলে, কিন্তু তাঁদেরই ঐ মিথ্যা কথা মিথ্যা ব্যবহার দেখে সে মনে মনে বুঝে নেয় যে বলবার সময় বলতে হয় ঐ কথাটা, কিন্তু কাজে করতে দোষ নেই, অমন সবাই করে। সেও যাকে উপদেশ দেবে, বলবে,—মিথ্যা কথা কখনো বলতে নেই, পাপ হয়, তারপর কাজের সময় অতি সহজভাবেই মিথ্যাই বলবে, এইভাবে স্বভাবগত হয়ে গিয়েচে ওটা, তেমনি চুরি প্রভৃতি ঐভাবেই চলচে, একজন আর একজনকে প্রবঞ্চনার ব্যাপারে। এখন আর এতে লজ্জাসরম কিছুই নেই, যেন মুক্তক্ষেত্র তৈরী হয়ে গিয়েচে সমাজময়।

বাইরে বাইরে এই ভেল, নকল ভাবেই ভর্ত্তি এই সংসারে একজনকে চতুর করে দেয় অবস্থাগতিকে। মানুষ ঠকতে ঠকতে কেউ কেউ সচেতন হয় যাতে আর না ঠকে, তাই করে অপরকেও সাবধান করে দেয়, আবার কেউ কেউ ঠিক ঐ ভাবটা ধরে নিয়ে মানুষকে ঠকাতে আরম্ভ করে দিল, ঠগের দলেই ভিঁড়লো। এও তো শিশু বা বাল্যকাল থেকেই চলে।

তারপর আর একদিনের কথা,—সেদিন এই কথাই হইতেছিল যে, অপূর্ব্ব পরিচিত কাকেও দেখিয়া মনে হয় যেন কতকালের পরিচিত, এমন কি মনে হয় অতীব আপন,—এক-একজনকে দেখে স্বতঃই শ্রদ্ধার উদয় হয়, আর একজনকে দেখে মনটায় যেন গ্লানি একটা আসে। আমি বলিলাম, আপনাকে দেখেই প্রথমে আমার মনে হয়েছিল যেন অতি পরিচিত মুখ, আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোল যেন কত আপন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমার গুরু অবধূত বৃন্দাবনে, প্রথমে আমায় দেখেই তাঁর অধ্যাত্ম শক্তিবলেই চিনেছিলেন যে আমি তাঁরই সন্তান এবং তাঁর কাজেই এসেচি। তার আগে আমি তো জানতেই পারিনি। কিন্তু তাঁর দেখা পেয়েই বুঝেছিলাম যে আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধির সময় এসেছে। তারপর ইষ্টলাভের পর আর তিনি দেহ রাখতে পারলেন না। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম যে তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, আমায় আশ্রয় দেওয়াই তাঁর শেষ কর্ম্ম। এমন

চমৎকার তাঁর প্রকৃতি ছিল যেন গুরু রামানন্দ স্বয়ং শরীর ধারণ করে আবার এসেছেন। সিদ্ধযোগী তিনি ছিলেন, তাঁর অষ্টসিদ্ধি ছিল। কিন্তু কখনও বিভূতি অকারণে তো নয়ই, যথার্থ কোন কারণেও প্রকাশ কবেননি। আমাকেও সাবধান করতে ক্রুটি করেননি পাছে সাধন অবস্থায় স্খলন হয়। আমায় প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিলেন যোগবিভূতি ব্যবহারের পরিণাম।

বিবরণটা জানিতে আমার কৌতুহল দেখিয়া তিনি তখনই সরলভাবেই বলিলেন।

তাই তো, ঐ বৃন্দাবনেই থাকার সময়ে, তখন আমি সাধনে ডুবে আছি তাঁব কাছে। আমাব প্রত্যেক অবস্থা তিনি লক্ষ্য করচেন, যেমন যেমন আমাব একটিব পর একটি দ্বার খুলচে। আবার দেখচেন, কেমন কবে আমার সিদ্ধিলাভ হবে, প্রতিটি পথের খুঁটিনাটি লক্ষ্য কবে যেখানে নিজেই ঠিক চলতে পারচি সেখানে আনন্দে অধীর হয়ে দেখচেন। যেখানে একটি ধোঁকায় পড়েছি, সেখানে উৎসাহ দিচ্চেন, তাঁরও ঐ বকমটা হয়েছিল এই সব বলে যেখানে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি সেখানে শক্তি যুগিয়ে দিচ্চেন; এইভাবে তখন দিনরাত কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে কিছুই জানতে পারতাম না।

এমন সময়ে তাঁরই গুরুভাই একজন অনেক দিন পর তাঁর কাছে এলেন, কিছুদিন ছিলেনও তাঁর আশ্রমে। আমায় বারণ করলেন তাঁর সঙ্গে কথা কইতে, আর তাঁকে বললেন, ওর এখন বাকসংযম ব্রত চলচে—সেই জন্য ওব কথা বন্ধ। বাস্তবিকই তখন আমার কথা একরকম বন্ধই ছিল, কথা কইতে প্রবৃত্তিই হোতো না।

তখন ঐ বৃন্দাবনে যাত্রী নিয়ে এক দল মথুরার পাণ্ডা মধ্যে মধ্যে আসতো, তার মধ্যে একজন ছিল বড়লোক, তার একটি বিধবা মেয়ে, তাদের মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসতে দেখতাম। সেই মেয়েটির বাপ একটু সাধুসন্ন্যাসী-ভক্ত, সাধুসন্ন্যাসী-ঘেঁষা মানুষ বলে সবাই তাকে জানতো। তার এইরকম আশা ছিল, কোন সাধুমহাত্মা যদি তাকে কৃপা করেন তাহলে কৃতার্থ হবে। কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সাধনভজন করবে, মেয়েটির তাই ইচ্ছা, কিন্তু তার বাপ তা নয়। তার মতলব অন্য,—কিছু বেশী দান-খয়রাৎ করে সাধুসন্ন্যাসীর কৃপায় যদি তার ভগবান লাভ হয়ে যায় কিছু না করে এই ছিল তার উদ্দেশ্য। সে ধনবান ছিল, সাধুদের নানারকম ভোগ দিয়ে, অনেক খরচপত্র করে তাদের আকর্ষণ করতেই তার চেষ্টা ছিল। আমাদের আশ্রমে আমার গুরু অবধূতের কাছেই অনেকবার এসেছে। অনেক কিছু উপহার এনেচে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে বিলিয়ে দিতেন, কিছু রাখতেন না ঘরে। তাকে দীক্ষা তো দেননি বরং বলতেন ভগবানের কথা সব সময়ে স্মরণ করলেই তাঁর কৃপা হবে, তাঁর কৃপা পেতে গেলে তাঁকেই ডাকতে হবে তাঁকেই জানাতে হবে। নাহলে কেউ তাঁকে পাইয়ে দিতে পারবে না। ভগবান পেতে গেলে তাঁর কৃপা না হলে রাজার ঐশ্বর্য্য কখনও তাঁকে এনে

দিতে পারে না।

সেদিন এসেছে, মেয়েটিও সঙ্গে আছে। সেই গুরুভায়ের সামনে সে সেদিন বলছে, আমি মাত্র একবার তাঁর শুধু মূর্ত্তিটি দেখবো, এইটুকু হলেই হবে, আপনি একবার তাঁর মূর্ত্তি আমায় দেখিয়ে দিন। ঐ গুরুভাইটির চেহারাটি খুব চিত্তাকর্ষক যদিও তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর হয়েছিল। কিছু সিদ্ধিও ছিল। আমার গুরুর মূর্ত্তি অতি সাধারণ, যেন একটি নগণ্য মনুষ্য, ধরা যাবে না যে তাঁর মধ্যে কত বড ঐশ্বর্য্য রয়েচে। মোট কথা তিনি ধরা না দিলে তাঁকে ধরবার যো নেই।

আমি বলিলাম, ঠিক আপনারই মত। তাঁরা দুজনে একত্র থাকলে, তিনি বলিলেন—আমার গুরুকে লোকে মনে করবে যেন এঁরই তল্পিদার। গুরুভাই তখন সেখানে ছিলেন, তাঁর সামনেই। লোকটার কথাবার্ত্তা শুনে তিনি নিজে থেকেই তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন বলে তাকে একটু প্রশ্রয় দিলেন অর্থাৎ ভগবানমূর্ত্তি দেখানো সম্ভব হবে, সেই ভাবেই তার সঙ্গে কথা কইলেন। গুরুদেব তাকে বললেন, তুমি ওকে চেনো না ?— আমি চিনি, ওর সোজা পথে চলবার বুদ্ধি নেই, ওর মতলব ধন দান করে সাধুকে আকর্ষণ করে তাদের দ্বারা ও ভগবানের কৃপা লাভ করবে, ও নিজে কিছু করবে না। আমি সেই জন্য কোন সময়েই তাকে প্রশ্রয় দিইনি। ওর বুদ্ধিটি যদি সোজা করতে পারো বরং সেই চেষ্টা করে দেখতে পারো, আমি ছেড়ে দিয়েছি।

তাঁর কথা শুনে গুরুভাই কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁরই আশ্রমে বসে সেখান থেকেই তিনি সেই কেশবলালকে ভরসা দিলেন যে ভগবানের মূর্ত্তি দেখাবেন তবে তাকে কিছু টাকা খরচ করতে হবে আর এখানে হবে না, তার বাড়ীতে মথুরায় ঐ দর্শন হবে। সে তো হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। সে তাঁকে নিয়ে তখনই মথুরায় তাঁর বাড়িতে চলে গেল। তারপর যা ঘটলো তা শোনা গেল লোকমুখে এক মাস পর। আর সেই গুরুভাই প্রথমে একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে অসুস্থ হয়ে আমাদের আশ্রমেই ফিরে এলেন। অল্পদিনেই মারা গেলেন, শেষে বললেন, আমার মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত।

অবধূত অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন কতক্ষণ, তারপর বলিলেন,—মহামায়ার সংসারে সদসৎ মিশিয়ে এমন ভাবেই রয়েচে, কার সাধ্য তাকে চিনে নিয়ে ইষ্টলাভ করবে। তারপর ধর্ম্মজগতে,—ঐ যে সিদ্ধির পর বিভূতি,—যোগসিদ্ধির ফলে যে বিভূতি তার ব্যবহার,— একটি অতীব জটিল বিষয়। যার হয়েচে সে-ই জানে, সাধারণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তার।

আমি তখন একটা কথা ভাবিতেছিলাম, এই যে সাধারণ একটি ভিক্ষুকের মত চেহারা, যার রূপের মধ্যে কোন আকর্ষণ নেই, বাইরে থেকে কে বুঝবে যে এঁর মধ্যে কি বস্তু আছে —এ একটা কত বড় বিস্ময় !

তারপর একদিন, পথের ধাবে এক বৃক্ষতল-আশ্রয়ে বসিয়া তাঁহারই জীবনকথাই হইতেছিল। অবধূত ও পার্ব্বতীর বিষয়ে আমি একটু বিশেষ কৌতূহলী হইয়াই একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারি নাই। সেটা আমাদের সংসারাসক্তির অনুকূল কথা,—যদিও তার উত্তবমীমাংসাটা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধেই সার্থক হইয়াছিল ,—সেইজন্য সেটাও এখানে বলা ভালো।

আমি এই কথাটি বলিলাম যে, আমাব ভিতর এই কথাটাই এখন কেবল জানতে চায়, —কেন অকালে পার্ব্বতাব দেহত্যাগ ঘটলো, তাকে আপনি তো ভালই বাসতেন, সেই ভালবাসা যখন উভয়তই প্রবল তখন আপনি তাব সঙ্গে থেকে তাকে সুখী করলে কি ক্ষতি হোতো ?

অবধূত বলিলেন, একে তো আমার ঐভাবে জন্ম, তাব উপব পৃথিবীর মধ্যে এই ধর্ম্ম —গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিষয় ধর্ম্ম নীতি, তাব বাইরে জন্মানো, যেটা প্রায় সব সমাজ নিয়মেব ব্যতিক্রম, তা যদি না ঘটতো, অর্থাৎ পিতামাতাব ধর্ম্ম-সংস্কারেব ফলে যদি আমার জন্ম হোতো এখানকাব সমাজেব প্রচলিত নিয়মে—তা হলে হয়তো আমি পার্ব্বতীর কাছ থেকে এতটা পৃথক থাকতেই পারতাম না। আমাব প্রবৃত্তি ও তাব প্রবৃত্তিতে অতি সহজেই সমতা হয়ে যেতো—তাব ফলে যা ঘটতো তা সহজেই তো বুঝতেই পারো।

আমি বলিলাম, যে অধ্যাত্মশক্তিতে আপনি তাকে ঠিক তার জায়গায় রাখতে পেরে-ছিলেন সেই শক্তিতেই আপনিও তাব কাছে থাকতে তো পারতেন ?

তিনি বলিলেন, তা যে হবার নয়,—আমার স্রষ্টা কেন আমাকে সমাজের বাইরে গার্হস্থ্যনীতি, ব্যবহারিক দিক থেকেও সমাজ ধর্ম্মের বাইবে সৃষ্টি কবলেন, পালন করলেন, প্রতি পদে রক্ষা করে আমায় ববাবরই চালিয়ে এলেন যে উদ্দেশ্যে, আমি কেমন করে তার বিরুদ্ধে যাবো ? আমাব সংস্কার যে সহজে সমাজ-ধর্ম্মেব বিপরীত ভাবে গঠিত, সেটা আমি ভুলবো কি করে ?

আমি কিন্তু তবুও বলিলাম, মাত্র ঐ জন্মসূত্র ধরেই তো বিরুদ্ধ বলছেন ?

তিনি বলিলেন, তাই তো বলচি, আমি সুজন্মা হলে সমাজের ভিতরেই তো রইলাম, এখানকার সমাজের সকল দুর্ব্বলতার আসামী হয়েই তো থাকতাম, ফলে পার্ব্বতী যা চাইছিল আমিও সহজেই স্খলিত হয়ে তাই হয়ে যেতাম। এ অবস্থায় সমাজভয় থাকে না, আমাদেরও তাই হোতো। সৃষ্টি করতাম একটা সংসার, সঙ্কর-বর্ণের প্রসার হোতো, নয় কি ? অথচ সে হিন্দু বিধবা, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ তার সমাজে। আমি কুমার ব্রহ্মচারী, ভ্রষ্ট হওয়া আমার স্বভাব ও নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ।

আমি বলিলাম, আপনি সমাজদ্রোহী হয়ে গিয়েছেন, সমাজের বাইরে জন্মেছেন বলে এটা সত্য, আরও বিশেষ করে ঐ ভাবটাকে ঢালের মতই ব্যবহার করেছেন আত্মরক্ষায়।

ভারি চমৎকার,—আপনি সমাজে থাকলেও এমনই মহৎ হতেন—

বোকা ছেলে, অধ্যাত্মপথে না এসে সংসার বা সমাজের সঙ্গে থাকলে এই সমাজ-দ্রোহিতার বিকাশ অন্যভাবেই হোতো, কালাপাহাড়ের যা হয়েছিল,—দ্বিতীয় কালাপাহাড় হয়ে সমাজ ধ্বংসের কাজে লাগতাম। কিন্তু আমি সেজন্য তো জন্মাইনি, কাজেই সে কাজ জগদম্বা অন্য কারো দ্বারা করাবেন, আমাকে দিয়ে নয়।

আমি ঠিক সংসারে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের মত থাকার কথা বলচি না। যেমন ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেইভাবেই থাকার কথা মনে করেই বলচি।

তিনি বলিলেন, পার্ব্বতীর তখনকার যে ভাবের টান তা ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী ঠাকুরাণীর কোন সময়েই ছিল না। হাজার হোক তাদের (পার্ব্বতীর) বাল্যজীবন, তাদের সংসার ও ব্যবহার অন্যরকম, স্থূল সভ্যতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। তাই পার্ব্বতীর প্রথমকার টানটা বড় বিষম টান—সর্ব্ব ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির টান, এর গভীরতার সীমা নেই। এই রকম টানেই সৃষ্টি হয়ে যায়,—তা থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। একটা বিশেষ ভগবৎ-ইচ্ছা তাঁরই কোন প্রবল অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই অব্যর্থ ঐ টান ঘোরাতে পারা গেলো। সাধারণ তান্ত্রিক হোক বৈদিক হোক, যোগধর্ম্মাবলম্বী হোক কারো রক্ষা নেই ঐ ভাবের আকর্ষণের প্রভাব থেকে। ঐ অবস্থায় তাকে কাছে রাখা, তার সঙ্গে থাকা, তার অভিপ্রায়ানুসারে তারই পথে যাওয়া আমার পক্ষে কি সম্ভব? দুটি কারণ ছিল যা আমার পথে তাকে টানবার পক্ষে অনুকূল। তার একটি এই যে আমি সমাজের কেউ নয়, সমাজের সঙ্গে ব্যবহার অধিকার নেই, এই সংস্কার আমার ভিতর এতটাই প্রবল ছিল যে তাইতেই আমি তার ইচ্ছায় ভেসে যেতে পারিনি। আর দ্বিতীয়,—

আমি বাধা দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, দ্বিতীয় কারণ পরেই শুনবো, এখন আমার আর একটি সংশয় মিটিয়ে দিন। আপনি তো সিদ্ধযোগী, স্বরূপ দর্শন করেছেন, আত্মস্বরূপে থাকবার অধিকারী, আপনার কি বাধা ছিল ওর কাছে থাকতে? আপনার সমাজের ভিতর থাকা আর সমাজের বাইরে থাকার কোনো মানে হয় কি?

এই দেখ, তোমার মুখে আবার ঐ কথা! শুনলে কি তা হলে? আমি স্বরূপে কি নিত্যকাল থাকতে পারি, এই দেহ আশ্রয় করে? দেহ আশ্রয় মানে কি বুঝতে পারোনি? দেহ, দেহের প্রয়োজন, তারপর প্রাণের ক্রিয়া ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহং এই সবই রয়েচে। রয়েচে মানে তার কাজও তো রয়েচে। এই সব নিয়েই তো জগৎ, দেহটাই তো সংসার! কাজেই যতক্ষণ আমি এই সব নিয়ে আছি ততক্ষণ জগতে বা সংসারেই আছি, আর যখন যোগবলে এসব থেকে গুটিয়ে আমি আত্মস্বরূপে থাকচি তখন জগৎ নেই শুধু, আমি সমাধিতে স্বরূপেই রয়েছি। তার পর এই দেহ রয়েছে যে, আবার আবার নামতে হচ্ছে, আমি তুমি, মন ইন্দ্রিয় নিয়ে ক্রিয়া চলচে যে রাজ্যে, সেইখানে নেমে জগতের সঙ্গে

সম্বন্ধ রাখচি, সমাজের সঙ্গে।

সেই স্বরূপ অনুভূতি আমার সঙ্গেই রয়েচে বটে ,তাইতে আমি সংসারে সবার সঙ্গে ব্যবহারে এক হতে পারচি না। একটি ভেদ আমাতে ও তোমাতে থেকেই যাচ্চে—কারণ তোমার স্বরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটেনি। কাজেই এ কথাটি ঠিক তো যে, তুমি স্বরূপের স্বাদ, যে স্বাদ পেলে এখানে আসা সার্থক সে স্বাদ তুমি পাওনি আমি পেয়েছি ; তাই তো তফাৎ ? স্বরূপে আমরা এক, কিন্তু স্বরূপচ্যুত হলেই সবাই ভিন্ন। কাজেই আমার পক্ষে তখন পার্ব্বতীর মনোমত হওয়া কি সম্ভব ? তবে যতক্ষণ পার্ব্বতীর স্বরূপ উপলব্ধির অবস্থা থাকতো ততক্ষণ কোনো ভয় নেই, সেই অবস্থা থেকে নেমে মন ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে এলেই তার পক্ষে ভয়ের কথা , সে ভয়টা সৃষ্টিমুখী হবার ভয় যেখানে সংসারের সবাই ঐটাই আঁকড়ে ধরে আছে। তাদের ও ছাড়া সুখের আর কোন জ্ঞানই নেই, কাজেই তার কল্যাণের জন্যই আমায় একটু কঠিন হতে হয়েছিল।

আচ্ছা পার্ব্বতীর স্বরূপ দর্শন হয়েছিল ?

দেহত্যাগের সময়েই হয়েছিল, তবে সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ,—বলেই তিনি স্থির হইয়া গেলেন। আমি আর কোন কথাই কইলাম না—কারণ আমিও স্থির হইয়া গেলাম।

কতক্ষণ পর আর আমার কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তিই হইল না, তিনি নিজেই বলিলেন, —দ্বিতীয় কারণ শুনলে না তো ?

আমার আর কোন প্রশ্ন নেই, সব উত্তর পেয়েছি।

তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ঠিক তাই কি ? পার্ব্বতীর উপর তোমার স্নেহ তো বড় কম নেই,—পার্ব্বতীর সম্বন্ধে কি তোমার আর কিছু জানবার নেই ?

সত্যই, ঠিক যেন প্রশ্নটা তিনি ভিতর থেকে টেনেই বার করলেন—পার্ব্বতীর কি গতি হোলো ? বলিলাম, সত্যই ঐটি আমার গুহ্য মনের কথা, জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছিল না, যদি অবান্তর ভেবে আপনি অপ্রসন্ন হন। যখন আপনি প্রসন্ন আছেন তখন নিশ্চয়ই ঐ মীমাংসা না হলে আমার শান্তি নেই। তিনি বলিলেন, তার গতি তার সাধনার অনুকূল, সার্থক গতিই হয়েছে তার।

কি ?

তিনি নিজের বুকে হাত দিয়াই দেখাইলেন,—এইখানে এর মধ্যেই তার সাযুজ্য লাভ হয়েছে, আমার মধ্যেই তার অস্তিত্ব লোপ। আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি দেখে আবার বলিলেন, সে তো আমাকেই ইষ্ট করেছিল, তার আর গতি কি হবে ? আমার মধ্যে ঝাঁপিয়ে এলো, তাকে আমার মধ্যেই পুরে ফেললাম, সব শান্তি।

আমি স্তম্ভিত। অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব পতিলাভ এই পার্ব্বতীর !

তিনি স্থির হইয়াই গিয়াছিলেন, এখন আবাব বলিলেন,—স্বামী-স্ত্রী অথবা নরনারীর চরম গতি, প্রেমের জন্ম হলেই, দুইই এক হয়ে যায়। তন্ত্রের সর্ব্বশেষ কথা এইটিই, ভেদ ততক্ষণই যতক্ষণ ঐ প্রেমটি না জন্মায়।

আমি যেন কতকটা বিজ্ঞের মতই বলিয়া গেলাম, আপনাদের মধ্যে যা হোলো এ একটা আশ্চর্য ঘটনা, সচরাচর ঘটে না, এমনই ঘটনা, চণ্ডীদাসের জীবনে দেখা গিয়েছিল আর এই আপনাদের মধ্যে ঘটলো!

শুনিয়াই তিনি বলিলেন, পাগল নাকি! এই দুটি মাত্র ব্যাপার, আর এই বিপুল সৃষ্টিটা পড়ে রয়েচে অনন্ত কাল ধরে!

আমি বলিলাম, এরকমটা কি সচরাচর ঘটে,—আপনি বলেন?

আমি বলি, আজ প্রকৃতিব সৃষ্টিতে কেবলই রং বদলই হচ্চে তোমরা দেখচো? সমাজেই তো ঘটচে এসব নিত্যকাল ধবে।

আমি বলিলাম, এই ভাবত আজব দেশ, এখানে এই আত্মা, ঈশ্বর, তার সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কত কত গভীর—

তিনি বাধা দিয়া বলিতেছেন, জ্ঞান না হলে ঐরকমই বোধ হয়, শুধু ভারত কেন, ধরণীর গর্ভে যত দেশ আছে সবখানেই প্রেমের খেলা সমানেই চলচে। শুধু ভারত নিয়েই তাঁর সৃষ্টি? তুমি ভারতে জন্মেচ বলেই ভাবতেব জযগান ভাল লাগে। ওগো অত সঙ্কীর্ণ মনে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ হবে কি করে?

জগৎসমাজের মধ্যে নিত্য নিত্য কত স্বামী-স্ত্রী, নায়ক-নায়িকার দেহত্যাগ ঘটচে, তার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত যেখানে ভালবাসার আঁট আছে, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে নরনারীর মধ্যে যথার্থ প্রেমের সম্বন্ধ ঘটেচে,—সেখানেও ঐভাবে আত্মসাতের পালাই চলচে। তবে একথা সত্য যে ঐ প্রেম দুর্ল্ভ বস্তু, যেখানে সত্যসত্যই মনেপ্রাণে দুটি এক হতে পেরেচে প্রেমেব প্রভাবে,—যেখানে অবাধ হতে পেরেচে ঐ প্রেমের সম্বন্ধ, সেইখানেই ঐরকম পরিণতি। তবে ভাবত ঐ তত্ত্বটি হয়তো আগেই জানতে পেরেচে। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এটা তো জগতের সর্ব্বত্র, যেমন এখানেও, তেমনি গুহ্য হয়েই আছে। প্রকৃতি বলো, ভগবান বলো, স্রষ্টা পাতা ধাতা নিহন্তা যা কিছুই বল না কেন,—তাঁর নিয়ম সর্ব্বত্র বলবৎ সাধারণ জীবকোটির মধ্যে। এগুলি বিশেষ ব্যাপার, অসাধারণ বলে গুহ্য হয়ে আছে। সাধারণ মানুষে উদরান্ন, তারপর ভোগতৃষার পিছনেই তো ছুটছে,—আপনার জনটুকু নিয়েই কারবার, তাদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বাঁধা; বাকী সবাই পর। শত্রু-মিত্র ছাড়া ভাবতেই পারে না তারা এখানে,—প্রেমের স্থান কোথা? যাহা কাম, তাহা প্রেম নহি।

সমাজের বাঁধন মানে না যে, হয় সে একটি বড় কাজের জন্যই এসেছে না, হয় নিজের

অধোগতিকে দ্রুত করে এখানকার কাজ শেষ করে চলে যেতে চাইচে। তিনি একটু হাসিয়া যেন কি স্মরণ করিলেন, তারপর বলিলেন, বিবাহিত কিম্বা অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যেও প্রীতি জন্মাতে কিছু বাধা নেই এই প্রকৃতির রাজ্যে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আমি জীবনের উদ্দেশ্যেরই অনেক প্রভেদই দেখেছি, আবার অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও নির্ম্মল প্রেমের অতি উচ্চ দৃষ্টান্তও আছে। আমার পালক পিতা ও মাতার মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ ছিল মনোভাবের, এই আমাকে নিয়েই, কিন্তু কখনো তিনি মনবুদ্ধির অস্থিরতার পরিচয় দেননি, এক দিনের জন্য তাঁর ভালবাসার অভাব দেখিনি। বিবাহিত স্ত্রী হলেই হয় না, যে পুরুষ ও যে নারী আত্মভাবেই এক হয়, তাদের প্রেমের প্রভাবে সমাজ সংসারের সকল বাঁধন খসে যায় যেমন চণ্ডীদাস ও রামীর হয়েছিল। তার মধ্যে যেই কেন আগে দেহত্যাগ করুক না, ঠিকই তার অপরার্দ্ধের আত্মায় যুক্ত হয়ে যায়। তার অন্য গতি নেই যে। এ তত্ত্ব অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ, খুব কম যোগী এমন কি সিদ্ধ যোগীদের মধ্যেও খুব অল্পজনেরই এ তত্ত্ব জানা আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এঁদের কি ভজন-সাধন কিছু করতে হয়, যার ফলে ঐ দুর্লভ প্রেমের অধিকারী হন তাঁরা?

অবধূত অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়নের কোণে অশ্রু দেখা দিল, ক্রমে টপ্ টপ্ করিয়াই ঝরিতে লাগিল। কতক্ষণ পর বলিলেন, কি বলছিলে, জপ-তপ? যোগাভ্যাস?—কিছু না কিছু না, যার হয় তার হয়, যার হয় না তার তপস্যা করায় হয় না; যেমন ঈশ্বরপ্রাপ্তি—ও কি তপস্যার কর্ম্ম। তবে সুস্থ শরীর মনবুদ্ধি নির্ম্মল করা যায় তপস্যার দ্বারা। কিন্তু ঐটি,—

আর কথা, কোন কথাই সেদিন হইতে পারিল না—সে এক স্বর্গের মাধুর্য্য বায়ুমণ্ডলে পূর্ণ, আমরা ভাসিতে ভাসিতে কাল কাটাইয়া দিলাম।

বিন্ধ্যাচলের আগেই বিরোহীর কাছে আসিয়া অবধূত অগ্রসর হইলেন না, বলিলেন, আজ এইখানেই থাকা যাক। বড় একটা গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া গাছটাকে দেখিতে লাগিলেন। এই কয়দিন সঙ্গে থাকিয়াই দেখিতেছি বড় গাছ দেখিলেই অবধূত তাহার তলায় একটু বসিতেন, প্রথমে ভাবিতাম বোধ হয় ক্লান্ত হইয়াই বসিয়াছেন,—ক্রমে অপর এক ভাবের আস্বাদ পাইলাম। গাছ, বিশেষতঃ বড় গাছ দেখিলেই তাঁহার মধ্যে একটা ভাব হইত,—সে ভাবটা একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন। যাইতে যাইতে পথের উপর একটা সাঁকো, কালভার্টের পরেই সেই একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইয়াই আছেন। আমি দেখিলাম ইহার মধ্যে একটা কিছু আছে, আমিও বসিয়া গেলাম, কৌতূহল জাগিয়াছে, অন্য সময় হইলে তখনই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতাম, এখন আর সেরকম করি না, অপেক্ষা করি। মন বুঝিয়া যখন আপনিই আরম্ভ

করিবেন তখন আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ?

দেখ, গাছ দেখলে, বিশেষতঃ বড়, অনেক দিনের পুরানো গাছের দিকে দেখলে মনে হয় আমায় আকর্ষণ করে, আমার মধ্যে কেমন একটা সাড়া লাগে, মনে হয় আমায় ডাকচে, এরা আমার আপনার, বড আপনার। এরা যোগীর গোষ্ঠী তাই আমাদের সঙ্গেই এদের প্রাণের একটা যোগ আছে। পথ দিয়ে চলতে, যদি আশেপাশে বা সামনে গাছ রয়েছে দেখি, অন্ততঃ দৃষ্টিতেও তাকে একটু সম্ভাষণ না করে যেতে পারি না। এরা কত দিন থেকে রয়েচে, মানুষের কত অবস্থাই না দেখেছে! এদের ভালবাসাও আছে, ডালে ডালে পাতায় জড়াজড়ি করে জানায়, আমায় সাড়া দেয়, ঠিকই টের পাই সে-ডাকে, আকর্ষণ করে। সময় সময় দেখেছি, অন্যমনস্ক হয়ে চলে যাচ্ছি, ঝড নেই, বাতাস নেই, একেবারে ডালভরা পাতা নেমে দুলতে দুলতে গায়ে এসে ঠেকলো, তখন চমক হলো, স্পর্শ দিলাম, বসলাম, তবে স্থির হয়, তবে যাই। আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঠিক মানুষের মত সব, কেবল ভাষা নেই !

প্রত্যেক কথাটি যে সত্য তাঁর মুখের কথার ভাবে ধারণা হয়,—আমার নিজেরও কতকটা ঐ রকমের অনুভূতিই জন্মেছিল একসময়, তবে এত স্পষ্ট এতটা জীবন্ত নয়। আর তাঁর মত গভীর তাত্ত্বিক অনুভূতি ছিল না। সে তো আমার হইবার কথা নয়, কারণ আমার সমাজ ও সংসার, যে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জ্ঞানাবস্থা হইতে বিচরণ করিতেছি, তা অনেক অসৎপ্রবৃত্তিমূলক ভোগসংস্কারে মলিন, কাজেই সে অনুভূতি আমার আশিবার কথা নয় যা অবধূতের মর্ম্মে অহরহ খেলা করিতেছে।

আমার মধ্যে যে তার আভাস ছিল এটি এখন বেশ বুঝিতে পারি। ছেলেবেলায় আমার বাড়িতে বড় পুকুরের ধারে বাবাঠাকুরতলায় একটি প্রকাণ্ড বট গাছকে নিয়েই, শিবের জটার মত ঝুরি তার অনেক, আমরা সারাদিন দুলতাম খেলতাম, কত কি না করেছি। একটা স্বর্গের আনন্দ ছিল ঐ গাছের সংস্পর্শে এলে। এ আজও ভুলি নাই। তাই দেখিতেছি, এখন অবধূতের ব্যাপার দেখিয়া সেই বাল্যজীবনের ভালবাসাটি যেন আবার নূতন জীবন পাইয়া ক্রিয়ারম্ভ করিল আমার মধ্যে।

অবধূত বলিতেছেন, দেখ, একটি সার্ব্বজনীন ভাষা আছে, সে ভাষায় কথা কওয়া যায় না, কেবল অনুভবগম্য সে ভাষা। যদি কোন নির্ম্মলবুদ্ধি জীবের মধ্যে প্রেমের অধিষ্ঠান হয় তাহা হইলে সেই ভাষা ফুটে ওঠে চিত্তের মধ্যে, তাই থেকে এ জগতের মধ্যে সৃষ্ট বস্তু যা কিছু আছে, তা চেতন-অচেতন বা উদ্ভিদ সব সব—এদের সবার কথা, ভাব বুঝা যায়। তখন সে আর এক রহস্যময় বিশ্বজগৎ, কিন্তু তার কথা বা ভাব কথায় বলা যাবে না। ভাবা আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, তাকে ভাষার ছকে ফেলা যায় না; —প্রকাশ করাও যাবে না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন।

আজ তাঁর শেষ কথা হইল, তুমি তো আসলে ধ্যানমূর্ত্তিই আঁকতে চাও, চণ্ডীদাস ও রামীর মূর্ত্তি আঁকতে পাব ?

এইভাবে এই নয়-দশ দিনে আমরা বিন্ধ্যাচলের কাছাকাছি হইলাম। কাল বিন্ধ্যাচল পৌছিব। মনে মনে আমার ওখানে দুই-এক দিন থাকিতে ইচ্ছা ছিল,—যদি অবধূতের মত থাকে তাহা হইলেই হয়। হইয়াছিলও তাই—দুটি দিন ও দুটি রাত্র থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আজ আমরা এই বিরোহী গ্রামের প্রান্তে এক মন্দিরপ্রাঙ্গণে রাত্রি কাটাইয়া প্রাতে কয়েক মাইল চলিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদমূলে গঙ্গাতীরে পৌছিলাম।

আমার মনের কথাটি ইনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, তার পরিচয় পাইলাম, বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিব হইতে দূরে একটি স্থানে বেশ ফাঁকায় আমাদের স্থান হইল, সেদিন ভিক্ষা হইল মায়ের প্রসাদ—তারপর রাত্রিযাপনও হইল ঐ স্থানে। প্রথম দিন ও রাত্র কাটিয়া গেলে দ্বিতীয় দিনে একটু সরিয়া, কারণ একই স্থানে দুই দিন বা দুটি রাত্র থাকিতে দেখিলাম না,—অন্ততঃ খানিক তফাতে অপব এক বৃক্ষতল নিশ্চয়ই আশ্রয় করিবেন ইহাই তাঁহার নিয়ম।

অপর একটি স্থানে দ্বিতীয় দিনের অবস্থিতি। দিনমানে আসন করা হইল, বিন্ধ্যাচল ছাড়া হইল না বা বিন্ধ্যাচলের বাহিরেও যাওয়া হইল না, মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই যা-কিছু নডাচডা স্থানবদল। এইভাবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া তিনি বিন্ধ্যাচলে দুই দিন ও দুই রাত্র কাটাইলেন। দ্বিতীয় দিনের কথা একটু আছে। প্রথম দিনে শুধু নয়, কোনদিনই এখানে তিনি স্নান করিলেন না, মাত্র জলস্পর্শ করিলেন, মন্দির স্পর্শ করিলেন কিনা সন্দেহ, বাহিরে বাহিরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন,—ব্যাস ঐ পর্য্যন্ত ;—মন্দিরমধ্যে প্রবেশ বা দর্শন কিছুই করিলেন না।

পরদিনের কথা, দুপুরবেলায় তখনও ভিক্ষা নাই, আমায় কিছু না বলিয়া দূরে এক জায়গায় হাঁটু মুড়িয়া হাত বেড়িয়া যেমন সহজভাবে বসেন সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন, উদ্দেশ্য এই যে,—আমার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে মন্দিরপ্রবেশ ও পূজা প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। কিন্তু আমার তাহাতে মন গেল না, গঙ্গায় স্নান করিলাম বটে, তবে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম না। তাঁহার কাছেই রহিলাম। আমি দূরে বসিয়া আছি, দেখিতেছি ঐ তিনি বসিয়া—আমার দিকে পিছন করিয়াই আছেন।

আমার পেট জ্বলিতেছে, স্নানের পর ক্ষুধা প্রবল হয়—কিন্তু এখনও ভিক্ষার নামগন্ধ নাই। মনে মনে একটু বিরক্তিও আসিতেছে,—তিনি না হয় সিদ্ধযোগী, আমি তো তা নয়, আমার যে ক্ষুধা আছে। এই কয়দিন একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি, উনি ভিক্ষা কখনও কারো কাছে প্রার্থনা করেন না। যদি তিনি আগে থাকেন, তাহা হইলে গিয়া দেখি ভিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে আর আমি আগে থাকিলে যখন তিনি আসেন,

বলেন, চলো ঐখানে যাই। মধ্যে একদিন প্রায় এইরকমই হইয়াছিল, ভিক্ষার ব্যবস্থা নাই, অথচ তিনিও নড়েন না—আমায়ও কিছু বলেন না। কোন কথাই কন না। যখন আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিতে যাইব এমন সময়েই ভিক্ষার ব্যবস্থা হইল। সে ব্যবস্থা কি রকম বুঝিলাম না, আগে কখন তাঁহার সঙ্গে যে কাহারও কোন কথা হইয়াছিল কিনা জানি না। এক ব্যক্তি জোড়হাতে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, ভিক্ষা প্রস্তুত, আসুন। তখন আমরা উঠিলাম। আজ এখন কি হইবে কে জানে!

আজ ধৈর্য্য হারাইবার মত হয় নাই, কিন্তু প্রায় প্রান্তে আসিয়াছে, এমনই সময় হাতে ঝুড়ি ধরা একজন আসিতেছে দূরে দেখা গেল। বাঁ দিকের একধারে খানিকটা লম্বা পথ গিয়াছে, একটা গাছ আছে তাহাতেই সে পথ কতকটা ঢাকা, কিন্তু একটা বাঁকের পরেই যে খানিক দেখা যায় সেখানে লক্ষ্য করিলাম, যে আসিতেছে সে ঐ বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডাদের মতই পূজারী শ্রেণীর, যাত্রীর পাণ্ডা নয়। আসিতে আসিতে বাঁকের পর যখন অদৃশ্য হইল, তখন মনে করিলাম অন্য দিকে চলিয়া গেল। কি ভাবিয়া জানি না আমি উঠিয়া অবধূতের কাছে আসিয়া তাঁহার পাশেই বসিলাম।

তিনি আমার দিকে দেখিলেন, কি মধুর হাসিলেন, আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর কিছুই রহিল না—সব ভুলিয়া তাঁহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছি, এমন সময় কাঁধে ঝুড়ি ব্যক্তি আসিয়া ঝুড়ি নামাইয়া জোড়হাতে প্রণাম করিয়া দাড়াইল।

দুইখানি পাতায় ঢাকা খুলিয়া তাহার মধ্যে পুরী, শাকঅন্ন পরমান্ন কাঁচা পাতার দোনায় দোনায় ভরা উৎকৃষ্ট ভোগের ব্যবস্থা।

অবধূত যেটুকু প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন তাহা এতই কম যে আমার লজ্জা করিতে লাগিল,—তাঁহার সামনে কি করিয়া পেট ভরিয়া খাইব! আমার অবস্থাটি দেখিয়াই বলিতেছেন, তোমার যেমন বয়স, ক্ষুধাবোধ সেই রকম, আমার সঙ্গে খেতে বসে তোমার উপযুক্ত পরিমাণ খেতে এতটা ভাবলে চলবে কেন? তোমার বয়সে আমি কি এতটুকু খেতাম নাকি, আচ্ছা পাগল তো দেখচি! বত্রিশ বছরের যুবা আর বাষট্টি বছরের বুড়ো —এক পরিমাণ খাবার খাবে?

আমার মন হইতে সঙ্কোচ কাটাইয়া তবে তাঁহার শান্তি।

যাত্রী অনেক ঐদিন, আহারাদির পর খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিয়াছি, অবধূতও যেভাবে হাঁটু মুড়িয়া হাত দুটি রাখিয়া যেমন তাঁহার বসার ধরন সেইভাবেই বসিয়া আছেন, দুজনেই চুপচাপ, দেখি ষণ্ডামার্কা পাঁচ-ছয়জন জলের ধারে আসিয়া প্রথমে বসিল,—আমাদের স্থান হইতে খানিক, বিশ-বাইশ হাত তফাতেই—তাহারা বসিয়া কথা কহিতে লাগিল। তাহাদের কথা আমরা শুনিতে পাইলাম না কিন্তু মনে হইল যে তাহারা কিছু পরামর্শ ই করিতেছে। আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি নাই, অবধূত নিজ ভাবেই ছিলেন,—

আমিও আমার চিন্তায় ছিলাম। অবশ্য আমার ভিতরে চিন্তা বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল অবধূতকে লক্ষ্য করাই আমার কাজ ছিল। মানুষটিকে আজ প্রায় বারো-তেরো দিন দেখিতেছি, সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছি, কিন্তু তাঁর ইতি করিতে পারিলাম না। এত কাছে থাকিয়া, এতটা স্নেহ পাইয়াও তাঁর কাছেই যাইতে পারি নাই। তাঁর সঙ্গের মাধুর্য্য কি করিয়া ভাষায় বুঝাইব, আমার অন্তরক্ষেত্র যেন পূর্ণ করিয়াই আছেন। আবার যখন বিক্ষেপ আসে, সকল সময়েই তো তাঁহার প্রভাব থাকে না, তখনই হয় আমার মরণ, স্বভাবে স্থিত হইতে তো পারি নাই, কতদিনে সেই ভাব আসিবে, তাই তো তাঁহার সঙ্গ ছাড়ি নাই। ইনি তো থাকিতেও বলেন না, যাও একথাও বলেন নাই, কখনও বলিবেন না,—আমার মন যতদিন চাহিবে ততদিন থাকিব।

যতটুকু থাকিব ততটুকুই প্রাপ্তি, সেবার ইচ্ছা হইলেও সেদিকে কোন লাভ নাই, কখনও এমন সময় আসিল না যখন তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারি। এই সব লইয়াই চলিতেছি,—এখন গঙ্গার ধারে বসিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রায় দশ হাত তফাতে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি। হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া অতীব করুণ নয়নে বলিয়া উঠিলেন, ডাকাত জানো? এরা ডাকাত। প্রথমটা শুনিতেই পাইলাম না, শেষের কথাটা শুনিলাম—এরা ডাকাত।

এই কথাটার মধ্যে এতটা দরদ ছিল, না শুনিলে অনুভব করাই মুশকিল এই সে দুঃখ, ইহাদের উপজীবিকাটা কতই দুঃখপূর্ণ এইটা ভাবিয়াই তিনি এত কাতর! ইহারা অজ্ঞান, দুঃখই এদের কর্ম্ম-পরিণাম,—আর অবধূতের এইটাই বড় দুঃখ, ইহার মধ্যে ঘৃণা ভয় অথবা বিদ্বেষের আভাসমাত্র নাই, স্পষ্টই একটি দুঃখ মাত্র আছে তাঁহার ঐ কথা কয়টির মধ্যে। আমি চুপ করিয়াই শুনিলাম, রহিলামও চুপ করিয়া।

তিনি আগেই উঠিলেন, আমিও উঠিতেছি, ঐ দলের নজর পড়িল এবং তাহাদেরও একজন উঠিয়া অবধূতের সম্মুখে আসিয়া, পাও লাগে মহারাজ, বলিয়া পায়ে হাত লাগাইল।

তিনি দেখেছি, পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ কাহাকেও করিতে দেন না। এখন কিন্তু আশ্চর্য্য, দেখিলাম, এ লোকটাকে দিলেন, কিন্তু আর একটিও কথা কহিলেন না, বরাবর পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন। সে ব্যক্তি প্রথমটা জোড়হাতে মহারাজ বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎধাবনের চেষ্টায় ছিল কিন্তু একবার মাত্র ফিরিয়া কেবল অতি করুণভাবে তাঁহার দিকে দেখিতেই সে লোকটা কেমন যেন হইয়া গেল, আর অগ্রসর হইল না, সেইভাবেই জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিল অবধূতের দিকে চাহিয়া। অবধূত এক বাঁকের মুখে ইত্যবসরে অদৃশ্য হইলেন।

আমি তাঁহার মধ্যে আর একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম,—ঐ করুণা বিগলিত

মূর্ত্তি,—কি অসাধারণ একটি ভাব তাঁহার মধ্যে যাহা দেখিলে আপন ভুলিতে হয়। আমার মনে মনে একটা প্রবল ইচ্ছা,—একবার অবধূতকে জিজ্ঞাসা করিব—কি রহস্য ইহার মধ্যে আছে ? কিন্তু ইচ্ছামত আমি কি কখনও এই কয়দিনের মধ্যে একবারও কথা কহিতে পারিয়াছি, তিনি অধিকার না দিলে ? যাই হোক, আমিও ফিরিয়া অবধূতের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। দেখিলাম তিনি উঠিতেছেন উপরের দিকে।

একটি ছোট বালক সামনেই দাঁড়াইয়া, অবধূত তাহার কাছেই আসিয়া দাঁড়াইলেন। বালকটি যাত্রীদেরই, বুঝা গেল তাহার পোশাক দেখিয়া—তারা এই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক বলিয়াই মনে হইল। মাথায় টুপি, গায়ে একটা পিরাণ, বুকে ফিতা বাঁধা,—পায়ে জুতা, আধুনিক। সে অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, অবধূতও দেখিতেছেন, এমনই সময়ে ধীরে ধীরে পাশের পথ হইতে, তাহার পিতামাতাই হইবে, একটি মেয়ের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বালকটি একবার তাহার মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, মা, ইয়ে মহাত্মাকো বাসেমে লে চলো। শুনিয়াই জোড়হাতে জননী মহারাজ আইয়ে, বাসে'পর আইয়ে—বলিয়া প্রণাম করিল। সেই সময়েই একজন জোয়ান বৃদ্ধ অতি দীনবেশে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে লাঠি, গায়ে তার শতছিন্ন একটি আবরণ, হয়তো কোন সময়ে সেটা ফিতা-বাঁধা পিরাণ ছিল, এখন তাহার চিহ্ন আছে আর ফালি ফালি ঝুলিতেছে। কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত, তাও বেশ দুই-তিন খাবল ছেঁড়া। দুইটিই ময়লা, কিন্তু ব্যক্তিটির গায়ের রং অপূর্ব্ব উজ্জ্বল,—মাথায় ছোট ছোট চুল, শিখা আছে—তার উপরে একখানি কাপড়ের ফালি মাত্র জড়ানো, তাহাতে কপালের খানিক ঢাকা পড়িয়াছে তাহার, চক্ষু দুটি ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ। তাহার সেই দৃষ্টির সঙ্গে অবধূতের দৃষ্টি মিলিতেই কি যেন একটা ঘটিয়া গেল। অবধূত তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধের হাতের লাঠিটা লইলেন এবং অগ্রসর হইলেন। কারো সঙ্গে কোন কথা নয়, আমার দিকেও দেখিলেন না, এমন দ্রুত চলিলেন, আর ঐ বৃদ্ধও সেই সঙ্গে এমনই চলিতে লাগিল, আমায় অবাক্, এমন কি সেই বালক-বালিকা পিতামাতা সবাইকেই অবাক করিয়া তাঁহারা দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কোথায় গেলেন জানি না, আমার অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই হইল না—মনে হইল উহাতে আমার অধিকার নাই। আমি সেইখানেই রহিলাম। আমায় দেখিয়া সেই বালকটি বলিল, আপনে মহারাজকে সাথী ? বলিলাম, জি হাঁ। আইয়ে না হামলোক কে সাথ ? পিতার মুখের দিকে চাহিলাম, পিতার মুখ বিষণ্ণ, মায়ের দিকে দেখিলাম, তাহার মুখখানাও বিষণ্ণ বটে কিন্তু স্বামীর মত মুহ্যমান নয়।

যখন আমরা বিন্ধ্যাচল হইতে ঠিক পরদিন 'প্রভাতে যাত্রা করিলাম, তখন অবধূত

বলিলেন, আমি আর তুমি এই দুজনেই তো আমাদের এ জগতে আছি, তা আমার আজ কেমন ইচ্ছা হয়েচে একটু আগেই যাব। তুমি রোজ অনেক আগে চলে যাও, আজ আমি যাই, কেমন ?

আমি তখনই হাঁ বলিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে তখনি কেমন সংস্কারগত বুদ্ধিতেই বুঝিলাম একেবারেই অন্যরূপ, কেমন অদ্ভুত ভাবের ধারণাই হইল যে ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু উদ্দেশ্য আছে। এ মানুষ কোন কাজ এমন কি নড়াচড়া পর্য্যন্ত বৃথা করেন না, —ইহার মধ্যে কিছু থাকিতে পারে।

যাহাই হউক তিনি আগেই গেলেন—আমি পিছনে ধীরে ধীরেই চলিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি যে আগে যাইতেছেন, খুব দ্রুত নয়, কারণ দ্রুত চলা তাঁর অভ্যাস নয়, একটার পর একটা পা ফেলিয়া,—যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছেন, আর আমার দ্রুত চলার অভ্যাস, তাই আমার পক্ষে ধীরে ধীরে চলা বেশ একটু শক্ত, সংযত হইয়াই চলিতে হইতেছে। তবে সোজাপথে তিনি আমার দৃষ্টির মধ্যেই আছেন, নেহাত তেমন তেমন বাঁকা পথ না হইলে চক্ষের আড়াল হইতেছেন না।

এইভাবে প্রায় মাইল তিন আসিয়া কয়েকটা বাঁক পার হইয়া ভাবিলাম তিনি কোথাও বসিবেন। একটা গ্রামও পাওয়া গেল। ছোট গ্রাম,—বেশীভাগ চাষী লোক,—সেইখানে একটা কূয়া বা ইঁদারা হইতে একটা লোক জল তুলিতেছে, মনে করিলাম এইখানেই তো বসিবার কথা। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া বোধ হয় গ্রামখানি পার হইয়া তার পর বসিবেন এই মনে করিয়াই, যে ব্যক্তি জল তুলিতেছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইধারসে এক সন্ত কো যানে দেখা ? সে বলিল, নহি, এইসা কোই কো নহি দেখা। কাজেই পা চালাইলাম, গ্রামপ্রান্তে হয়তো কোথাও বসিয়া আছেন।

গ্রাম পার হইয়াও তাঁহাকে পাইলাম না। একদমে তিনি কখনও দীর্ঘপথ চলেন না, একটু বসিয়া, তবে একবেলার মাত্রা পূর্ণ করেন,—তাই ভাবিয়াছিলাম আজ মধ্যপথে বিশ্রামের স্থান এইখানেই হইবে। কিন্তু তাহাও হইল না। কাজেই আমি একটু দ্রুত পা চালাইলাম। সোজাপথ এখন অনেকটাই দেখা যাইতেছে, গাছ বড় একটা নাই, অন্ততঃ কাছে নাই। উদ্বেগপূর্ণ মনে দ্রুতগতি, আমার যেভাবে চলা অভ্যাস সেইভাবেই চলিতেছি, কিন্তু কোথাও তাঁহার চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি না।

অন্যদিন আমি আগে আসিয়া বসিয়া একটি মনোরম স্থানেই অপেক্ষা করি, আজ তিনি আগে, আমিও ধীরে ধীরে আসিতেছি, কিন্তু কৈ, তাঁহার তো পাত্তা নাই ! প্রথমে বরাবরই চক্ষের দৃষ্টির মধ্যেই ছিলেন, ঐ গ্রামখানিতে পৌছিবার পূর্ব্বে মাত্র একটি বাঁক ঘুরিবার সময় হইতেই তাঁহাকে হারাইয়াছি। কেমন মনটা হু-হু করিয়া উঠিল, তিনি কি আমায় ফাঁকি দিলেন এই ভাবে ? এই সব ভাবিতে ভাবিতেই চলিয়াছি। আরও এক দেড়

মাইল এই ভাবে আসিলাম,—কিন্তু তাঁহার কোন পাত্তা নাই। হা ভগবান! আমার অদৃষ্ট এমনই বটে, এমন মানুষ,—দেবতার মত। আমার দুর্ব্বল মনে কত কি ভাব উঠিতে লাগিল সে কথায় আর কাজ নাই। আরও আধ মাইল আসিয়া একখানি গ্রাম পাইলাম। একটি ছোট্ট মন্দির, রাস্তার নিকটেই দেখা যাইতেছে, তাহার নিকটে একটি কূয়াও আছে দূর হইতেই দেখিতেছি, নিকটে দুই-একজন লোকও আছে, কিন্তু তাঁহার মত কাকেও তো দেখিতেছি না,—অতি দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম রুদ্ধশ্বাসে, ছুটিয়া নয় দ্রুত চলিয়া যখন সেই মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িলাম, কোনদিকেই তাহার অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই পাইলাম না।

তিনি আগে আছেন আমি সহজেই তাঁহাকে ধরিব এটা আমিও যেমন জানি তিনিও তেমনি জানেন। কিন্তু কই? গ্রামখানির মধ্যে তিনি কখনই প্রবেশ করিবেন না জানিতাম। অথচ পথের ধারেও দেখিতেছি না। এই গ্রাম পার হইয়া আবার পথ ধরিব কিনা ভাবিতেছি, কয়েকটা গাছের আড়ালে কয়েকজন সাধুমূর্ত্তি বসিয়া আছে দেখিলাম। তাহারা গাঁজা খাইতেছে, চিলাম তাহাদের তখন হাতে হাতে ফিরিতেছে, অবশ্য আগে অল্প দূর হইতে খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিলাম। সকলকেই দেখিতেছি, তারা চারজন। চারজনকেই দেখিলাম, তাঁহার মত কাহাকেও দেখিলাম না। ইহারা সবাই গৈরিকধারী, তাঁহার সাদা ময়লা কাপড, ইহাদের গায়ে গৈরিক বহির্বাস, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা প্রভৃতি, মাথায় জটাজূট। তাঁহার কৌপীন, তার উপরে একটা কাপড়ের মত জড়ানো থাকে বটে, আর কাঁধে একখানা কম্বল সব সময়েই থাকে। গায়ে দিতে দেখি নাই, এই মাত্র বোঝা-টুকুই তিনি রাখেন জানি, জলপাত্র নাই আর কিছু নাই। কেবল শয়নের সময় আপাদ-মস্তক ঐ কাপড় দিয়া ঢাকিয়াই রাখেন, না হইলে বস্ত্রখানি গায়ে কিম্বা কোমরে জড়ানো থাকে এইমাত্র।

যাহা হউক ইহাদের মধ্যে তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, মনে হইল নিশ্চয়ই আমায় ফাঁকি দিয়াছেন,—আর ফাঁকি দিবার জন্যই এই কৌশল। কিন্তু এখন আমি কি করিব, আবার পা চালাইব! সামনে কোন গ্রামের উদ্দেশে পা চালাইব কিনা, একটু ভাবিতে বসিলাম। আজ প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল টানা আসিলাম। অন্য দিন এ পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যেই আমাদের আশ্রয় বানাইয়া লওয়া হয়—আজ মধ্যপথে একটু বিশ্রামের কথা নয়, তিনি আগে আমি পরে, তাঁহার গতি ধরিতেই পারিলাম না।

কি মনে হইল, আমার তো চলিবার কথা যতক্ষণ না তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই ভাবিয়া আবার পা চালাইলাম, দেখি যদি সামনের গ্রামে দেখা হয়। আরও প্রায় দুই মাইল আসিয়া বেশ একখানি গ্রাম পাইলাম, দূর হইতে একটা সেতুও দেখা গেল, যেমন খালের উপর সেতু হয় সেইরূপ, সেতু পার হইয়া পথটি বাঁ দিকে নামিয়া গিয়াছে; তার

পরেই গ্রাম আরম্ভ, কয়েকখানা গরুর গাড়ি বস্তা বোঝাই চলিতেছে এ গ্রামের পথে। আমি অতি দ্রুত পা চালাইয়া সেই পোলের কাছে আসিয়া গেলাম।

কিন্তু দুই-তিনজনকে জলের কাছে দেখিলাম, সেখানেও নাই। ভাবিলাম ঐ গ্রাম অতিক্রম করিয়া অপর প্রান্তে গিয়াছেন হয়তো। প্রায়ই এমন করেন যে গ্রাম পাইলে হয়, এ প্রান্তে না হয় অপর প্রান্তেই আশ্রয়গ্রহণ ভিক্ষাদি করেন। কাজেই ঐ কথাই ভাবিতে ভাবিতে সেতু উত্তীর্ণ হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। হনহন করিয়া গ্রামখানা পার হইয়া গেলাম ;—প্রায় রুদ্ধশ্বাসে গ্রাম পার হইয়া অপর প্রান্তে আসিয়া পড়িলাম—কিন্তু কৈ, যাহাকে চাই তাহার উদ্দেশ কোথা পাইব ? গ্রাম পার হইয়া খানিক আরও আসিয়া পথ হইতে নামিয়া একটু স্থান, গ্রামের শেষ দিকে একটা ছোট মসজিদ, তাহার অল্পদূরেই খানিক জল, যেন উদ্যান-বেষ্টিত একটা সরোবর। একটু দূর হইতেই দেখিতেছি, চমৎকার স্থান পথের নীচে, বাঁ দিকে, চাহিয়া দেখি আমার ইষ্টমূর্ত্তি একখানি পাথরের উপরে বসিয়া—পা ঝুলাইয়া, একটা প্রকাণ্ড গাছের পাশেই, সম্মুখে এমন ভাবেই চাহিয়া আছেন যেন জগতের সকল দৃশ্যই কেন্দ্রস্থ হইয়া তাহার সম্মুখেই রহিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে নামিয়া পিছনে দাঁড়াইলাম।

আপনি আজ খুব বেশী এসেছেন, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তিনি, ধীরে ধীরে, যেন একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, তাই তো আমি যেন একটু দ্রুত এসে পড়েছি, নয় ? তার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন বল তো তোমার মুখখানা অতটা লাল হোলো,—চক্ষুটাও লাল দেখচি যে ?

আমি বলিলাম, আপনি আজ আগে এসেই আমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, আমি আশ্চর্য্য হয়েচি আপনি আজ একটানে এতটা এলেন কি করে অত আস্তে আস্তে চলে !

তিনি বলিলেন, সত্যি আমি কিছুই বুঝতে পারিনি যে কতটা এসেছি, কেমন করেই বা এলাম। অন্যদিন তুমি থাক আগে, পথের বেশ ঠিক রাখো, বেশী চলা হয় না,—আমাদের কি দরকার পথে অত দ্রুত চলবার, কি বল ? চল এখন যাই, আজ ঐখানে ভিক্ষা,—বলিয়া ঐ মসজিদের দিকে দেখাইয়া দিলেন।

সে কি, ঐ মুসলমান মসজিদে ভিক্ষা ?

তাতে কি, আমরা যে অবধূত। তুমি কি খাবে না ? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই, আপনি যখন ভিক্ষা স্বীকার করেছেন তখন আমার অন্য গতি হবে কি করে ?

তিনি উঠিলেন। আমার বোধ হয় আগেই প্রস্তুত হইয়া ছিলেন,—আমি পিছনে পিছনে গিয়া উঠিলাম ঐ মসজিদের বারান্দায়। একটি বৃদ্ধ মৌলবী, আর একটি মেয়ে, তার মাথায় খানিক কাপড় ঢাকা, ঘাগরা পরা,—অপেক্ষা করিতেছিল, যাইবা মাত্রই দুখানি

পুরানো কম্বল আসন পাতাই ছিল, মাটির পাত্রে জলও রাখা ছিল, দুখানি পলাশ পাতায় চারখানি রুটি একটু ডাল একটু তরকারি, অবশ্য পেঁয়াজ ছিল তাতে, ঢাকা খুলিয়া দিল। আমরা বসিলাম।

দেখিলাম অবধূত একখানি রুটি, ডাল ও তরকারিটা সব ধীরে ধীরে খাইলেন। রুটিগুলি সুন্দর, নরম, ঘৃতসিক্ত এবং অল্প গরম ছিল। আমি চারখানাই খাইলাম, শেষে একটু আমের আচার। ভোজনের পর,—অবধূতের পাতের অবশিষ্ট রুটি তিনখানি তাহার বস্ত্রে যত্নপূর্ব্বক বাঁধিয়া লইল এবং আমরা যখন আচমন করিয়া মসজিদেব অপর প্রান্তে সতরঞ্চের উপর খানিক বসিলাম তখন বৃদ্ধ অবধূতের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ অত্যন্ত ভক্তিভাবেই অবধূতেব সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। তারপর আবও বিচিত্র, সেই মেয়েটি আসিরা বসিল তাহার কাছেই। হিন্দিতেই কথা হইল, কিন্তু তাহাব বিশিষ্ট অংশ আমি হিন্দিতে বলিব না, ভাষাতেই বলিব।

আমরা ভগবানের মর্জ্জি-অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না, কেন তিনি এই মুসলমানদের এতটা পশ্চাৎপদ করেছেন, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সব দিকেই কেন এ জাতটাকে খাটো করেচেন। অবশ্য আমি একথা বলচি না যে আমাদের মধ্যে ভাল লোক নেই, কিন্তু বেশী-ভাগ লোকই দরিদ্র আর ঐ ভাবের জ্ঞান-বুদ্ধিতেই দরিদ্র। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখতে পাই। একথা আমাদের মধ্যেও যারা ভাল লোক, তাদেরও জিজ্ঞাসা করেচি কিন্তু কিছু সদুত্তর পাইনি। তারা যা বলে সেগুলি যুক্তি বুদ্ধি বিচারে টিকে না। আমাদের কেন এমন দুর্গতি হোলো, আমাদের চক্ষের সামনেই আপনাদের এতটা তরক্কি দেখেও এদের চক্ষু খোলে না—এর ওষুধ কি ?

অবধূত তখন এমন অবস্থায় ছিলেন, আমার মনে হইল না যে ঐ বৃদ্ধের কোনো কথা তাঁর কানে গিয়াছে। বৃদ্ধ থামিলেন দেখিয়া যেন তাঁর হুস হল, তখন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন চারদিকে। তাঁর ভাব দেখিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত বিস্ময়েই সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন, মেয়েটিও অবাক, যেন আবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল। তখন অবধূত ধীরে ধীরে গান ধরিলেন,

মোকো কঁহা ঢুঁডই বন্দে মঁাচু তো তেরে পাস মে ,—
ন মৈ দেবল, ন মৈ মসজিদ ন কাবে ন কৈলাস মে।
ন তৌ কোনৌ ক্রিয়া কর্ম্ম মে নহি যোগ ব্যারাগ মে।
খোঁজি হ্যা তো তুরৎ মিলি হোঁ, পলভর কি তলাস মে।
ম্যয় তো রহু সহরকে বাহর, মেরী পুরী মওয়াস মে॥

বৃদ্ধ সাওয়াস, সাওয়াস বলিতে বলিতে দুই হাতে সেলাম করিল, বলিল,—বহোৎ খুব জী,

বিন মহোব্বতসে ঐ সা কভি ন বনি। সাবাস, সাবাস জী।

অবধূত কথা কহিলেন না—স্থির রহিলেন, বৃদ্ধ মেয়েটির দিকে ফিরিয়া,—ক্যা মস্তান,—মে গরিবো কো মদৎ দেনা, মেহেরবান—এয়সা মেহেরবান।

আর বিশেষ কিছু হইল না, অবধূত ধীরে ধীরে উঠিলেন। উঠিয়া ঐ বারান্দায় একবার দুইবার পাদচারণ করিলেন, তারপর জোড় হাতে তাদের প্রণাম করিয়াই উঠানে নামিয়া আসিলেন এবং পথের দিকে চলিতে লাগিলেন। আমি পিছনে আছি। বৃদ্ধ দুই-এক পা আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল, মেয়েটি তাঁহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়াই রহিল, তারপর যখন বৃদ্ধ ফিরিল তখন তাঁহার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত রহিল, ইতিমধ্যে অবধূত আসিয়া পথে উঠিলেন। এমন তিনি কখন করেন না, যেখানে প্রসাদ বা ভিক্ষা পাইতেন সেইখানেই বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। আমরা পথে আসিয়া অল্পক্ষণ চলিয়াই এক বৃক্ষতলে আসিলে অবধূত বলিলেন, এইখানেই একটু বিশ্রাম কর, কেমন? সেখান হইতে মসজিদটি অনেক দূরে, দেখা যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি একটু বিশ্রাম করবেন না? যে গুরুভোজ করেছেন—এখন চলা শক্ত। শুনিয়া অবধূত বলিলেন, দেখ এই পবিত্র অন্ন যতটুকু ঠিক ঠিক হজম করতে পারা যায় ততটুকু খাওয়াই ভালো,—আমি দেখেছি ঐ একখানি রুটি একটু তরকারি একটু ডাল আমার পক্ষে কম কথা নয়।

এখানে আমি একটু তর্কে প্রবৃত্ত হইলাম, না হইলে সত্য উদ্ধার হয় না;—সত্য এই যে, তিনি কেন অত কম খান এটা জানিবার জন্য আমার প্রাণটা আজ কয়দিন হইতেই ছটফট করিতেছে—সেজন্যই এই তর্কের অবতারণা—কাজেই আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি ছোট রুটি একখানার বেশী খেতে পারতেন না, না আপনি কি বলতে চান ঐ রকম চারখানা রুটি আপনার হজম হোতো না?

খেতে পারবো না কেন, ওরকম রুটি পঞ্চাশখানা খেতে পারি, কিন্তু খেলে হবে কি? ওর কতটুকু কাজে লাগবে আমার?

কাজে লাগবে কি রকম, দয়া করে একটু খুলেই বলুন না, তাহলে বুঝে ধন্য হই।

কি জানো, যারা যোগতত্ত্ব নিয়ে খেটেছে, কিছু পেয়েছে, তারা ঠিক জানে কতটুকু খাদ্য প্রয়োজন আর খাদ্য কি কাজ করে। যোগীরা তো বেশী শরীরকে খাটায় না, প্রায়ই শরীরকে শ্রমের দিক থেকে অপটু রাখে। যারা শরীর খাটায়, খাওয়াটা তাদেরই সার্থক। যে পরিশ্রম করবে না সে অত খাবে কেন? যার যতটা দরকার তার ততটাই খাদ্য গ্রহণের অধিকার, তা না হলে এক-একজন যদি না খাটে ও কাঁড়ি কাঁড়ি খায় তাহলে অন্য একজনের ভাগে কম পড়বে না? তাঁর খাবার বাঁটবার একটা নিয়ম আছে তো?

যতটা ক্ষুধা ততটাই তো খেতে হবে!

মানুষের দেখনি, আসল ক্ষুধা তার যতটা তার চেয়ে ক্ষুধা-বোধটা অনেক বেশী, কাজেই প্রয়োজনের অনেক বেশী খায়। হজমও করতে পারে না।

তাহলে মোটা মোটা বেশ স্বাস্থ্যকর শরীর যা দেখা যায় তারা কি হজম কবতে পারে না, বলবেন!

আরে মোটা হলেই কি হজম হয় বুঝতে হবে? মেদ-মাংসাদি ঠিক ঠিক হজমের লক্ষণ নয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে হজমের লক্ষণ কি? আপনি কি রকম হজম করেন বলুন?

শুনিয়া তিনি বলিলেন, কি জান, অন্নময় শবারেব সার পদার্থ কি বল দেখি?

বলিলাম, মস্তিষ্ক।

সহজ বুদ্ধিতে তা হয় বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক থেকেও সার বস্তু আছে—তা ওজঃ। আয়ুর্ব্বেদের নাম, আব যোগশাস্ত্রেও ঐ নাম দিয়েই তাকে নির্দ্দেশ করা হয়। তাকে বুঝতে গেলে আগে ব্যাপাবটা অর্থাৎ শবীবেব ধাতুগুলি বুঝতে হয়, তা হলেই সহজ হবে।

একটা অতি সত্য এবং সহজ প্রাকৃত নিয়মের কথা আগে ধাবণা করে বাখো,—যাদেব শ্রমজীবীর কর্ম্ম নাই, ছোটাছুটি নাই, মোট কথা সংসারের কর্ম্মশক্তি ব্যবহারেব কথা নাই, মৈথুন নাই—তাদেব ভোজ্য নানাবিধ সুস্বাদু এবং স্নেহপদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্যে পাকস্থলী ভরাবাব প্রয়োজন আদৌ নেই। যে যে দ্রব্য আমরা পাই তা আমাদেব মানুষভায়েবা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে বিশেষভাবে গুরুপাক, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এই তিনটির প্রতি অনুরাগী হয়েই থান। তাতে অবস্থাপন্ন অথবা অবস্থাহীন, দুই দলেই সমান ভাবেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেন। তারই ফলে পাকস্থলীটি অনেক বড হয়ে যায় আর তার সঙ্গে মেদ ও মাংসই বাড়ে, আব যাতে শরীর ত্যাগ হবে সেই রোগটিও উৎপন্ন হয়। সর্ব্বসাধারণেরই এই দশা। এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে এখনকার দিনে এত বোগের ঘটা কেন? বেশীভাগ ঐ ভোগের ঘটা থেকে, নয় কি?

এখানে তো দেখা যায়, আমি বলিলাম, ঐ রসনাই বড বেশী মানুষকে নামায়, ওটার সঙ্গেই যেন মানুষের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ!

তিনি বলিলেন, বাবাজীবন, আরও তলিয়ে একটু দেখো, লক্ষ্য করো দেখবে ঠিক ঐটির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি আছে সেটিও বড কম যায় না, পেটটি ভরলেই সেটি ঠিক খাড়া আছে তার পিছনেই। সেটার পিছনে থাকাই বৈশিষ্ট্য, স্বভাবের নিয়মেই তার স্থান পিছনে, আর তা থেকেই সৃষ্টি। ভোজনটা পংক্তিতে বসেই চলে, সেখানে সব এক পাপের পাপী, কিন্তু ঐ কাজটি পংক্তিতে হবার নয়,—নির্জ্জন না হলে মানুষসমাজে ও

কাজ করবার বাধা আছে। সেটা লজ্জা। এইখানেই মানুষ গর্ব্ব করে পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য দেখায়। তা যে ভাবেই করুক না কেন ঐ রসনা আর উপস্থেন্দ্রিয় নিয়েই যে কারবার তার নাম সংসার। একটির প্রাবল্যে অপরের পুষ্টি, ঐ একটির সংযমে অপরটিও সংযত হয়। তবে এখানে যে কথাটা, সেটা ভোজনের ;—যদিও বুঝা গেল, ঐ দুটি অচ্ছেদ্য সম্পর্কে এমন ভাবে বাঁধা যে একটির অভাবে অপরটি ক্ষীণ হতে পারে।

আমি বলিলাম, বুঝেছি, ভাবতে গেলে অপার সমুদ্র, এ থেকে উদ্ধার পাবার,—

বাধা দিয়া তিনি যোগাইয়া দিলেন,—সহজ পথই আছে, তা ঐ যোগের পথ। কিন্তু সংসার-ক্লেশদগ্ধ মানুষের সময় কোথা? সেদিকে লক্ষ্য করবার অনুষ্ঠানের কথা তো অনেক দূরের ব্যাপার, ভারবার সময় নেই যে সবার! বড় দুঃখের অতি সহজ প্রতিবিধান হাতের কাছে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য পড়বে না তার। কেন? তার ঐটাতেই খানিক সুখও আছে যে। যদি সেই সুখটুকু বাদ দেওয়া যায় তাহলে তো সবটাই দুঃখ। কি চমৎকার ঐটুকু! এই একবিন্দু সুখকে বাড়িয়ে তারা সিন্ধুপ্রমাণ দেখচে, কারণ তাই দেখতেই তারা অভ্যস্ত যে। শিশু, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য সর্ব্বাবস্থায় ঐ বিন্দুকে সিন্ধু দেখার বৈচিত্র্য নিয়েই তো সাধারণ মানুষজীবন। তার মধ্যে অবশ্য লক্ষের একটি বা দুটির যথাকালে,—তারই যথাকালে লক্ষ্য পড়লো,—এ কি করচি, কার পিছনে চলেচি, এতে আমার কি গতি হবে? সেই তারই লক্ষ্য পড়বে, যার ভাল লাগবে না। তারই মুক্তির পথ সে তখন করে নেবে। তখন তার সমাজের সবাই তা দেখবে, মাত্র সাক্ষী থাকবে, ভবিষ্যতে তাদেরও তো আবার দিন আসচে। তখন একজনের অবস্থান্তর দেখাটা তার কাজে লাগবে। এইভাবেই চলচে এখানকার কারবার।

ভোজনের হজম, কথাটা এতদূর আসিয়া আবার মোড় ফিরিল গন্তব্যের দিকেই, যখন তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ সব কিছুই অপরিমিত ভোজন আর হজমশক্তির দুর্ব্বলতা থেকেই।

অবশ্য একটা বিষয়ে মানুষের সদ্‌গুণের প্রভাব বরাবরই আর একজনকে প্রভাবিত করেই আসচে তাই রক্ষা, হলেও কি হোতো এই সমাজের সেটাও ভাববার কথা। আমার সংযম তোমায় প্রভাবিত করচে আবার তোমার সংযম অপরকে। এই ধারাটি একদিকে যেমন মানুষের মূল সত্তার একতা প্রমাণ করে, অপর দিকে অপরের সৎপ্রবৃত্তিকেও জাগায়। এত দুঃখের মধ্যে এইটুকু শুভই কার্য্যকরী হয়ে সংসারকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখচে। কিন্তু ভোজনের অর্থাৎ শরীরের ভোজ্যবস্তুর পরিণামে যে মহামূল্য ওজঃ ধাতু জন্মায় তা আর সংক্রমণের বিষয় নয়। আমাদের ভোজন ও ভোজ্যবস্তুর গ্রহণরীতির কথা এইখানেই সবার বড় কথা। হাঁস হাঁস করে খাওয়া মানে প্রায়ই গেলা, যাতে দাঁতের কাজ হয় না, তা হজমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, এটা যেমন যোগীরা জানে এমন কেউ

জানে না। দাঁত কারো কারো শীঘ্রই নষ্ট হয় আর তার মূল কারণই হোলো হজমের ব্যাপারে গোলমাল। যেটা খেতে হয়, বিশেষতঃ রুটি, যদি ভাল করে না চিবিয়ে খাওয়া যায় তাহলে তা থেকে সার রস ঠিক রক্তের সঙ্গে মিশতে পায় না, সেই নির্য্যাস থেকেই শরীরে ওজঃ সংগৃহীত হয়ে একজনকে ধীমান, শক্তিমান করে।

সেই জন্যই আপনি এত কম খান ?

কম খাওয়াটাই ঠিক কথা নয়, যেটা খেতে হবে সেটা প্রথমত ঠিকমত খাওয়া। তার রসটা আস্বাদন করেই খাওয়া দরকার তো—একখান রুটিই ঠিকমত আমার পক্ষে, খানিক তরকারির সঙ্গে খাওয়াই যথেষ্ট। আসল কথাটা হোলো খাওয়াটা আমাদের দেশে ও সমাজে এমনই বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েচে যে কতদিনে এর মোড় ফিরবে তা বিধাতাই জানেন। বাঙ্গালী রুটি খেতে জানে না, আটাকে কিভাবে পাট করতে হয় জানে না অথচ খায়। অবশ্য ব্যক্তিগত হজমশক্তির গুণে কতকটা হজমও করে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ শুভ ফলটা পায় না। ভাতের চেয়ে যব ও গমের আটাতে অনেকটাই শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু আটার পাট জানে না তাই তার শুভফলে বঞ্চিত।

আচ্ছা ওজঃ ধাতুটা কি, ব্রেণ ?

না, না, ব্রেণ বা মস্তিষ্ক চিন্তার সাহায্যকারী, আর ওজস্ যথার্থ শক্তি, সেই চিন্তার গভীর পরিণতি যাতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে ধ্যানে একাগ্র করে সমাধিস্থ করে, তত্ত্বের মূলে ডুবিয়ে দিতে পারে। অনুভূতির চরম গভীরতাই ওজঃ ধাতুর গুণ।

সেই ওজঃ কি মস্তিষ্কের মতই একটি ধাতু ?

মস্তিষ্ক তো জমাট ঘিয়ের মত পদার্থ আর ওজঃ তার প্রাণ, তৈজস ধাতু বলতে অতীব সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের মধ্যেই ওতপ্রোত থাকে কতকটা, তেজঘন পদার্থ বলা যায় কিন্তু পদার্থ বিশ্লেষণে আসে না। মন্থনে যে রক্ত শুক্রে পরিণত হয়, সেই রক্ত থেকেই বীর্য্য, তীক্ষ্ণ ধারণা শক্তি বা ধৃতি মেধা ঐ সকল উৎপন্ন হয়। সে পদার্থ কিন্তু মোটেই স্থূল নয়। তা সে যাই হোক, এখন খাদ্য হজম হয়ে সারভাগ রক্ত, শুক্র, বীর্য্য, ধৃতি, মেধা ওজঃ পর্য্যন্ত ধাতুপ্রাণ শক্তিতেই তার শেষ পরিণতি,—আর সেই প্রাণ দেহস্থ আত্মার মূল এবং স্থূল পরিণাম, সংসারলীলার প্রধান সহায়।

ব্রহ্মচেতনও এই কথাই বলিয়াছিলেন, যোগের প্রসঙ্গে।

বিন্ধ্যাচল হইতে প্রায় বারো ক্রোশ চুনার। মিরজাপুরে তিনি দাঁড়াইলেন না, এক-দমেই ঐ প্রকাণ্ড নগর অতিক্রম করিয়া গেলেন। তারপর ঝিসুরিয়া গ্রামে আসিয়া যেন নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইলেন। গ্রামের শেষ প্রান্তে পাশাপাশি দুইটি চামারের ঘর, তাদের ঘরের কাছেই এক বৃক্ষতল আশ্রয় করিলেন। এইখানেই আজ দিবারাত্র কাটাইলেন। আজ এই চামারই আমাদের ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিল,—যত্ন করিল, রুটি পাকাইয়া ডাল

আর দহি সংগ্রহ করিয়া সে ভিক্ষা দিল। তাহার যত্ন সত্যসত্যই অপূর্ব্ব। অবধূত একটু দহি ও তুইখানি রুটি খাইলেন মাত্র। আমার আজ কোনও সঙ্কোচ ছিল না, স্বচ্ছন্দে পেট ভরিয়া পাঁচ-ছয়খানি রুটি,—পবিত্র ঘি মাখানো, সুন্দর প্রস্তুত। চামারের ঘরণী প্রস্তুত করিয়াছিল সেই রুটি, ডাল ও দধি—সবটুকুই সদ্ব্যবহার করিলাম।

তারপর সেই গাছের তলায় আসন হইল।

তিনি কখন কথা কহিবেন, কখন কথা কহিবেন না তার চক্ষু দেখিয়া আমার পক্ষে জানার সুবিধা হইত। আমার আলস্য দেখিয়া বলিলেন, তুমি শোও না একটু ঐ ঘাসের উপর। আমার ঐখানেই একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল—কি বলিব,—চুপ করিয়া আছি। তিনি বলিলেন,—আমাদের তো তাড়া নেই, যখন ইচ্ছা চলবো, যখন খুশি বসবো, কোন বাধা নেই। তারপর একটু ভাবিয়া বলিতেছেন—কাল তো আমরা বেশ খাবার কথা নিয়েই অনেককাল কাটিয়েছি—আজ বিশ্রামের পর একটু গান,—তুমি তো মুখ খুলবে না, আজ তোমার গান শুনবো।

বলিলাম, তবেই হয়েচে,—আপনার গানের পর আমার গান?

অত বিনয়ে কাজ নেই,—আজ গাইতেই হবে,—আচ্ছা তুমি কমলাকান্তের গান জানো?

একটি ভিখারী আসতো আমাদের বাড়িতে, তার কাছ থেকে একখানা গান শিখে-ছিলাম,—তাই জানি। শুনিবামাত্রই তিনি গাও তো গাও তো বলিয়া বিষম তাড়া লাগাইলেন। এইভাবে তিনি বিশ্রামের কথা উত্থাপন করিয়া আমায় গান করাইয়া আমার আলস্য তাড়াইতে সাহায্য করিলেন,—আমি গাহিয়া গেলাম,—

জানো না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা মা কখনো মেয়ে নয়,
সে মেঘেরি বরণ করিয়ে ধারণ, কখনো কখনো পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া কভু পরে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়,—
কখনো পার্ব্বতী কখনো শ্রীমতী কখনো রামের জানকী হয়—
যেভাবে যেজন করয়ে ধারণ, সেইভাবে তার মানসে রয়,—
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমলে কামিনী হয় উদয়॥

শুনিয়া বলিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ খুব ভালবাসতেন—না? আচ্ছা তুমি রবীন্দ্র ঠাকুরের গান জানো—আমি শুনেছি—তার ভাল ভাল ব্রহ্মসঙ্গীত আছে—তুমি কি জানো?

বলিলাম, তুই-একখানা জানি।

কোথায় শুনেছ?

আদি ব্রাহ্ম সমাজে একসময়ে খুব যেতাম, তাঁর এই গান শুনতেই তো—

তোমার তাহলে ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত ছিল ! আচ্ছা, এখন রবীন্দ্র ঠাকুরের গান একখানা হয়ে যাক—সুতরাং গাহিলাম ;

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে,—
চির পথের সাথী আমার চির জীবন হে,—ইত্যাদি ইত্যাদি

শুনিয়া বলিলেন,—দরদী কবি !

এইভাবেই আজ দিনরাত্র আমাদের দুজনের গানেই কাটিল। দেখি গ্রাম ভাঙিয়া পড়িল ; প্রায় বৈকাল পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া আমার বাংলা আর অবধূতের কবীর ও মীরার গান শুনিল, তার পর চলিয়া গেল। আমরাও রাত্র কাটাইয়া প্রভাতে পাড়ি দিলাম।

আজ আমরা দিনমানে অনেকটা চলিয়া পথের ধারে একটি প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় কাটাইলাম। প্রায় তৃতীয় প্রহরে অবধূত আগে চলিতে লাগিলেন, মনোমত স্থানই তাঁর লক্ষ্য ছিল। লাইনের কাছে যখন একটা গুমটিতে আসিলাম তার পরেই লেবেল ক্রসিং ;—অবধূত বলিলেন, এখানে আজ থাকলে কেমন হয় ?

গুমটি হইতে একটি নারী বাহিরে আসিল, আমাদের দেখিয়া বলিল, যাইয়ে ঔর থোড়া,—এক আধা মিল কা করিব্ গাঁও হৈ, সন্ঝাকি আগে পৌছ যাবে গা।

অবধূত বলিল, চল, মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য। সত্যই গ্রামের নিকটেই স্টেশান, আমরা রাজপথ ধরিয়া যাইতে যাইতে গ্রামের শেষে এক ফাঁড়ির বিপরীত দিকে একস্থানে পৌছাইয়া গেলাম এবং নিকটেই একটি বৃক্ষতলে বসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

অবধূতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল দেখিলাম। এতক্ষণ চুপচাপ আসিতেছিলেন, এখানে পৌছিয়া তাঁহার মধ্যে আনন্দ,—গুন গুন স্বরে গান ধরিলেন। কবীরের একখানা গান, হাতে হাতে তালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন ;—ঠিক যেন ঐ ফাঁড়ির লোকদের শুনাইতেছেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার,—ঠিক দেখিলাম তারপর,—একজন ফাঁড়ির লোক আসিয়া দাঁড়াইল, আরও একজন আসিল, তাহারা উভয়েই বসিল।

অবধূতের গানের সুর থামিয়া গেলে একজন জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, কুছ ভোজন কা ইচ্ছা,—

বাধা দিয়া অবধূত বলিলেন, কুছ নেহি বাচ্চা, তোহার ঘরমে বিমার হ্যায় না ?

জি হাঁ, মহারাজ। আপ ভগবান, সব জানতে,—আজ তো আঠারো রোজ হো গয়া, আজ মিরজাপুরসে ডাকডার আয়া,—কুছ বোল নহি সকতা, পঁচিশ রূপেয়া লে গিয়া মহারাজ—, তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, আজ আপলোক কঁহা রইয়ে গা, আইয়ে না ফাঁড়িকো—

নহি বাবা, হাম লোক ইহাই রহেঙ্গে, কুছ ফিকর মৎ করো—কাল সুবে কো দেখা হোগা বাবা—ভগবান বাঁচানেবালা।

গ্রামখানির নাম শুনিয়াছি ডগমগপুর। আমরা ঐখানেই রাত্রিযাপন করিলাম। প্রভাতেই সেই লোকটি আসিল। অবধূত তাহার সঙ্গে গেলেন, আমায় বলিলেন, তুমি থাকো। প্রায় আট হতে দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। করুণভাবে চাহিয়া বলিলেন,—বেঁচে যাবে,—হরি রাখলে মারবে কে বলো? শেষাবস্থা দেখেই না মীরজাপুর থেকে ডাক্তার এনে পঁচিশ টাকা খরচ করেচে! এই দেনাটুকু যতটা আগে শোধ হোতো ততই শীঘ্র আসান হোতো রোগীর, এখনও কর্ত্তার আরও পঁচিশ আর আনুসঙ্গিক খরচা আরও দশ-বারো টাকা, প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা যাবে, তবে পূর্ণ হবে ভোগ।

আমি বলিলাম, আপনি তো বলচেন বাঁচবে, তবে আবার ডাক্তার প্রভৃতিতে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ খরচ কেন করতে হবে?

আরে বাবা, আমার কথাটা তুমি বিশ্বাস করেচ হয়তো, কিন্তু ও করবে কেন? তা ছাড়া ওর উপদেষ্টারা আছে না, তারা, পয়সা খরচের বেলা কোট-প্যাণ্ট পরা কলিজমে পড়াহ হুয়া ডাক্তার, বিমার দেখানেসে এ সব রোগ সারে,—এই সব ধারণা মাথায় অবিরাম ঢোকাচ্চে যে। তারপর রাস্তার ভিখারি সাধু কখনও রোগীর প্রাণদান দিতে পারে? আমি অবাক, দেখিলাম এই অল্পক্ষণেই কি করিয়া সব বুঝিলেন। যাহা হউক তিনি একবার তাদের ঘরখানার দিকে দেখিলেন তার পর বলিলেন, যা যা হবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি যে। গিয়ে দেখি যে রোগিণীর সমান আর উত্থানের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ ছিন্ন হয়েছিল সেই জন্যই প্রায় খাবি খাবার যোগাড়। এখন তার প্রাণের সঙ্গে যোগ হয়ে গিয়েছে আর ভয় নেই। কর্ত্তার পাশে যে দোস্তটি তার এতে বিশ্বাস নেই, আমায় ছুঁতেই দেয় না। রোগীর যন্ত্রণা দেখে আমি থাকতে পারিনি। সে বলে কি, তুমি কি করবে, ডাক্তারী যন্ত্র দিয়ে ডাক্তার যা করতে পারে না তুমি শুধু এমনি হাত বুলিয়ে কি করবে? যাই হোক বোধ হয় ঐ ছেলেটি আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলেই হবে। চলো, এখন আমরা তো চলি। আমরা চলে যাবার পর এখন থেকেই রোগীর অবস্থা ভালর দিকে যাবে। তারপর যেই ভাল দেখবে, এখন সহজ নিশ্বাস এসেছে কিনা,—সেই বন্ধুই পরামর্শ দেবে আর একবার মীরজাপুর থেকে ডাক্তার আনতেই হবে, দেখচো না এখন একটু ভাল হচ্চে তার চিকিৎসায়? তা হোক, এখন তেজী ওষুধপত্র না খাওয়ায় তো ভালই হবে। ওর গর্ভে সন্তান আছে, বোধ হয় পাঁচ কি ছয় মাস গর্ভবতী।

আমরা চলিতে ছিলাম। তিনি চলিতে চলিতে বলিলেন, ছয়দিন আগে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পর্য্যন্ত রান্নাঘরের কাজ করেছে, যখন আর উঠতে পারেনি তখনই শুয়েচে,—শুনলাম যে।

ঐ দেখো সোয়ামী দেবতা বুঝি আবার আসচে। ও লোকটার একবার আমার উপর বিশ্বাস হচ্চে আবার দোস্তের পরামর্শ অন্য রকমে ভাবচে। লোকটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছে, দেখচো না। দেখিতে দেখিতে হাত কচলাইতে কচলাইতে সে আসিয়া প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিল, কৈসে দেখা,—ও ক্যা জীয়েগা ?

অবধূত বলিলেন, কুছ ফিকর মৎ করো—ভগবান মালিক, সব আচ্ছা হো যাবেগা।

সে বলিল,— বো কেশবলাল বলতে একদফা ঔর ডাক্তার সাহেব কো দেখলা দে—

হাঁ, হাঁ, জরুর দেখলা দো, লেকিন দাওয়া বোগারা যাস্তি মৎ পিলা করো—সব ঠিক আপসে হো যায়েগা—যাও বাবা, ভগবান রক্ষা করেগা।

ঐ ডগমগপুরের সীমানা পার হইয়া চুনারের মাঝপথে আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতে এক অদ্ভুত দৃশ্য চক্ষের সামনে পড়িল। প্রথমে আমারই পড়িল কারণ আমি আগেই ছিলাম। গায়ে ফিতাওয়ালা ব্যানিয়্যান আঁটা, মাথার পাগড়ি পাশে ছড়ানো —ময়লা ছিন্নভিন্ন বস্ত্র এক প্রায়-বৃদ্ধ। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছে আর মুখ দেখিলে মনে হয় তার দুঃখ সহনাতীত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপকা ক্যা হুয়া বাবাজি ?

তাহার কাহিনী বড়ই করুণ। সে বলিল, হামারা সর্বনাশ হোগেয়া বাবা। হামারা সব লুট হোগেয়া কাল রাত কো। এমন সময় অবধূত আসিয়া পড়িলেন, তিনি ঐখানেই বসিলেন, তারপর তাহার সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

লোকটি জাতিতে বৈশ্য, ডগমগপুরেই তার একখানি ছোট্ট মুদির দোকান ছিল। সে বলিতে আরম্ভ করিলে দেখা গেল, সে এমনই পীড়িত, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, তবুও কিন্তু তার এই দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলবার মত কাকেও পাইয়া তার যা কথা মোটামুটি সবটা না বলিয়াও ছাড়িল না। কথাটা সংক্ষেপে এই যে সে ঐ গ্রামেই থাকিত, সুখে-দুঃখে তার দিন কাটিত—তার কেউ নাই এ সংসারে। ছেলেপুলে নাই, স্ত্রীও একমাস হইল মারা গিয়াছে। এখন তার বয়স আঠান্নো বৎসর। ভগবান দিয়াছিলেন তাঁরই চিজ, আবার তিনিই লইয়াছেন, কাকেও নালিশ করিতে নাই। এখন কাশীতে গিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইবে স্থির করিয়া আজ একমাস হইতে তাহার যা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া প্রায় এগারোশো টাকা সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়াছিল। এখানে এই যে গ্রাম এক মাইল আগে ফেলিয়া আসিয়াছি আমরা, সেই গ্রামে তাহার এক শালা থাকে—স্ত্রীর সম্পর্কের ভাই। তার সঙ্গে তাহার ভাব ছিল খুব, তাই তার সঙ্গে দেখা করিয়া এখান হইতে একেবারে কাশী গিয়া উঠিবে এই মনে করিয়াই এখানে তার সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছিল

কাল দুপুরবেলায়। সেখানে শুনলাম, বৃদ্ধটি বলিল, এক হপ্তা হোলো কলকাতা গিয়েচে। তাহলে আমি আর কেন এখানে থাকবো—আজই বিকালে হাঁটা দিয়ে রাত্রে চুনারেই থাকবো বলে কাল বিকালেই ওখান থেকে সোজা হাঁটতে শুরু করেছিলাম। এখানে বরাবর যখন এসেছি প্রায় সন্ধ্যা তখন, হঠাৎ চারজন পিছন থেকে এসে আমায় ফেলে দিলে, তারপর বুকে চেপে বসল, বলে, দে বার করে তোর কাছে কি আছে। প্রথমে দিতে চাইনি, প্রহারে আমি পরে অজ্ঞান হয়ে যাই। আমায় উলঙ্গ করে, আমার টাকা নোট সব রাখা ছিল একটা গেঁজের মধ্যে, সব নিয়ে আমায় আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছে। আজ সকালে জ্ঞান হতে আমি আর চলতে না পেরে এইখানেই বসে আছি। এমন একটি পয়সা নেই যে কিছু খাই, তারা আমাকে এখন ভিখারী করে গিয়েছে। এই তার ইতিহাস।

তার কথা শুনিয়া অবধূত তাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, চুনার এখান হতে কত দূর?

সে বলে, চার মাইলের কম নয়। কিন্তু যে গ্রাম পিছনে এইমাত্র ছেড়ে এসেছি সেটা বেশী দূর নয়, কাছেই, মাইলখানেক।

তা আমরা জানি, কারণ এই একটু আগেই তো আমরা সেই গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। এখন অবধূত বলিলেন, তা তুমি বোসো, আমি তোমার জন্য কিছু খাবার সংগ্রহ করে আনি। বলিয়া তিনি চলিলেন।

তখনই দ্রুতপদে যাইয়া তাঁহার সামনে গিয়া জোড়হাতে বলিলাম,—প্রভু, আমায় এভাবে দণ্ড দেবেন না, আমারই যাবার কথা, বিশ্বাস করুন প্রথমেই নিশ্চয় যাব মনে ছিল, কিন্তু এতক্ষণ তো তার কথা শুনতেই গেল —আমার অধিকার কেন আপনি কেড়ে নেবেন? তিনি কিছুতেই রাজী হন না, বলিলেন,—এমনই একটি সেবার গৌরব থেকে তুমিই বা কেন আমায় বঞ্চিত করবে? তুমি বরং এর কাছে থেকে একে একটু প্রবোধ দাও—বলবে ভগবান যখন প্রাণে বাঁচিয়েছেন তখন অমন কত এগারোশো হবে।

সে কাজটা আপনার পক্ষেই সার্থক হবে বলিয়া তাঁহার কথা না শুনিয়াই আমি হনহন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।

তখন তিনি বলিলেন, দেখো, শোনো, যখন আনবে তৈরী খাবারই এনো, কাঁচা মাল হলে বেচারার পথের মাঝে যেতে দেরি হয়ে যাবে।

বিধাতার বিধান অথবা অবধূতের শুভ ইচ্ছা বুঝিতে পারিলাম না, এক দোবেজীর ঘরে উঠিয়া সকল কথা বলিতেই সে তাহার চৌকায় যা যা তৈরী ছিল বেশ করিয়া পিতলের এক থালায় সব দিয়া এক গামছায় বাঁধিয়া সঙ্গে একজন লোক, লোটাভরা পানীয় সমেত পাঠাইয়া দিল—আমার কিছুই দেরি হইল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া পড়িলাম। তাহাকে খাইতে বসাইয়া আমরা চুনারের দিকে পা বাড়াইলাম।

আমরা আজ চুনারে আসিয়া গেলাম। গঙ্গা দেখিয়া কি সে আনন্দ! আমরা কেল্লার নীচে একটি আশ্রয়ও পাইলাম, কিন্তু সেখানে অবধূত থাকিতে নারাজ। স্থানটি যদিও গঙ্গার কাছে, তা হইলেও খানিকটা বসিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, চলো দুর্গাবাড়ি যাই।

আমার মনে ছিল এইস্থানেই থাকা যাবে ভালো, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তিনি শেষ যখন দুর্গাবাড়ির জঙ্গলেই যাইবার জন্য উঠিলেন আমি পশ্চাদনুসরণ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁর স্নেহ, আমার মৃদু গতি দেখিয়াই আমার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়া লইয়াছেন। মাঝপথে একটু দাঁড়াইলেন, আমি অনেকটাই পিছনে ছিলাম, নিকটে আসিবামাত্র আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, দেখো আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না কোনটা ভালো বা কল্যাণকর, কোনটা নয়,—আজ দুর্গাবাড়িতে যাওয়াই ভাল হয়েছে কি করে বুঝলাম জানো?

আমার সেটা জানিবার সম্ভাবনা কোথা, তাই চুপ করিয়াই আছি, তিনি বলিলেন, আমি যখনই ঐ গঙ্গার ধারে থাকবার সংকল্প করছিলাম, ঠিক ঐ সময়ে আমায় কে যেন দুর্গাবাড়ির জঙ্গলের দিকেই টানতে লাগলো, বুঝলাম যাওয়াই তাঁর অভিপ্রায়, ঐ যে আমার টান ঐটাই তার লক্ষণ।

প্রথমে যাইতে অনিচ্ছার কারণ, আজ অনেকটাই হাঁটা হইয়াছিল। আমি তাই বুঝিলাম, কিন্তু তাঁর কথা শুনিবামাত্রই আমার মনে একটা অনুশোচনা জাগিয়াছিল এবং তখনই বঝিয়া লইলাম, ইহার মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা খানিকটা তো আছেই, আমারও কিছু লাভ আছে। ঠিক এইটুকু বুঝিয়াই চুপ করিয়া রহিলাম। দেখিয়া তিনি বলিলেন, খিদে পেয়েছে? জানি,—ওখানে গিয়েই প্রসাদ পাবে, তারপর আজ ওখানে থাকা যাবে,—বেশ হবে না?

তখন আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি আর একটিও কথা কহিলেন না।

খুব বেশী দূর নয়, পাহাড়ময় জঙ্গলে কি চমৎকার পরিবেশ, আমার আর কোন ক্লান্তি নাই, মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল। সামনেই দেখি একদল ঐ দিক হইতেই আসিতেছে,—দেখিতে দেখিতে তাহারা আসিয়া পড়িল।

দলে পাঁচ-ছয়জন,—ভয়ঙ্কর শক্তিশালী মূর্ত্তি, প্রত্যেকেরই কপালে একটা করিয়া সিঁদুরের ফোঁটা, কাছে আসিতেই দেখিলাম সেই বিন্ধ্যাচলের দল—যাহাদের অবধূত ডাকাত বলিয়াছিলেন তাহারাই। তাহাদের মধ্যে আগে যে ব্যক্তি ছিল, অবধূতকে দেখিয়াই, পাও লাগে বলিয়াই পদস্পর্শ করিতে আসিল, অবধূত তিন হাত পিছাইয়া গেলেন, স্পর্শ করিতে দিলেন না। তাই দেখিয়াই তাহারা সবাই দাঁড়াইয়া গেল,—তিনি দাঁড়াইলেন না, চলিতে লাগিলেন। দলপতি একটু অগ্রসর হইয়া দুই হাত বিস্তার

করিয়া দাঁড়াইল, যাইতে দিবে না। মুখে মদের গন্ধ।

আশ্চর্য্য, অবধূত দাঁড়াইলেন, প্রসন্নমুখে তাহার দাড়িটি ধরিয়া যেমন ছোট ছেলেকে আদর করে সেই ভাবে ধরিয়া, যাতে দেও, বাবা—

হামসে নারাজ হুয়া মহারাজ,—ক্যা কসুর হামারা? বাৎলানা।

ক্যা বাৎলাউ, গরীবকো সব কুছ লুট লিয়া, কুছ রাখ্যা নাহি, এক পয়সা খানেকো নাহি রাখ্যা,—ও রোতা হৈ আপনে আঁখসে দেখা—ক্যা বাৎলাউ।

শুনিবামাত্রই তাহার মুখের যে ভাব দেখিলাম তাহাতে আমার মধ্যে বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আমি একটু দূরেই ছিলাম, অবধূতকে দেখিলাম, যেন অল্প দুই-একটি কথা বলিয়া সরিয়া আসিতেছিলেন,—কণ্ঠস্বর একে তো অত্যন্ত মৃদু তাহাব উপর করুণ। বিবশ মুখের ভাব, দেখিলাম চক্ষু দিয়া ধারাও গড়াইতেছে।

তিনি ঐ সর্দ্দারের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন,—কাশীবাস করতে যাতে থে, শিউজিকা ভকৎ, উনিকো এয়সা হাল, হায় ভগবান! যেন এই কথা বলিয়াই অবধূত সরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলেন। দেখি সর্দ্দার বাবাজীর টনক নড়িয়াছে, চক্ষু ছলছল, মুখের ভাবও আলাদা,—সে আবার কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিতে গেল, তিনিও আবার সরিয়া গেলেন। তখন সে যেন বড়ই কাতর হইয়া যে কয়টি কথা বলিয়া আবার তাঁহার নিকটস্থ হইল, তাহার মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত কথাটা আছে—সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং কি করিলে পাপমুক্তি হইবে তাহাই সে জিজ্ঞাসা করিতেছে বোধ হইল। অবধূত যে কি বলিলেন তাহাকে তাহা আর শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু তার পরই সর্দ্দার তাহার দলে চলিয়া গেল। তার পর তাহারা স-দল রেললাইনের দিকেই চলিতে লাগিল, আমরাও দুর্গারণ্যের পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। অবধূত একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না, আগে আগে সোজা চলিতেছেন, আমি পিছনেই আছি। খানিক চলিয়া তিনি বসিলেন, এক পাথরের উপর; আমিও অল্পক্ষণেই কাছে আসিয়া গেলাম। তখন বলিতেছেন,—আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেছ! আমি জিজ্ঞাসু। তিনি বলিলেন,—দেখো একদিকে সে বেচারার পীড়ন, কত বড় একটা আশাভঙ্গ, অন্যদিকে এদের বৃত্তির উপজীবিকা, এখানে বল তো—ভগবান কি করবেন? বলিয়া আমার দিকে এমন ভাবে দেখিলেন, যেমন শিক্ষক ছাত্রকে পাঠ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমার তো কথা বলিবার ভাষা নাই, চুপ করিয়াই আছি দেখিয়া আবার বলিতেছেন, আমায় বলে কি, যে পাপ হয়েচে তার কি প্রায়শ্চিত্ত বল, আমি করবো!

শুনিয়া আমি মহা কৌতূহলী হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি কি বললেন?

আমি তাদের ঐ টাকা তাকে ফিরিয়ে দাও, কি দিও না এরকম কিছুই বলিনি, শুধু

বললুম, যার কাছে তুমি অপরাধী তাকেই জিজ্ঞাসা করগে ঐ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি ? তখন জিজ্ঞাসা করচে, তাকে এখন পাবো কোথায় ? তখন বললাম যেখানে বেখে এসেছিলে সেইখানেই পড়ে আছে দেখোগে যাও।

আমি বলিলাম, ভগবানের বিচার ঠিকই হয়েচে।

শুনিয়া তিনি বলিলেন, তুমি তো বললে ঠিক হয়েচে, আমার সন্দেহ আছে যে। ভগবান যে পক্ষপাতশূন্য,—আমাব একটু ঐ দোষ যেন রয়েচে মনে হোলো। দয়াব মধ্যে এতটা ব্যাপাব থাকিতে পাবে জীবনে এই প্রথম দেখিলাম।

আমি বলিলাম, দয়াবৃত্তি তো সত্ত্ব গুণেব, ঐ সত্ত্ব গুণই তো সাধুর আশ্রয়, ওটা গেল ত রইল কি, কি নিয়ে থাকবেন ?

হাসিয়া তিনি বলিলেন, কথা হচ্ছিল ভগবানেব বিচাবেব, নয় কি ? আর কথায় কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে। জগদম্বা এখন অন্ন ভোজনেব কি ব্যবস্থা করেছেন, চল দেখি। হয়তো অসময়েই গিযে পড়বো।

অসময়ে গেলেও, যে সময়ে পূজা ও ভোগেব সব কাজ শেষ করিয়া নিজে প্রসাদ গ্রহণের পূর্ব্বে পূজারী দেখিতে আসিয়াচেন বাইবে কেউ অভুক্ত আছে কিনা, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমরা উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম 'ইনি মানুষ চেনেন,—অবধূতকে দেখিয়াই অগ্রসর হইয়া প্রণাম এবং যেভাবেব অভ্যর্থনা কবিলেন মনে হইল পূর্ব্বে হয়তো পবিচয় কিছু ছিল এঁদের মধ্যে। আমাব দিকে চাহিলেনই না।

অল্পদূরেই একটি ঝরণা আছে, প্রসাদেব পব সেইখানে যাইয়া বসিলাম। কি মনোবম প্রাকৃত দৃশ্য এখানে, যেন জননীর কোলে উঠিয়া বসিয়াছি এবং সেইখান হইতেই চারিদিক দেখিতেছি। অবধূত স্থির বসিয়া আছেন,—অল্পক্ষণ পবেই তিনি, আমি একটু শুই, তুমি বসে থাক এখানে, যতক্ষণ আমি শুয়ে থাকব ততক্ষণ কোথাও যেও না। যেমন শুইয়া পড়েন শবাসনে, শুইয়া আগাপাসতলা ঐ বস্ত্রখানি ঢাকা দিলেন। ক্রমে লক্ষ্য করিলাম শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হইয়া গেল, ঠিক যেন একটি শব বস্ত্রাবৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে আর আমি আগলাইয়া বসিয়া আছি। এইভাবে কাটিল প্রায় আধ ঘণ্টা হইবে। আমার একটু আলস্য আগেই আসিয়াছিল। তিনি তো আজ্ঞা করিয়া শুইতে গেলেন, আমার নেশা ছুটিয়া গেল। আলস্যটা একটা কৌতূহলেই ভাঙিয়া গেল। অনেক নিদ্রা দেখিয়াছি, কিন্তু এমন শবাসনে নিদ্রা দেখি নাই।

একটি মেয়ে শ্রমজীবীদের, বারো-তেরো বৎসরের হইবে, কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছে—এখান হইতে বেশ দেখিতেছি, সে আমাদের দিকেই আসিতে লাগিল। তার সঙ্গে একটা কুকুরও আসিতেছে,—এই দুর্গাবাড়িরই কুকুর, প্রসাদ পাইয়া থাকে—এখানকার সব কিছুই তার চেনা। আমাদের দিকেই মেয়েটি আসিতে লাগিল। কুকুরটি তার আগেই আসিয়া

অবধূতের আপাদমস্তক ঢাকা মূর্ত্তি দেখিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল ,—সে কি ভয়ঙ্কর ডাক ! মেয়েটিও দেখিল, আমি বলিলাম, বো কুত্তা চিল্লাতা কাহে ?

সে বলিল, বো মুরদা দেখকর চিল্লারহা ।

আমি বলিলাম, ফির মুরদা মৎ বলো, বো হামারা স্বামীজী, শো রহা ;

মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়াই বলিল, এইসি তরে মুরদা মাফিক কোই শোতে ? হামরা সোভে হোতো সাএদ উনহিনে মুরদা বনগয়া হোগা । আমি কথা কহিলাম না । বুঝিলাম আমারও ঐ বালিকার দশাই হইত যদি বহুবার না দেখিতাম । এই জন্যই কি বলিয়াছিলেন যতক্ষণ না উঠি ততক্ষণ তুমি শুয়ো না, কোথাও যেও না ইত্যাদি । এটা জঙ্গলময় স্থান বলিয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন । ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ারম্ভ—আর অল্পক্ষণেই অঙ্গ নড়িল আর তার পরেই উঠিয়া বসিলেন ।

তিনি উঠিয়া বসিলেন, আমায় বলিলেন, এখানে কেউ এসেছিল ? বলিলাম যেটুকু নাটকীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল । এবারে একটু হাসিয়া বলিলেন, এটা জঙ্গলময় স্থান কিনা, আর তুমি কাছে ছিলে, তাই না আমার শোয়া সম্ভব হোলো । আর কিছু দেখোনি ?

বলিলাম, না,—আর কি দেখবো ?

বলিলেন, এ জঙ্গলে আগে বাঘ ছিল, এই জঙ্গলটা ছিল বিরাট জঙ্গল, দুর্গাজঙ্গল এর নাম । এখানে আগে অনেক কিছুই হয়ে গিয়েচে , আগেকার সময়ে নরবলি হোতো । এটা ডাকাতের দুর্গা , তান্ত্রিক ভৈরবদের ঐটি বড় পীঠস্থান ।

আগে এখানে আপনি এসেছিলেন ?

আগে দুবার এসেছিলাম , প্রত্যেক বারেই নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে গিয়েছি । এবারেও বৃথা যাবে না বোধ হয় । দেখ না সন্ধ্যা হোক ।

আমি বলিলাম, চলুন যাওয়া যাক, আর বাইরে কেন ?

কোথায় যাবে, আজ এইখানেই তো রাত্রিবাস ।

কেন, মন্দিরে যাবেন না ?

তুমি ভয় পেলে নাকি, যাবো যাবো—মন্দিরের কাছেই থাকবো । এখন তো কয়েকখানা ঘর দেখচো, আগে কিছুই ছিল না—ভয় করতো ! কিন্তু জেনে রেখো—এ স্থানের একটা মাহাত্ম্য আছে ।

এ স্থানের মাহাত্ম্য আছে উহা আজ রাত্রে এখানে থাকিয়াই বুঝিলাম, কিন্তু সে কথা বলিবার মত নয় । বলিতে চেষ্টা করিলে বিফল হইবার সম্ভাবনা ষোলো আনা, তাই না বলাই ভালো ।

যাই হোক, রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা হাঁটিয়া চুনারে ফিরিলাম ।

আমরা যখন রেল লাইনের কাছাকাছি আসিয়াছি তখন ঝমঝম জল আরম্ভ হইল ।

প্রথমে ঘোর ঘনঘটা অবধূতই দেখিয়াছিলেন এবং আমাকেও দেখাইলেন, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তা ছাড়া পিছনেই ঘন মেঘ ছিল তাই লক্ষ্য করি নাই। তিনি আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিলেন, চাদরখানা, যার নাম বহির্বাস, গা হইতে খুলিয়া কোমরে জড়াইলেন, কোমরের কৌপীন হইতে বড জোব হাঁটু পর্য্যন্ত জডাইয়া অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় ঐ ভাবে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিলেন, ঠিক মনে হইতেছে না গান আরম্ভ করিয়াছিলেন কিনা। রেল লাইন সেখান হইতে দেখা যাইতেছিল। অবধূত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবে গদ গদ হইয়া আমায় বলিতেছেন, দেখো, দেখো,—প্রাণ ভরে দেখে নাও।

সেই মেঘাডম্বর, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ—দেখিয়া, ভিজিতে ভিজিতে আমরা চলিতেছি। নিকটেই পাথর কাটা হইতেছিল, ছাতা মাথায় এক সাহেবী পোশাক বাবু দাঁডাইয়া সেখান হইতে অবধূতেব কাণ্ড দেখিতেছিলেন,—ঝমঝম জল আসিতেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে, এই দিকে আসুন, বলিয়া ডাকিলেন। অবধূত শুনিতে পাইয়া আমার দিকে দেখিলেন। আমি তাঁহার নিকটস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদেরই ডাকচে না? ততক্ষণে সেই সাহেব ছাতা হাতে জোবে জোবে পা ফেলিয়া আসিয়া ছাতাটা অবধূতের মাথায় ধরিলেন,—তুমি কে বাবা, পথের সহায়—বলিয়া তাহার দাডিতে হাত দিয়া আদর করিলেন।

সে বলিল, আসুন, ভিজে যাবেন, কাছেই আমাদের শেড্ আছে, চলুন সেই-খানে বসবেন।

আমরা শেডের মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হইল। কি আনন্দ অবধূতের—তাঁহার মনের কথাটা এই, বাহিরে আসিয়া একবার বৃষ্টির মুষলধারার সঙ্গে মাতিবেন। কিন্তু আমি এবং সাযেব এই দুজনের প্রতিবাদেই নিরস্ত হইয়া অসহায় বালক একটি অভিভাবকের তাডনায় যেমন চুপ করিয়া থাকে সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন।

সায়েবটি ছোকরা, বেশ সাত্ত্বিক প্রকৃতি। আমাদের ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন। আমি বলিলাম, এখানে খাওয়া সুবিধা হবে কি? আপনার—

বাধা দিয়া সায়েব বলিলেন, আমরাও হিন্দু, আমিও নিরামিষাশী, এখানে আপনাদের কোন অসুবিধাই হবে না। সঙ্গে ব্রাহ্মণ আছে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর কোন কথা না বলিয়া আমাদের ব্যবস্থা করিয়াই আসিলেন। অবধূত—না রাম না গঙ্গা কিছুই বলিলেন না। এ সব তাঁর সহজ।

সায়েব আমাদের ভোজন করাইয়া ছাডিলেন। আজই দেখিলাম অবধূতের মধ্যে সকল বিষয়েই এক সংযত ভাব, যেভাবে প্রতিদিন চলেন, ওঠা-বসা করেন তার যেন

ব্যতিক্রম। প্রথম ঐ মেঘের আড়ম্বরে দেখিলাম, পরে ভোজনের বেলাও। যে লোক একখানা রুটি, একটু তরকারি খান, প্রায় পনেরো দিন দেখিতেছি, ঘি দুধ পরমান্ন প্রভৃতি যৎসামান্য গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত, আজ এই সায়েবের চৌকায় বসিয়া প্রায় জোয়ান মানুষের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট গব্যঘৃতসিক্ত আট-দশখানা রুটি, অন্ন সূক্ষ্ম আতপান্ন, আচার মুগের দাল একপাত্র দধি ক্ষীর পেড়া চার-পাঁচটা। সায়েব বড কম আয়োজন করেন নাই এই দুটি সাধুর ভোজনে, শেষে পান পর্য্যন্ত কতকগুলি আনাইয়া সকল আয়োজন সার্থক করিলেন। দ্বিপ্রহরের পর ভোজনান্তে আমরা অল্পক্ষণই বিশ্রাম করিয়া উঠিলাম।

বিদায়কালে সায়েব বলিলেন, ব্যবসার খাতিরেই এখানে থাকতে হয় একলাই থাকি, দেশের মানুষ দেখলে বড় আনন্দ হয়, তার উপর সাধু আপনারা, আমাদের ভক্তির পাত্র, কিন্তু আমাদের এমনই মূঢ় চিত্ত, অদৃষ্টে আপনাদের মত মহাত্মাদের সাক্ষাৎ পাওয়াই যায় না। এদিকে এলে দয়া করে আসবেন। বলিয়া জোড়হাতেই প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন। অবধূত সেই মুখ বুজিয়াছেন, সে মুখ আর ইতিমধ্যে খুলিলেন না। এতটা পর্য্যন্ত হইল এপারের কাণ্ড, এবার রেল লাইন পার হইয়া গঙ্গার দিকে আমরা আসিলাম।

গতকাল ও আজ দিনটাই আশ্চর্য্য কতকগুলি ঘটনায় আমার পক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়াই আছে, রেল লাইনের এপারে আসিয়া আর এক কাণ্ড! যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই আজ তাহাই হইল।

এই কাল মধ্যে আমার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব অনুভূতি আরম্ভ হইয়াছে, যখনই যেখানে থাকি না কেন, অবশ্য তাঁরই সঙ্গগুণে এবং যোগাযোগের ফলে, আমি তাঁহার গতিক, মন এবং ভাবের দিকে তাঁহার গতি বুঝিতে পারি। আরও এমন কিছু অনুভব করি যাহা ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশের চেষ্টা বৃথাই হইবে। এখন এখানকার ব্যাপার যা যা ঘটিল, অবধূতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আজ এই ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে যতপ্রকারে দেখিয়াছি এবং পরিচয় পাইয়াছি তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তবে অবধূতের নিজ মূর্ত্তিরও বাহ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই, একইভাবে স্থির রহিয়াছেন। বাহ্য ভাব বা আমার সহিত ব্যবহার একই আছে তবে সেই যে আজ এখানে আসিবার সময় রেল লাইনের কাছে সায়েবের আশ্রমে মুখ বন্ধ করিয়াছেন এখনও সেই ভাবেই আছেন, নড়াচড়া করিতেছেন কিন্তু মুখ খোলেন নাই।

প্রথমে দুর্গের নীচে অবশ্য একটু তফাতে গঙ্গার ধারেই এক জায়গায় আমরা বসিলাম। স্থানটি বেশ পরিষ্কার, নিকটেই দেবালয়, তাহার পর খানিক জমিতে ফুলের গাছ; তাহার উপর খানিক উঠিয়া পথে পড়িতে হয়। নির্জ্জন স্থান দেখিয়াই আমরা বসিয়া ছিলাম। এই দ্বিপ্রহর বেলায় একে একে কোথা হইতে লোক আসিতে লাগিল; একজন দুইজন করিয়া আসিয়া অবধূতকে প্রণাম করিয়াই বসিয়া যায়। বোধ হয় আশা, হয়তো উনি

কিছু বলিবেন। কিন্তু উনি অবাক হইয়াই দেখিতেছেন। মাঝে মাঝে এরা আসিতেছে, যেন কাহার কাছে ইহারা আসিয়াছে তা জানেন না, ইহার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। চমৎকার অভিনয়, আমি প্রথমে একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই ছিলাম। তাঁহার মধ্যে কোনও এষণাই নাই, না লোক-এষণা, না বিত্ত-এষণা, তবে আজ হঠাৎ এমন স্থানে এতগুলি লোক আসিয়াছে কেন, কাহার কাছে আসিয়াছে? এ ব্যাপার কি? ইনি তো দেখি কালা এবং পাহাড় দুইই, সেই তো সায়েবের আশ্রয় হইতে গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়াছেন,



বরাবর উহা এখনো পর্য্যন্ত ঠিক রাখিয়াছেন, তিলমাত্র ব্যতিক্রম দেখিলাম না। ওঁর অবস্থা যাই হোক, আমার অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিল। যাহা ঘটিল জীবনে প্রথম, পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। সেই কথাই বলিতেছি।

অল্পক্ষণে আমার শরীরটা স্থির হইয়াছে—দেখিতেছি কি! এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি! প্রায় তেরো-চোদ্দজন স্থানীয় লোক বসিয়া আছে। এদের ঐ মুখাকৃতি চক্ষু সব কিছু

ঠিকই রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের বিচিত্র বেশ, প্রত্যেকেরই বয়স আকৃতিও ভিন্নই, কিন্তু তাব মধ্য দিয়া অদ্ভুত একটি কিছু উঁকি মারিতেছে যাহা প্রত্যেকের মধ্যে দিয়া প্রকাশিত হইলেও একই। এই তো ব্যাপার। এমন কি অবধূতের মধ্যেও দেখিতেছি, তাঁহার সেই অবাক দৃষ্টির ভিতর দিয়া ঐ সত্তাটিই দেখিতেছি যা আব সবার মধ্যে উঁকি মারিতেছে। সবাই এক আমি সত্তা লইয়া আমারই সম্মুখে বসিয়া আছে। এ সকল আমি, আমারই স্বরূপ, দেখিতে দেখিতে আমিই সবার মধ্যে রহিয়াছি এই বোধ, আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যতঃ এতগুলি ভিন্ন মূর্ত্তি যেন উবিয়া যাইতেছে। এ আমার কি হইল! আমি এক-একবার অবাক বিস্ময়ে খুঁজিতেছি আমার বিশেষকে, আমার রূপ তো আমি দেখিতে পাইতেছি না। শরীর, মনবুদ্ধি ও স্মৃতি লইয়া যে অনুভব তাহাকেও পাইতেছি না। হে ভগবান, এ কি খোলসে ঢাকা যে সত্তা খোলস ছাড়িয়া যেন বাহিবে আসিয়া সবার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, খেলায় আসিয়া সবাই এইখানে ধরা পড়িয়াছে।

ক্রমে দেখিলাম, অবধূত তাঁহার আপন আসনেই সেই অবস্থায় নির্ব্বাক বসিয়া। তার মধ্যে তিনিও দেখিতেছেন, এক বিচিত্র ভঙ্গিতে, সবার দিকেই দেখিতেছেন, যেমন আমি দেখিতেছি, আমাব দিকেও দেখিতেছেন, এক-একবাব তাঁহার সত্তাও সবার সঙ্গে এক হইয়া রহিয়াছে আমি তাহা অনুভব করিতেছি। আমারই মধ্যে আরও দেখিতেছি ঐ আপ্তপুরুষের গভীব অনুভূতি আজ আমায় স্পর্শ করিয়াছে। এ অনুভূতি তো আগে ছিল না, আজ এই গ্রামবাসীদের আবির্ভাব উপলক্ষ করিয়াই মহানন্দময় এই বিচিত্র অনুভব। আমার আর কোনদিকেই দৃষ্টি নাই, এবং ঐ সর্ব্বঘটেব আমির সঙ্গে আমার অস্তিত্ব এক হইয়া আমাকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ভগবানেব ইচ্ছা অবধূতের মধ্যে কৃপা করিতেছে আগে ইহা অনুভব করিয়াছিলাম, এখন অবধূতের আশীর্বাদ কৃপা আমাতে আসিয়া লাগিয়াছে তাহা নখদর্পণে দেখা নয় আমার অস্তিত্বের মধ্যে অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম।

অনেকক্ষণ এই অনুভূতির একতানতা নষ্ট হয় নাই, বিক্ষেপ আসে নাই। এই সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে একজন ছিল, সবার পশ্চাতে, তাহার বিক্ষেপ হয়তো ক্রিয়া করিত, অপর সবার উপর যদি না অবধূত এই জনগণের কেন্দ্রে থাকিতেন। দেখিলাম এই প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে সে দুই-তিনবার উঠিয়া গেল এবং অল্পক্ষণেই আবার আসিয়া বসিল, এইরূপ বার বার। তাহাকে অত্যন্ত অবসন্ন দেখাইতেছিল, যেন উন্মাদ; বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই, এমন কি মাথায় পাগড়ি বা টুপী কিছুই ছিল না, যাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তাহার মুখ দেখিলে দয়া হয়।

যাহা হউক, এখন অবধুত ইচ্ছা করিয়াই হাট ভাঙিয়া দিলেন। যাহারা বসিয়াছিল তাহারা একটিও কথা কহে নাই। এ এক আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই দশ-বারোজন

কিভাবে কোন কথা না কহিয়া ছিল এতক্ষণ সেটাও ভাবিয়া দেখিলাম। জানি না তাহারা কি দেখিয়াছিল ও কি অনুভব করিয়াছিল। তাহারা সাধু দর্শনে, ধর্ম্ম করিতে আসিয়াছিল, কিছু কিছু হাতে করিয়াও আসিয়াছে, তবে এভাবে এতক্ষণ বসিতে বাধ্য হইবে তাহা হয়তো ভাবে নাই। মনে হয় এটা ঠিক অবধূতের নির্ব্বাক অস্তিত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহারা কিছু দেখিয়াছিল বা এমন কিছু পাইয়াছিল যেজন্য তাহারা চঞ্চল বা অস্থির হইতে পারে নাই। অবধূতের উপরই তাহাদের দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই নিবদ্ধ ছিল দেখিয়াছি,—একটি কিছু অনুভূতির ব্যাপার না থাকিলে তাহাদের মত সাধারণ বহির্মুখী জীব কি লইয়া এতক্ষণ কাটাইয়াছে!

আরও চমৎকার এই যে, যখনই অবধূত আসন ভাঙিলেন, অমনি কোন কথা না বলিয়া একে একে উঠিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক যাহা আনিয়াছিল পায়ের কাছে রাখিয়া একে একে চলিয়া গেল। সেই বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকটি সবার শেষে আসিল এবং গেল না। অবধূত তাহাকে দেখিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই বলিলেন না। এখন যেন একটা কিছু ভাবিতেছিলেন। যখন সবাই চলিয়া গিয়াছে তখন আনন্দে অধীর আমি, বলিলাম, আজ কি ব্যাপার যে হোলো কিছুই বুঝলাম না, এমন তো কোন দিনই হয় নাই—সেই প্রয়াগ থেকে—

উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমিই জানো, আমিও তো দেখলাম কত কি, ভাবলাম তোমার মধ্যেই ঘটেছে কিছু।

বলিলাম, আমার মধ্যে ঘটেছে বলে এরা এসেচে অথবা এরা এসেচে বলে আমার মধ্যে ঘটেচে এর মীমাংসা করবে কে? আমি কি পদার্থ যে—

যেন কিছুই জানেন না এমনিই ভাবে আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, বল তো কি রকম হলো তোমার? দেখি তখন হতেই তোমায় আনন্দে স্থির থাকতে দেয়নি।

বলিলাম, আজ সবার মাঝে একাত্ম দর্শন, সবাই আমরা একই সত্তা এই অনুভূতি সর্ব্বক্ষণ ছিল আমার মধ্যে—এখনও যেন তার রেশ সমভাবেই আছে, কিন্তু আপনার আসন ভাঙবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ণ জীবন্ত ভাবেই ছিল। এমনটি আগে আমার হয়নি।

শুনিবামাত্র তিনি বলিলেন, যার খেলা তিনিই এটা দেখিয়েছেন, এ নিয়ে বেশী কথায় কাজ কি? এটি যাতে পাকা হয়—তাই করতে হবে।

কেমন করে পাকা হবে আমায় দয়া করে বলুন আপনি।

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, জোর করে তো হবে না, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যদি একবার হয়েছে, অন্তঃকরণ নির্ম্মল থাকলে, স্মরণ-মনন রাখলেই হবে। অনেক সৌভাগ্যে এটি হয় জেনো, এই স্বাভাবিক সম্পর্কটি দেখা—স্বরূপের এই আভাস।

আমার আনন্দ এমনই দোলাইতেছে যেন বেগ ধারণ আর সম্ভব হইতেছে না, সোজা

গিয়া তাঁহার পায়ে মাথাটি রাখিয়া পড়িলাম, তিনি সোজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহুবলে আমায় তুলিয়া আ'লিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন।

আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই যে, ঐ লোকটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে এবং দেখিয়াছে আমাদের ঐ ভাবমূলক ব্যবহার যা কিছু। এটা যেই লক্ষ্য পড়িল অবধূত বলিলেন, চলো —আমবা একটু ঘুরেফিরে বেড়াই, চুনারে অনেক দিন পরে যখন আবার এসেছি। ধরিত্রীর টান বড টান। আমরা বাহির হইলাম।

আশ্চর্য্য, যেখানেই আমরা যাইতেছি লোকটিও ঠিক পিছনে পিছনে আছে; সাহস করিয়া কাছে আসিতে পারিতেছে না। অবধূত ঠিক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ও সাহসের অভাবেই কাছে আসিতে পারিতেছে না; কি জানি আরও কিছু হয়তো বুঝিয়াছিলেন, যাহা অনুমান করিবার সাধ্য আমার নাই। দয়াময় অবধূত কি সুন্দরভাবেই তাহাকে তাহার কথা বলিবার অধিকার, কতকটা পরেই অবশ্য করিয়া দিলেন, ভাবিতেও চমৎকার লাগে।

এখন উহাকে দেখিয়া আমার কাছে আসিলেন, তাঁর হাতখানি কাঁধে রাখিয়া একটু দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিলেন, তারপর আমায় ঠিক যেন কানে কানে বলিলেন, সংযত হও, আরও কিছু আছে। আজ কি ক্ষণেই এখানে এসেছিলাম, ভালয় ভালয় রাত্রিটা কাটলে বাঁচি। তাঁহার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিত্ত যেন শান্ত হইয়া গেল, —তিনি একটি বৃক্ষতলে যাইয়া বসিলেন। আমিও গেলাম। কতক্ষণ পরে সেই লোকটাকেও সেথা দেখা গেল।

প্রায় সূর্য্যাস্ত কাল। অবধূত বলিলেন, চলো একটু বেডাই, একটু ফাঁক থেকে ঐ সূর্য্যাস্ত দেখবো। বলিয়াই উঠিলেন এবং চলিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম স্থান-ত্যাগের মতলব নয় তো? তবে জানিতাম আজ তাঁর এখান হইতে চলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়, ঠিক সূর্য্যাস্ত দেখিতেই উঠিলেন। আমরা অনেকক্ষণ দেখিলাম, সে দৃশ্য বর্ণনার ভাষা নাই।

আমরা অতটা লক্ষ্য করি নাই যে, সেই লোকটা পিছনে পিছনে আসিতেছিল। অবধূতও দেখেন নাই। বোধ হয় এই ব্যাপারটি তাঁহার ইচ্ছাকৃত, তিনি জানিতেন তবে কিছুতেই বুঝিবার সুযোগ আমায় দেন নাই। যাই হোক একখানা পোড়ো বাড়ির কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, বাড়িটা দেখ তো, কেউ থাকে না বোধ হয়, চল দেখি। বলিয়া অগ্রসর হইলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়াই পিছনে চলিলাম। সামনে সবটাই ভাঙা পাথরের কাঁড়ি—তারপর উঠানের শেষে একখানা ঘর, চারিদিকের দেয়াল আছে বটে তবে ভাঙা, দরজা-জানালা নাই। ভিতরেও কিছু নাই, পাশের ঘরখানার দুদিক দেয়ালের অর্দ্ধাংশ আছে, ছাদ নাই আর পাথরের কাঁড়ি মাঝখানে। আজ

তাঁর এ ভাবের বিপরীত কাণ্ড কেন? চারিদিক দেখিয়া তিনি পথে আসিলেন, —তখনও সেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে।

অব বোলো বাবা, তুমহারা কহানী। এমন ভাবে বলিলেন, ঐ প্রকার কথা শুনিতে তিনি চিরদিনই অভ্যস্ত। তারপর অবধূত একটু বসিলেন, তাহাকেও বসাইলেন, সস্নেহে বলিলেন, এতনা চঞ্চল কিসিবাস্তে?

সে বলিল, ক্যা বঁলু মহারাজ, বিকধর পাণ্ডে তো হামাবা সর্ব্বনাশ কর দিয়া, অব তো ভাগ রহা। হামারা সব কুছ লে লিয়া, সব ফাঁকিমে গিরায় দিয়া, আভি তো মরতা হৈই, বলিয়া তাহার যে রহস্য উদঘাটিত করিল এমন কখনও শুনি নাই। বিকধর পাণ্ডের সঙ্গে তার বাল্যকাল হইতেই বন্ধুত্ব। কয়েকজন জ্ঞাতি তাহার শত্রু। তাহার পুত্র-কন্যা নাই বলিয়া মৃত্যুর পর সব কিছুই লইবে, এই বলিয়া তাহাকে প্রায়ই শাসন করিত। তাহাতে সে তাহার দুখানা ভাড়াটিয়া বাড়ি, আর বসতবাটি জমি সব কিছু বিকধরেরই পরামর্শে বিক্রয় করিয়া সেই টাকা ও তাহার স্ত্রীর গায়ের গহনাপত্র পর্য্যন্ত সব কিছু বিকধরের কাছে রাখিয়া দেয়। অতি গোপনে গোপনে এই কাজ হয়। পাছে তাব জ্ঞাতিরা কেউ জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে সেই ভয়ে সব কিছুই গোপন থাকে। এখন আজ প্রায় পনেরো দিন বিকধরের অসুখ, ক্রমশ বাড়িতেছে। সে প্রত্যহ তাহার কাছে যাইত, বসিত। আজ সে যাইতে পারে নাই কারণ বিকধর কাল হইতে অচৈতন্য হইয়াছে। কাল পর্য্যন্তও সে তাহার কাছে গিয়াছিল, সে কালও আশা দিয়াছে আরোগ্য হইলেই তাহার সব কিছু বুঝাইয়া দিবে। তারপর আজ সকালে গিয়া শুনিল যে কাল হইতেই সে অচৈতন্য—ডাক্তার কাহাকেও ঢুকিতে মানা করিয়াছে, রোগীর ঘরে কেহ যাইবে না, তার ছেলেরা পাহারা দিতেছে। এখন যদি বিকধর মারা যায় তাহা হইলে তাহার বেটারাই সব লইবে। তাহার কোন কথা মানিবে না। তাহার জ্ঞাতিরাও বিকধরের পরিচিত, তাহারাও আসা-যাওয়া করিতেছে। সে বলিল, তাদেরও সন্দেহ আছে, আমি বিকধরের কাছেই সব কিছু রেখেছি।

শুনিয়া অবধূত প্রশ্ন করিলেন, নিজের কাছে না রেখে তার কাছে রাখতে গেল কেন? সে বললে, আমার কাছে থাকলে ডাকু লাগিয়ে লুট করে নেবে যে, তারা তো নিজেরাই ডাকু, অনেক পথিক মেরে অনেকেরই টাকা লুট করেচে। বিকধরের কাছে রেখেছি তাকে সবাই ভয় করে, তার নিজের অনেক বিষয়-সম্পত্তি আছে,—তার চেয়ে নিরাপদ স্থান আর কোথায় পাবো?

অবধূত বলিলেন, তা আমি কি করতে পারি বাবা, আমরা ভিক্ষা করে খাই, গাছ-তলায় পড়ে থাকি, আমার দ্বারা কি হতে পারে? তুমি মালিককে ডাকো, তিনি উপায় করে দেবেন। আমি তো কিছুই করতে পারবো না, দোহাই বাবা, এসব কাজে কোন

হাত নেই। তুমি মালিককেই বলো, তাঁর দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

বার বার মালিককে ডাকো, তাঁকেই জানাও, এসব মিষ্ট কথা বলিলেও, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, সে সামনেই একজনকে পাইয়াছে, তাহার উপর আজই দুপুরে ঐ চাতালে বসিয়া কিছু অনুভব করিয়াছে, এঁর মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিয়াছে—তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার কোন্ এক অনিশ্চিত কর্ত্তাব দ্বাবস্থ হইতে যাইবে? সুতরাং নিমজ্জমান ব্যক্তির মতই একটা উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া তাহাকে ছাড়িতে সে রাজী নয়। লোকটা বোকা বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে কি জানি কি ভাবের প্রভাবে সে অবধূতকেই তাহার বিপদ উদ্ধারের জন্য এমনই দৃঢ় ধরিয়া বসিয়াছে, ভগবান-প্রেরিত দূত ধারণা করিয়া তাঁহাকেই এমন ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে, কোথাও সে নড়িবে না। শেষে অবধূত পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ভিন্ন মূর্ত্তি ধবিলেন। এমন রুদ্র মূর্ত্তি পূর্ব্বে দেখি নাই। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুখ রুদ্রভাব ধারণ করিল, এমন ভয়ঙ্কর স্বর বাহির করিলেন শুনিলে আতঙ্কে অভিভূত করিয়া ফেলে একজনকে, কাঁপিতে হয় ভয়ে। এইভাবে তিনি, তুমকো বোলা মালিককো বোলো, হামার বাত মানেগা নেহি তো নিকালো ইঁহাসে, কভি না আও হামারা পাশ, এই কয়টি কথা এমন ভাবে বলিলেন যে, সেই বিপন্ন ব্যক্তি মুখ-খানা নীচে করিয়া দ্রুতপদেই চলিয়া গেল, আমাকেও একটু বিচলিত করিয়া গেল। মনে ভাবিলাম এতটা রূঢ় না হইলেও পারিতেন, কিছু করিতে না পারুন মিষ্টভাবে বিদায় দিলেই তো ভাল হইত, আর সেইটাই ঠিক ছিল, তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আজ কি ব্যতিক্রম দেখিলাম,—ঐ শান্ত ধীর-স্থির মানুষটির স্বভাবের। সবই দেখিলাম—কিছু বুঝিলামও বটে।

সিদ্ধযোগীদেরও সময় সময় স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে আরও একটা বিষয় আমায় আশ্চর্য্য করিল,—এতটা ক্রোধের কারণ কি হইল তাহা বুঝিলাম না। লোকটা বোকা সত্য, না হইলে অতটা বিশ্বাস করিয়া বন্ধুর কাছে যথাসর্ব্বস্ব রাখে! আরও বোকামির প্রমাণ, কোন বিদ্যা-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে না গিয়া সে এক পথের ফকিরের কাছে আসিল প্রতিবিধানের জন্য,—এই সব ভাবিয়া রাগ তাহার উপর হইতেই পারে, কিন্তু অবধূতের মত একজনের এমন কেন হইবে? এইখানেই আমার খটকা। এদিকে প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে।

সে চলিয়া গেলেই, অবধূতের আর সে মূর্ত্তি নাই, যেন সহজ মানুষ হইয়া গেলেন, এমন কি একটু মুচকি হাসিয়া আমায় বলিলেন, ঐ সব জড়বুদ্ধিকে মিষ্ট কথায় বুঝানো যাবেই না, যেই ওর ঔষধটি পড়লো ঠিক কাজ হল।

আমি বলিলাম, আপনার কাছে আসাটা ওর রোগ নয়, যেজন্য এসেছিল সে রোগের ওষুধ দিতে পারলেন কৈ?

শুনিবামাত্র তিনি হঠাৎ বড়ই বিষণ্ণ, তারপরই বড গম্ভীর হইয়া গেলেন, অত্যন্ত ধীরে এবং মৃদু কণ্ঠেই বলিলেন, সবার কাছে কি সব রোগের ওষুধ থাকে, তাই তো ওকে বোকা বলচি। তারপর সেই পোড়ো বাড়িখানার দিকে দেখিয়া বলিলেন, চলো তো দেখি আজ রাতটা কোথায় দেহটা রক্ষা করা যায়! চলিলেন ঐদিকেই। বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া যে ঘরখানার উপরে ছাদ আছে, এখনও পড়ে নাই, সেই ঘরে ঢুকিয়া নিজের বহির্বাস খুলিয়া মেজের কতকাংশ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিলেন, আমায় করিতে দিলেন না, তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া করিবার আগেই নিজে আরম্ভ করিলেই বা কি করা যায়' কাজেই আমি দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তারপর যখন কাজটি হইয়া গেল ঠিক দুইজনের মত মত জায়গা ঝাড়িয়া ঠিক করিলেন, ইচ্ছামত শেষ করিয়া তখন বলিলেন, বাবা এইবাব আমি একটু শুই, তুমি আমার কাছে থাক, দেখো যেন কোথাও যেও না। এখানে থাকাব মানেটা এখন মনে হইল,—সারারাত এইখানেই থাকিতে হইবে। এমন বন্ধ ঘরে তিনি কখনই থাকেন না, কিন্তু ব্যবস্থাটা আজ কেন এমনটা করিলেন বুঝিলাম না। মনটাও আমার প্রসন্ন ছিল না, অবধূতের স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়াই বুঝি আজ বিরূপ হইলাম। তখন ভাবিতে পাবিলাম না অন্তর্যামী আমার মনেব সকল কিছুই জলেব মতই দেখিতেছেন।

আমি তখনই শুইলাম না, কতক্ষণ জাগিয়াই রহিলাম। তিনি ঠিক সেইভাবে শবাসনে শুইলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিস্পন্দ জড়বৎ, যেন যথার্থই শব হইয়া গেলেন। আমি যদিও ঐ স্থান হইতে কোথাও গেলাম না, তবে ঐখানে বসিয়া বসিয়া আরও কিছু দেখিলাম নাটকীয় ব্যাপার। তার মধ্যে একটা একটু বলিব। ওখানে যখন দেড় দুই-ঘণ্টা কাটিয়াছে, ভাবিতেছিলাম কত কি—অবধূতের আজিকার ঐ সব কাণ্ড দেখিয়া, রাতটা ভালয় ভালয় কাটিলে বাঁচি বলিয়াছিলেন, তার উপব আজিকার ঐ অনুভূতির রেশ তখনও বেশ প্রবলই ছিল—তাই তন্ময় অবস্থায় এস্থানে কাটাইতে পারিয়াছিলাম। না হইলে কখনই পারিতাম না। তার পর ঐ বোকার কাণ্ড! রাত্র তখন প্রায় দশটা, দেখিলাম বাহিরের দিকে একটা লোক, তফাতে, বোধ হয় পিছনেও একজন ছিল, ধীরে ধীরে আসিতেছে। ঘরের দ্বারপথে তো কপাটের বালাই ছিল না, সে সেখানে দাঁড়াইয়া ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, তাহাতেই আমায় দেখিয়াই পিছনের লোকটিকে ইঙ্গিতে হাত দিয়া অগ্রসর হইতে মানা করিল, তার পর কৌন হৈ, প্রশ্ন। উত্তর দিলাম, সাধু, সন্ত।

সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, ইহাঁ কাহে?

সাধুভাবেই বলিলাম, পরমাত্মা কে ইচ্ছা। ব্যস্ এইখানেই সব শেষ। লোকটা, জোয়ান, সুপুরুষ, গোঁফ আছে, দাড়ি কামানো, টেরীকাটা, পায়ে নাগরা, পাতলা ছিটের

কামিজ গায়ে, হেনা আতরের গন্ধ। সে ফিরিয়া পশ্চাতে মানুষটির সঙ্গে সংযত মৃদুকণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে সেই পাথরপূর্ণ অঙ্গন পার হইয়া চলিয়া গেল। কল্পনা ধরিয়া বেশী অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হইল না, সহজেই বুঝা গেল গ্রামেরই যুবক বান্ধব, তাহারা গোপন পরামর্শের জন্যই আসিয়াছিল, এখন যেন আমাদের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে তারা বিফলমনোরথ হইয়াই চলিয়া গেল। পরে আমি শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। আজ সারাদিনে যাহা কিছু ঘটিয়া ছিল যেন এইবার ছবির মতই মানসপটে ক্রিয়া করিল, তারপর সুষুপ্তিতেই মগ্ন হইলাম। অবধূতের বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর সেইভাবেই পড়িয়া আছে, একবার দেখিয়াই শুইয়াছিলাম।

প্রভাতে নিদ্রা ভাঙিতেই দেখিলাম, অবধূত যেমনভাবে উঠিয়া বসেন ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছেন।

আমায় ডাকলেন না?

উত্তরে তখনই বেশ প্রসন্ন মনেই বলিলেন, এখনও একটু একটু অন্ধকার রয়েছে যে; সম্পূর্ণ আলো হয়নি তো। তারপর একটু থামিয়াই বলিতেছেন, ভেবেছি আজ সকালেই পাড়ি দেবো, নাহলে ভয় আছে।

ভয়! কিসের ভয়?

সেই বোকা লোকটি আবার যদি এসে পড়ে—সেই ভয়।

আমি বলিলাম, কাল যে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিয়েছেন—সে আর আসবে না।

শুনিয়া তিনি মুচকি হাসিলেন, বলিলেন, তুমি ওদের চেনো না দেখছি, ছেলেমানুষ তো হাজার হোক।

আমার অভিজ্ঞতা ও আত্ম-অভিমানেই আঘাত লাগিল, বলিলাম, ও যদি মানুষ হয় তো কখনই আসবে না,—অন্ততঃ আমি হলে কখনই আসতাম না।

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন,—তুমি যদি ঐ রকম অবস্থায় পড়তে তাহলে তুমিও নিশ্চয়ই আসতে, আমার এই কথাই মনে হচ্ছে।

আমি তর্ক না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—বলিলাম, এতটা যদি ওর অবস্থাটাই বুঝেছিলেন, তাহলে তাড়ালেন কেন এভাবে?

তুমি এই নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও? আমি কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি,—তুমি আমার প্রিয়তম, পথের সাথী। আমায় একেবারেই জল করিয়া দিলেন। এঁর অসাধ্য কিছুই নাই, একতাল কাদার মত একজনের মনকে লইয়া যা খুশী তাই গড়িতে পারেন। যাই হোক ঐখানেই আমরা আরও একটু কাটাইলাম, কারণ আকাশে মেঘ করিয়াছিল, আশু বৃষ্টির সম্ভাবনায় একটু অপেক্ষা করিয়া যাওয়াই ভাল মনে করিয়া প্রভাতকাল কতকটা কাটাইলাম। তারপর অবধূত বলিলেন, চলো আজ গঙ্গা পার

হয়ে কাশীর পথে যাওয়া যাক।

ভগ্নস্তূপের নীচে আসিয়া পথে নামিলাম। আগে আমি, পিছনে তিনি আসিতেছেন। দেখি বোকা উপাধি যার সেই কালকের বিপন্ন লোকটি হন্তদন্ত হইয়া আমাদের দিকেই আসিতেছে। ঐ দৃশ্য দেখিবামাত্রই অবধূত আমার কাঁধে হাতটি রাখিয়া বলিলেন, দেখলে, যা ভয় করেছিলাম! কিন্তু এবারে লোকটার সাহস দেখিয়া আর তাহাকে বোকা বলা গেল না। কোন কথা নাই বার্ত্তা নাই একেবারে আসিয়া অবধূতের পায়ে জড়াইয়া ধরিল ও হাউমাউ কবিয়া কত কি বলিতে বলিতে তাঁর পায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল। এক-এক বার বলে আর মাথা ঘষে, অবধূত অবাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। যে লোক কাহাকেও অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেন না, একটা লোক তাঁর পা ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড করাইয়া পায়ে মাথা ঘষিতেছে আর তিনি চুপ কবিযা দাঁড়াইয়া, দেখিতে বিস্ময় লাগে। অনেকক্ষণই গেল, তার কথার সার উদ্ধার করিতে পাবা গেল না। উনি হয়তো প্রথম হইতেই সব ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আমাব কাছে যেন বুঝিতে পারেন নাই এমন ভাবটা দেখাইলেন। যাই হোক কথা শেষ হইলে এই বুঝা গেল যে, কাল রাত্রেই বিকধরের জ্ঞান হইয়াছে, সে সেই রাত্রেই তাহাকে ডাকিতে পাঠায়। সে বলিল,—আমি গিয়া দেখি যেন সে সুস্থ অবস্থায় বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। আমায় দেখিয়াই সে পাশে বসাইয়া তাহার পুত্রকে দিয়া লোহার সিন্দুক খুলাইয়া আমায় পুরা টাকা, যা একটা থলিতে রাখা ছিল, আর আমার স্ত্রীর যত গহনা সব কিছু এক-একটা করিয়া দেখাইয়া আমায় দিয়া দিল। বলিল, এখন যদি আমি মরিয়া যাই তাহা হইলেও আর আক্ষেপের কারণ নাই। তারপর আমায় পথে যদি কেউ মাবিয়া কাড়িয়া লয়, আমার ভয় ছিল জ্ঞাতিদের, সেইজন্য সে তাহার জওয়ান পুত্রকে সঙ্গে দিল। কাল উহা লইয়া রাত্রে আমাদের ঘুম নাই, এখন ওসব কোথায় রাখিব এই ভয়ে মরিতেছি কিন্তু আমার স্ত্রী একটা উপায় করিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, আপনাদের দয়াতেই সব হইয়াছে—এখন জানাজানি হইলেও ক্ষতি নাই।

অবধূত বলিলেন, মালিক নে কুছ ঘটয়া অব্বা তু সমঝা নহি? সে যাহা বলিল, তাহার অনুবাদ করিলে ইহাই বুঝায় যে, আমি কালই যখন বিকধরের ঘর হইতে, হমারে সব কুছ মাল লেকর বাহার নিকালা তবই নে আপনাকো দেখা উসিকো পাশ। তব্ হামারা ঘরওয়ালীকা পাশ সব কুছ বোলা হ্যায়, ও আজ আপনেকো ভিক্ষাকে নিমন্ত্রণ কিয়া অর্থাৎ আজ আমার ঘরে আপনারা—ইত্যাদি।

আর একটি প্রশ্ন করিলেন, তুমহারা বো দোস্ত বিকধরকা অব কৈসা হালত হৈ?

সে বলিল, ইহাঁ আতে বখৎ শুনা ফির সুবসে উসকো চেত নহি না, ক্যা জানে কৈসি হালত অব। এখন অবধূত বলিলেন, যো কুছ দেখা বো তুমহারা মগজ কা খেয়াল, বো

বাত ছোড় দে, আজই হামলোক গঙ্গা পার হোক কর কাশী যানেবালা ; আজ ঔর কুছ না হোই।

এমনই দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে সে আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, যৈসি ভগবান কা ইচ্ছা। তবুও একবার আরও কাতর নয়নে সে জোড় হাত করিয়া অবশেষে বলিল, কুছ তো করনে দিজিয়ে, ভগবান!

তখন অবধূত বলিলেন, আচ্ছা, হামলোক পার যাতে, পারকি কিরায় দো, হামারে আপনা পাশ তো পয়সা নহি।

সে অতীব প্রসন্ন মনে বলিল,—সিরফ এৎনাই, সিরফ এৎনাই!

জি হাঁ, এত্‌নাই বহোত, বলিয়া অবধূত অগ্রসর হইলেন। সে আমাদের সঙ্গে পারঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের নৌকায় তুলিয়া দিল।

কাশীর পথে চলিতে অনেক আয়াসে প্রবল আমার কৌতুহল মিটাইতেই তিনি দয়া করিয়া অনেক কথাই বলিলেন। তাহার মধ্যে ঐ লোকটির কথাপ্রসঙ্গে যেটুকু হইল তাহা এই যে, বিকধর বাঁচিবে না। রাত্রে একবার ভাগ্যে উহার চেতনা হয়েছিল, নাহলে বেচারার সর্ব্বস্বই যেতো ঐ বিকধরের বংশধরের হাতে। ওরও প্রাপ্তিযোগ ছিল তাই। প্রকৃতির খেলা বড়ই অদ্ভুত, মানুষের সাধ্য নেই যে তার মধ্যে প্রবেশ করবে।

আরও একটু কৌতুহলবশে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, বিকধরকে প্রাণে বাঁচানো যেতো না কি?

শুনিয়াই তিনি বলিলেন, সর্ব্বনাশ! প্রকৃতির নিয়মের ওপরে যাওয়া? তার যে ঠিক সময় হয়েছে বিধাতার বিধানেই।

আমি একটু দুষ্ট তর্কে প্রবৃত্ত হইলাম, বলিলাম, ঐ যে চেতনা হওয়া, অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে তার চেতনা সঞ্চার, তার পর ওর যা কিছু কর্ম্ম, তার উপর বুদ্ধির প্রেরণা দেওয়া—তা হলে এটাও কি বিধাতার বিধানের উপর কাজ হলো না?

দুটি ছেলে দৌড়াদৌড়ি খেলতে একজন যেমন তার আগে পৌঁছে গিয়ে বলে, দুয়ো আমায় ধরতে পারলে না—ঠিক যেন সেইভাবে ছেলেমানুষের মতই তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তুমি এখনও ধরতে পারোনি। তা যদি হোতো তা হলে কি ওর মৃত্যু, মূর্চ্ছা থেকে ফিরে আসা ঘটতো? এইখানেই তোমাতে আমাতে বুদ্ধির তফাৎ—তুমি বাবা এখনও বিধাতার খেলাটা বোঝনি—

এই সব সাধারণ মানুষসমাজেই তাঁর কাজ বা খেলা মানুষের ভিতর দিয়েই তো হচ্ছে! মানুষই তো যন্ত্র তাঁর হাতে!

শুনিবামাত্র অবধূত বাধা দিয়া বলিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন কোন গুরুতর বিষয়ে তাঁকে যেন নিজের হাতেই কাজ করতে হয়, কারণ সে ধরনের কাজ সাধারণ মানুষ-যন্ত্রের

সাহায্যে হবার নয়।

শুনিয়াই বলিলাম,—যেমন ঐ বিকধবকে তার মৃত্যুব পথ থেকে ফিরিয়ে এনে, অধিকারীর হাতে সব কিছু ন্যায়সঙ্গত ভাবে যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবার বিষয়টা তো,—ঐখানেই তিনি নিজেব হাতে কাজ করলেন।

শুনিয়া তিনি বলিলেন, তাই তো, ঠিক ধরেচো। তারপর যখন আমি বলিলাম, ওখানে সাধারণ যন্ত্রে কাজ হয় না, বিশেষ যন্ত্র চাই, সে যন্ত্রও তো মানুষ! শুনিয়া তিনি বলিলেন, সে কথা তিনিই জানেন, যাকে দিয়ে যে কাজ হবে। বল এখন, নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়। গুরু গুরু—

বলিলাম, আপনার গুরুব আশ্চর্য্য জীবনকথা আমায় বলবেন বলেছিলেন—তিনি যেমন আপনাকে বলেছিলেন।

তিনি বলিলেন, হাঁ, তা মনে আছে। তিনি আমাকেই বলেছিলেন, আব কাকেও বলেননি, তাঁর একটা ভয় ছিল কিনা।

কিসের ভয়?

তিনি প্রথমে খানিক বিপথে, ডাকিনীসিদ্ধি প্রভৃতি যোগ-ঐশ্বর্য্যের পথে গিয়েছিলেন, কুমার ব্রহ্মচারী অবস্থায়। কোন এক ভৈরবীর পাল্লায় পড়ে ডাকিনীসিদ্ধও হয়েছিলেন। তার পর বুঝতে পারেন এটা বিপথ। তখন সে সিদ্ধিব সকল ফল অন্য একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে তবে রেহাই পান। তিনি প্রত্যেক ব্যাপারটি খুলে আমায় বলেছিলেন। বলবো তোমায়, যদি শুনতে চাও।

শুনতে আবার চাই না, বলে সেদো ভাত খাবি,—না হাত ধুয়ে বসে আছি!

শুনিয়া বলিলেন, আচ্ছা। কাশী পৌঁছে বেশ ধীরেসুস্থে বলা যাবে, কেমন? অগত্যা —আমরা সেদিন কাটাইলাম। তখন হইতে কত শীঘ্র কাশী পৌঁছাইব আমার ইহাই হইল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার ভগবানেব উদ্দেশ্য অন্যরূপ। গঙ্গাপারে আসিয়া তার পরদিন প্রথমেই যে গ্রাম পাওয়া গেল, গ্রাম-প্রান্তে এক মন্দিরের চাতালে আমাদের আশ্রয়। আজ আবার উপরি উপরি কয়দিন জলে ভিজিয়া আমার হইল জ্বর। সকালে গা-টা ভালই ছিল না, মাথা ভার, ক্ষুধা নাই, অবধূত আমায় দেখিয়াই বলিলেন, —আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই, তুমি থাক। অনেকটাই অত্যাচার হয়েচে শরীরের উপর। বুঝি বাবা বুঝি। আমারই আগে ভাবা উচিত ছিল,—দেখো, আমার তালে ভুল।

আমি বলিলাম, ও কিছু নয়, এমনি আমার মাঝে মাঝে হয়।

তাই নাকি? কতদিন অন্তর হয় বল্ তো? একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ঠকিয়া গিয়াছি।

চুপ থাকিতে দেখিয়া বলিতেছেন, না না, তা হবে না, বল কত দিন অন্তর হয় ?

বলিলাম গত বছর বর্ষার সময় হয়েছিল, তখন আমি বীরভূমে।

শুনিয়া বলিলেন, তার আগে ?

অতটা মনে নেই, একবার হয়েছিল তখন আমি পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকায়।

তাই তো, বছরে একবার বললে না ?

বলিলাম, ঐরকমই হবে।

এখন তাহলে তো একটু আশ্রয় চাই !

আমি বলিলাম, না না, কিছু দরকার নেই।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি বুঝবো,—এখন তুমি একটু বসো, বলিয়া চলিয়া গেলেন। অতি অল্পক্ষণেই আসিয়া বলিলেন, চলো। আমরা পথের বাঁক ঘুরিয়া উঠিলাম এক শিবালয়ের নাটামন্দিরের মতই একটি স্থানে। যে লোক কখনও ভিক্ষা পর্য্যন্ত করেন না —তিনি কি কাণ্ড আরম্ভ করিলেন তাহা দেখিয়াই আমার গায়ের জ্বরটা মাথায় উঠিয়া গেল। অতি অল্পক্ষণেই জ্বরে আমায় প্রায় জ্ঞানশূন্য করিবার উপক্রম করিল।

অবধূত আজ আর কোথাও নড়িলেন না বলিয়া যে আমার কাছেই গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন তাহাও নয়, দেখিলাম তিনি সামনের মাঠের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন, একবার করিয়া বসেন আবার উঠিয়া বেড়াইতে থাকেন,—যেন বেশ স্বচ্ছন্দেই আছেন। আমি ক্রমে ক্রমে জ্বরের প্রকোপেই অচৈতন্যের মতই হইয়া পড়িলাম। এত অল্পক্ষণে যে এতটা প্রবল জর হইতে পারে ধারণা ছিল না। জীবনে এই প্রথম।

প্রভাতে উঠিয়াছিলাম সূর্য্যোদয়ের ঠিক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, এখন বোধ হয় দিনমণি মাথার উপরে। ইতিমধ্যে এইস্থান সংগ্রহ, কোথা হইতে একখানি ছোট একজন শুইতে পারে এমন সতরঞ্চ, যার নাম দরি যোগাড করিয়া পাতিয়া রাখিয়াছেন, তারপর আমার কম্বলখানি পাট করিয়া বালিশের মত করিয়া দিয়াছেন, আমার বাইরের কাপড়-খানি গায়ে দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছেন, ঠিক যেন আমার প্রিয়তম আত্মীয় কেহ এই অবস্থায় আমায় সেবা করিতেছেন। একটি কথা নাই, চক্ষে তাঁহার এমনি একটি ভাব, পূর্ব্বে কখনও এমন দেখি নাই, তাকে উদ্বেগ বলিব কিম্বা অনুকম্পা বলিব, কিম্বা আর কিছু বলিব তাহা ঠিক করিতে পারি না।

সেই যে প্রবল তাপ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেমন অসম্ভব রকমের নিস্তব্ধতা অনুভব করিতে করিতে যেন ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন জাগিলাম, আবার প্রভাত। গাছে গাছে পাখীর ডাক শুনিতে শুনিতেই জাগিয়া উঠিলাম যেন সুপ্রভাত। অবধূত আমার পাশেই বসিয়া আছেন. যেমন ভাবে বসেন, দুই হাঁটু জড়াইয়া, দৃষ্টি তাঁর কিন্তু আমার দিকে নয়।

আমি জাগিয়াছি বুঝিয়া ফিরিলেন, বলিলেন,—খুব ভোগ হয়েচে সারারাত, দেখি এখন কেমন, বলিয়া কপালে হাত দিলেন। সেই হাতটির স্পর্শমাত্রেই যেন অমৃতের পরশ পাইলাম। বলিলাম, আঃ! তিনি বলিলেন, এখনও আঃ বলবার সময় আসেনি। মাথার যন্ত্রণা এখনও আছে তো?

ছিল, তাই বলিলাম, ততটা নেই।

ঐ তো তোমার দোষ, আমি বলচি আছে, কাল যতটা ছিল আজও ততটা আছে, ইতরবিশেষ হবে কি করে! তুমি কম আছে বললেই আমি তাই মনে করবো! চক্ষের চেহারা তো দেখছি, মাথার রক্তগুলো এখনও একটু নামেনি তো গুরুভার কমবে কি করে?

দেখিলাম যোগীর কাছে ফাঁকি চলিবে না। এইভাবে পড়িয়াই রহিলাম। দুপুর-বেলা একবাটি সাগু, দুধের সঙ্গে চিনি দিয়া সহজ সাবুর মত। বুঝিলাম, এর মূলেও অবধূত আছেন। আবার আমায় বলিতেছেন, আমার জ্বরজারি হলে একেবারেই কিন্তু নিরম্বু উপবাস যার নাম। তোমার বেলা অত কঠোর নিয়ম ভাল নয়, তাই এই সাগুর ব্যবস্থা,—খেয়ে নাও। একটু বোসো, খেয়েই একেবারে শুয়ে পোড়ো না।

দিন কাটিল, রাত্রও কাটিল। প্রভাতে জ্বর কম ছিল। তাঁর ভয় পাছে হেথা তিন-রাত্রই বা কাটাইতে হয়! দেখিলাম সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন। আরও দেখিলাম রামজী নামে এখানে যে মন্দির, তাহার সংলগ্ন একটি আচ্ছাদিত স্থানে বেশ চমৎকার ব্যবস্থা। বোধ হয় কালই করিয়াছিলেন। এক প্রহর বেলা হইয়া গেলে অবধূত বলিলেন, একটু দাঁড়াও তো!

দাঁড়াইতে হাত ধরিলেন, দেখিলাম সে হাত তপ্ত। নিজে আমার কম্বল ও কমণ্ডলু লইলেন বাঁ হাতে। পায় পায় চলিতে চলিতে খানিক উঠা-নামা করিয়া মন্দিরের চালায় পৌঁছাইয়া দেখি বেশ আরামপ্রদ কোমল বিছানা—মাথায় বালিশ, দেখিয়া বলিলাম, এত আরামে থাকলে অসুখ যেতে চাইবে না।

লাঠির চোটে তাড়াতেই হবে। এখন শুয়ে পড়ো। জ্বর আমার এখন সেরূপ প্রবল ছিল না।

জ্বর আমার সে-রাত্রের মধ্যে ছাড়িয়া গেল। আমার ছাড়িল, তাঁহার জ্বর আসিল। তিনি কম্বলের উপর শুইয়া পড়িলেন—যেন কতই শান্তি। অবধূত পড়িলেন,—যেন একটা রহস্যজনক কিছু ঘটিয়া গেল। কারণ আমি দেখিলাম আমার উঠার সঙ্গে সঙ্গেই অবধূত পড়িলেন। কপালে হাত দিয়া দেখি ভয়ানক তাপ, পরশু দিন ও রাত্রে যে তাপ আমার গায়ে ছিল, এখন তাঁহার গায়ে সেই তাপ তো বটেই, আমার বরং অনেকটাই বেশী লাগিল। কিন্তু যোগীর আবার জ্বর কেন? তাঁদের মধ্যে আবার ইচ্ছাকৃত জ্বর হয়? মনে ঠিক এই ভাবটি ভাষা পাইয়াছে কি পায় নাই, তখনই অবধূত বলিতেছেন, নাঃ,

যোগীরা তো মানুষ নয়, তার তো জগদম্বার সৃষ্টি নয়, তাঁর রাজ্যের জীবও নয়—তারা বাইরের লোক।

বলিলাম, আপনার এ দুর্ভোগ কেন, সিদ্ধযোগীর পবিত্র শরীর, তার উপর সাধ করে আর একজনের—

তিনি বলিলেন, দেখো, তুমি তিনটি দিন দুটি রাত্রি যে ভোগটা করলে সেটা তো দেখলাম, এখন আরও দু'চারদিন চলতো ; তা আমি দুই-একদিন সেটা ভোগ করে তাকে শেষ করে দিতে পারি না তোমার জন্য ! তুমি পড়ে থাকলে আমার চলবে কেন ? আমার বন্ধু, আমার সাথী, আমার বডিগার্ড যে,—

জ্বরের তাড়সে মুখ শুকাইতেছে। জিব দিয়া ঠোঁট ভিজাইয়া লইয়া আবার বলিতেছেন, তুমি এখনও কত দুর্ব্বল। তা শক্ত মানুষ তুমি বলতেই হবে। দুর্ব্বলতা এফটু থাকলেও ভগবানের কাজ বলে কিছু করা যায় না, কি বলো ?

আমি আর কি বলিব, সব কথাই তো তিনি বলিয়াই দিলেন, তবুও এইটুকু বলিলাম, তা তো নিশ্চয়, বলুন না কি করতে হবে, এখনি করবো।

তিনি সহজ মানুষের মতই বলিলেন, বলচি, বলচি, অত ব্যস্ত কেন ? আগে কিছু খেয়ে নাও। তারপর সব বলে দিচ্চি, বাবাঃ!

খেয়ে নাও ? কি খাই,—যোগাড়ই বা কোথায় ? আমি তো এই উঠিলাম, সঙ্গে সঙ্গে যেন হিসাব করাই ছিল, ইনি পড়িলেন। তার পর এখন খাবার ব্যবস্থা—সেটা করিবে কে, আমাকেই তো করিতে হইবে ! মনে মনে এই সব তোলাপাড়া করিতে করিতে অল্পক্ষণেই খাবার আসিল। তাঁহার জন্য এক বাটি গরম জল, আর আমার জন্য এক গ্লাস দুধ গরম গরম, আর প্রসাদ কয়েকটা ক্ষীরের প্যাঁড়া।

দেখি আশ্চর্য্য ব্যাপার, যখন আমি শুইয়াছিলাম তিনি এমনই ব্যবস্থা আমার করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার একটুও কষ্ট না হয়। রোগের সেবায় যেন তিনি চিরঅভ্যস্ত। অথচ নিজের অসুখের বিষয়ে উদাসীনের মত এক বাটি গরম জল মাত্র। আমার জন্য গরম দুধ। এতটা দেখিয়াও মনের গলদ যেন কাটিতে চাহে না। সময় ও অবস্থাবিশেষে কি কঠিন সমালোচনাই করিয়াছি তাঁর কয়েকটা কাজের ! যেখানে সেখানে না বুঝিয়া কত কি বলিয়াছি, আনন্দেই সে-সকল বুঝাইয়া দিয়াছেন, কুটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমায় একেবারে জল করিয়া দিয়াছেন। কখনও বিরূপ হইতে দেখি নাই। ছেলেমানুষ বলিয়া সকল ব্যবহারই ক্ষমা,—চাহিতে তর সহে নাই, আগেই ক্ষমা করিয়া বসিয়া আছেন। এত নির্ম্মল মন মানুষের হইতে পারে আগে দেখি নাই। বোধ হয় ইহাই যথার্থ সিদ্ধির ফল। সিদ্ধির মূর্ত্তিমান প্রতীক। আর একটি পূর্ব্ব সত্য আজ এই মানুষটির সঙ্গে থাকিয়া উপলব্ধি করিলাম। এই মানুষটির কাছে কেহ কিছু প্রার্থী হইয়া আসিলে কখনই বিমুখ

হইতে দেখিলাম না। তখনই না হোক, যথাকালে ঠিক তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিতে এইখানেই তাঁর ঐশ্বরিকতা।

এ পর্য্যন্ত যে সব সাধুসঙ্গ করিয়াছি আমার মহাভাগ্যে বোধ হয়, খুব অল্পই আছে যাঁহার স্নেহ পাই নাই, সেই জন্য আমার অন্তরে একটা প্রসাদ আছে,—মনে হয় সেদিকে আমি ভাগ্যবান, কিন্তু আমাকে বেশ কতকটা শ্রদ্ধাপূর্ণ দূরত্ব রাখিয়া ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, যেহেতু প্রার্থী আমি, উপযাচক হইয়াই সেথা নিজেকে ধন্য মানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিয়াছি, একেবারেই কিন্তু বিপরীত দেখিলাম এই অবধূতকে। তাঁহার প্রত্যেক ব্যবহারে, এই এক মাসের মধ্যে, আমাদের কথা হইয়াছে অনেক। যখনই ইনি কথা কহিয়াছেন আমার সঙ্গে,—আমাকে তাঁর নিজ স্তরে তুলিয়া লইযাই, তাঁর সকল কথা, সকল ব্যবহার আমার সঙ্গে। ইহা হইতেই বুঝিতেছি আমাদেব অধিকার যাহাই বা যতটুকুই থাকুক, ইনি নিজ আত্মশক্তির প্রভাবে, নিজ অনুভূতিতে আমারও অন্তরক্ষেত্র পূর্ণ কবিয়া, আমার মনেব অন্ধকার তাঁব দীপ্তিতে আলোকিত করিয়া আমায় একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। আশ্চর্য! এমন আত্মসাতে দক্ষ মহান যোগী,—জীবনে এই প্রথম আর এই শেষ দেখিলাম। ইহাতেই আমার দীর্ঘকালব্যাপী স্মরণীয় শেষ সাধুসঙ্গ।

আমাদের উভয়ের জ্বরভোগের পর পঞ্চম দিনেও অনেক দূরে না গিয়া নিকটেই একস্থানে আমরা দিবারাত্রি কাটাইলাম। তাব পবদিন আমরা কাশীর পথেই চলিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমায় এমনই অবস্থায় ফেলিয়া কাঁদাইয়াছিলেন;—সেই কথাই এখন আসিয়া পড়িল। উদ্দেশ্য এখন হইতেই বিচ্ছেদের জন্য যাহাতে প্রস্তুত থাকিতে পারি। কখনও নিকট, কখনও দূর এইভাবে গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া যখন একটা গ্রামের কাছে আসিয়াছি, অবধূত বলিলেন, দেখ এখন তুমি চলতে থাক সোজা—আমি তোমায় ধরে নেবো ঠিক।

আমি তাহাই করিলাম। অত ভাবিয়া দেখি নাই। আচ্ছা বলিয়া চলিতে লাগিলাম। খানিক গিয়া এক গ্রামের ধারে গিয়া ভাবিলাম, এইবার অপেক্ষা করাই ভালো—বলিয়া পথের ধারে বসিয়াছি একটা আমগাছের তলায়।

অবধূত আর আসেন না। কোথায় গেলেন, কতটা পিছাইয়া পড়িলেন তাহাও জানিলাম না। এতক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া আমি হয়তো অত্যন্ত দ্রুত পা চালাইয়া চলিয়া অনেক দূরেই আসিয়া পড়িয়াছি—তিনি ধীরে চলেন,—এমন কত কি ভাবিতেছি এইভাবে যখন বৈকালবেলা সূর্য্যদেব পশ্চিমে অনেকটাই ঢলিয়াছেন, আমি তখন ভাবিলাম একবার ফিরিয়া কতক দূর যাইয়া দেখিব নাকি! যেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম, গ্রামের ভিতর হইতে একটি বালিকা আসিতেছে আর আমার দিকেই আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। পরমা

সুন্দরী মূর্ত্তি। তাহার মাথার বাঁ দিকে চূড়াবাঁধা। সোজা আমার কাছে আসিয়াই দাঁড়াইল এবং বলিল, তুমহারা সাথী বো গাঁওকা পিছে মন্দির মে বৈঠা, তোমকো সোচনেকো বোল দিয়া, বলিয়া হাত বাড়াইয়া গ্রামের দিকে দেখাইয়া দিল। আমি আশ্চর্য্যবৎ তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল, দেখতা ক্যা, মেরে সাথ আও। বলিয়া আমার হাতটি ধরিয়া লইয়া চলিল।

চলিতে চলিতে আমি হাত ছাড়াইয়া লইলাম, বলিলাম, অবধূত স্বামী কি ধার সে গাঁওমে পৌছা, হামতো ইহা বৈঠাথা বহোত দের তক ?

সে বলিল, ক্যা মালুম, দুসরে রাস্তেসে আয়া হোগা, বলিতে বলিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক গলিপথের সামনে দাড়াইল আর আমায়, সিধা চলা যাও, ইঙ্গিতে হাত দেখাইয়া সেই পথেই প্রবেশ করিল।

আমি সোজা প্রায় এক দেড বশি পথ চলিয়া মন্দির পাইলাম। মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক নিমতলায় অবধূত বসিয়া। আমায় দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, একটি মেয়ে ডেকে দিল তো ? ঘাড নাডিতেই তিনি বলিলেন, আজ তো আমি ভেবেছিলাম তুমি পথ হারিয়েচ।

আপনি এলেন কোথা দিয়ে ?

কেন, তুমি যেখান দিয়ে এসেছ ! আমি বলিলাম, আমি তো পথে ছিলাম, আমায় পেরিয়ে এলেন কখন—আমি তো দেখিনি, তারপর মেয়েটি যে বললে অন্য পথে এসেছেন !

অবধূত বলিলেন, তোমার এখন মনের অতি উচ্চ অবস্থা, পথের দিকে খেয়াল ছিল না। আমি তো তোমাকে দেখলাম, যখন তোমার সামনে দিয়েই এলাম,—তোমাতে তুমি ছিলে না। তাই তো আমি তোমায় আর জানিয়ে এলাম না। তারপর দেখলাম অনেকক্ষণ হয়েছে, আবার হয়তো ফিরে না যাও সেই ভয়ে ঐ মেয়েটিকে পাঠাই।

এই পর্য্যন্ত আজিকার কথা,—জানি না আমার পথে চলার কালে ধ্যানাবস্থায় এমনটা বিভ্রম সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল কিনা। যাহা হউক, সে-রাত্রে অবশ্য আনন্দেই কাটিল। শয়নের পূর্ব্বে আমায় বলিলেন, কাল যখন উঠবে আমায় যদি দেখতে না পাও,—সোজা চলে যেও কাশীর পথে। আমার একটু আগে যাবার দরকার আছে। আমার মধ্যে একটা কেমন ভয়ের ভাব আসিল কথাটা শুনিয়া। যাহা হউক, আর কোন কথা না কহিয়া শুইয়া পড়িলাম, যেমন ভাবে কম্বল জড়াইয়া শুই মন্দিরপ্রাঙ্গণে। আজ ঠাণ্ডা ছিল। মনে আমার এখন কেমন একটা সন্দেহ আসিয়াছে, বোধ হয় এইভাবেই একদিন আমায় পরিত্যাগ করিবেন। যতটা ঘনিষ্ঠতা হইবার তাহা তো এক-দেড় মাসে হইয়াছে—আমাকে ইনি কোন্ দিকে কতটা কতটা অনুগ্রহ করিয়াছেন সেটা মনে-মনেই জানি, কিন্তু সান্নিধ্যে কেমন এক চিরন্তন আপন ভাবের অধিকার-বোধ আসে, মনে হয় অবধূতের সঙ্গে আমার এ জীবনে বিচ্ছেদ ঘটিবে না। কিন্তু যেই পথ চলিতে আরম্ভ করি, নিত্য নূতন

ভাবের একটা না একটা কীর্ত্তি-কর্ম্ম দেখি, তখনই ঐ সন্দেহ আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের সন্দেহ আসিয়া অন্তরক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া দেয়।

এখন প্রাতে পরদিন কাশীর দিকে যাত্রা করিলাম। সেই যে প্রয়াগ হইতে একত্র যাত্রা করিয়াছি, প্রতিদিন এক হইতে ছয় মাইল পর্য্যন্ত চলা হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দুই রাত্র বাসও ঘটিয়াছে। এইভাবেই আসা হইয়াছে। কেবল বিন্ধ্যাচলে ও চুনারে দুই দিন-রাত্র করিয়া চারটি রাত্র বিশেষ তীর্থস্থানে যাপন করিয়াছি।

শক্তি বা বিভূতি অনেকেরই অনেক থাকে, কিন্তু এমন উদ্দেশ্যপূর্ণ সহজ ব্যবহার কোথাও দেখি নাই। বিভূতিও কিছু নয়,—তোমার মধ্যেও আসতে পারে, গন্তব্যের পথে ওর ব্যবহারে কর্ম্ম নষ্ট হয় যেমন ভাংয়ে নেশা, ধ্যান জমে ভাল, অনেক গভীর তত্ত্বসকল করমলকবৎ প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু নেশা ছুটিলে প্রতিক্রিয়ায় পড়তে হয়, দ্রব্যগুণ যে! এইভাবে কত সময়েই কত কথাই বলিয়াছেন।

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি—কতটা আসিলাম মনে নাই—কখনও গঙ্গার নিকটে, কখনও দূরে চলিয়াছি,—এইভাবে আসিতে আসিতে একটা ছোট গ্রাম পার হইয়াই এক জঙ্গলময় স্থান—ভিতরদিকে হয়তো অনেকটাই হইবে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে। এখানে পথের ধারে আমাদের নটরাজ বসিয়া আছেন এক বৃক্ষতলে। বৃক্ষতলটি ঠিক' চাই। কখনও অন্যত্র বসিতে দেখিলাম না, আগেই বলিয়াছি,—বৃক্ষের সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা, বোধ হয় মানুষের চেয়েও অনেক বেশী। আমিও বসিলাম। বোম ভোলানাথের মত বসিয়া, স্বচ্ছন্দে আপনমনে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন জানি না, প্রথম কথা হইল, জায়গাটা বেশ, নয়? বুঝিলাম ভাল লাগিয়াছে,—আজ এইখানেই আড্ডা।

যখনই দেখিয়াছি কোন স্থানে অবস্থান নিশ্চিত হইয়া গেল, বিশেষতঃ কতকটা দিন ও সম্পূর্ণ রাত্রের মত, অমনি স্থানটি যেন আমার আপন হইয়া গিয়াছে, যেন এইখানে সব কিছু আমার অস্তিত্বের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া গেল। এমনই মমতাপ্রবণ জীব আমরা। সকালে যখন স্থানটি ত্যাগ করিয়া চলিব, তখন একটু দুঃখ অন্তরের কোণে উঠিবে এই বলিয়া যেন কোন প্রিয় বস্তু ছাড়িয়া যাইতেছি।

সে যাহাই হোক, গ্রাম হইতে এইখানে এতটা তফাতেও আমাদের অন্ন জুটিত আশ্চর্য্য ভাবেই। এখানে যাহা হইল তাহাতেই অনেকটা ধারণা হইবে। স্নান করিয়া বৃক্ষতলেই বসিয়াছি। অবধূতের স্নান ইচ্ছামত, এমন কি আট-দশদিন হয়তো স্নান করিলেন না, তারপর একদিন জলে পড়িয়া হয়তো একবেলাই কাটাইলেন। এরকম দীর্ঘকাল একদিন হইয়াছিল এবং উহা কাশীতে পৌছিবার পরই। এখন আমি স্নান করিয়া আসিয়া বসিলাম, অবধূত গম্ভীর, তাঁর দৃষ্টি সামনের দিকে, দূরে গ্রামপানেই। আমি তাঁহার দিকেই দেখিতেছিলাম, সুতরাং গ্রাম আমার পিছনে ছিল। আশ্চর্য্য,

খানিক পর দেখিলাম তিনি যেন আমার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া কিছু বিশেষ ব্যাপার দেখিতেছেন। আমি তখন পিছনে তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখি, একটি বালক, কৌপীন পরা, কাঁধে একটি চুবড়ি হাতে ধরা, অপর হাতে একটি ছড়ি, দাঁড়াইয়া। গ্রাম হইতেই আসিয়াছে বুঝা গেল। উহার মধ্যে ফলমূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি সবই ছিল, যেমন ঠাকুরের প্রসাদ হয়। আমাদের ভোজনশেষে খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া জঙ্গলের দিকে মুখ করিয়া সেই নির্জ্জন পথের ধারেই বসিলাম এবং আমরা প্রায় বেলা কাটাইলাম কথায় কথায় অনেক কিছুই বলিলেন।

আমাদের আজিকার কথা, যোগসিদ্ধির পর দেহ আসনে রাখিয়া আত্মা অনেক দূর যাইতে, অনেক কিছু করিতে পারেন এই সব কথা, —উঃ! এমনই সহজ ভাবেই তিনি বলিলেন যাহাতে তিনি শবাসনে থাকিয়া কি করেন তাহারই যেন ব্যাখ্যান এইখানে হইয়া গেল।

আজ দিনশেষে—বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, চমৎকার ব্যাপার। অনেকক্ষণ বসিবার পরে কথা এবং আমাদের নূতন অভিজ্ঞতা!

আমাদের সামনেই হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজেই আমাদের চমকিত করিল, —দেখি ঐ জঙ্গলটার ভিতরে যেখানে গাছপালা ফাঁকা, তাহার ভিতরে একস্থানেই খানিক হালকা ধোঁয়া উড়িয়া গেল। খানিক পরে অবধূত বলিলেন, শিকারের ব্যবস্থা বোধ হয়। তাঁর কথায় আমি ঐদিকেই চাহিয়াছিলাম। খানিক পরে একজন বন্দুকধারী বাহির হইয়া আসিতেছে দেখা গেল,—হাফপ্যাণ্ট, খাকি সার্ট, পায়ে পটি বাঁধা হাঁটু পর্য্যন্ত, কাঁধে বন্দুক, মাথায় সোলা হ্যাট, তাহার পিছনেই আর একজন আছে। বাঙালী, কিম্বা নব্যতন্ত্রের হিন্দুস্থানী বনারসবালা জমিদারপুত্র হইবে, সাহেব নয় বা একেবারে বিদেশী নয়। তার পিছনে আর একজন বাহিরে আসিয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, 'তোম লোক কিধার যায়েগা ?' জিজ্ঞাসা করিল।

দুজনেই ইয়ং ম্যান। অবধূত কিছু বলিলেন না, একটু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। আমিই বলিলাম, হাম লোক কাশীজী যানে বালা।

শুনিয়া বলিল, হামারা ঔর এই সাহেবকা দুই বন্দুক লে চলো তো বকশিশ মিলেগা। লে যায়গা ? ততক্ষণে পিছনে চাপরাসী একজন, হাতে কতকগুলি পক্ষী ঝুলিতেছে,— আসিতেছে দেখা গেল।

তৎক্ষণাৎ আমি বলিতে যাইতেছিলাম, থামাইয়া অবধূত বলিলেন, হাম লোক সাধু হৈ বাবা, আজ ইহাই ঠাহরে গা, ঔর কিধার যানে কা মন নহি চাতে।

তার সঙ্গে পিছনে যে আসিয়াছিল সে বলিল, এই, তোম লোক জানতে নহি কিসি কো সাথ বাৎ করতে,—আপনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হৈ—চলো, সাহেব কা কাম করদো তো

ইনাম মিলেগা।

আপ লোক হিন্দু ?

বোলতা না হাম লোক সাধু, মজুরী নহি করতে, হমে আপকা মালুম হোনা থা

তখন পিছনের লোকটা অগ্রবর্ত্তী সাহেবকে বলিল, এদের পাওয়া যাবে না, পথে যদি কাকেও ধরতে পারা যায় চলো আমরা এগিয়ে যাই, দেখি।

ততক্ষণে চাপরাসী আসিয়া আট-দশটা পাখী যাহা হাতে ছিল উহা মাটিতে রাখিয়া বলিল, উও গাঁও মে হুজুর,—সাদ মজুর মিলসকতা, পৌঁছু ? তাহাতে সাহেব সায় দিলে, সে গামের দিকে চলিয়া গেল, সাহেবরা খানিক দূরে সরিয়া বন্দুক দুটি সযত্নে জমিতে শোয়াইয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

অবধূত বলিলেন, আপনারা শিকারে এসেছেন, বোঝা নেবার লোক নিয়ে আসেন নি ?

বাঙ্গালী দেখিয়া সাহেবের মনটা নরম শুধু নয় খানিক যেন অপ্রতিভের মত হয়। মনে হয়,—তখন বলিলেন, কি জানেন, তখন এক উৎসাহ, শিকার করবার একটা স্ফূর্তিতে একরকম ছিল, এখন ফেরবার বেলা সারাদিন পর এখন ভারী লাগচে, আর বইতে ইচ্ছাও করচে না, আবার একটা অবসাদও এসেছে শরীরে।

সরল কথা দেখিয়া অবধূত বলিলেন, বোসো না, ক্লান্তি একটা তো হতেই পারে, এতগুলি শিকার করতে হয়েছে তো, প্রায় সারাদিন ঘুরে ঘুরে,—পরিশ্রম হয় না ?

তাহারা বসিল, অবধূতের স্নেহপূর্ণ কথার উভয়েই কেমন একটু আকর্ষণ বোধ করিল। এই ব্যাপারে তাহারা কি মনে করিয়াছিল জানি না। সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন অবধূতের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল এবং প্রশ্ন করিল, আপনারা এখানে যে থাকবেন খাওয়াদাওয়া কেমন হবে, এখান থেকে গ্রাম তো দূরে,—আর এমন জায়গায় থাকবার সুবিধা হবে কি ?

আমরা প্রায়ই এইভাবেই রাত কাটাই।—এখন গরমের দিন। তা তোমাদের এখন তো অনেকটাই হাঁটতে হবে, নয় ?

উত্তরে বলিল, হাঁ প্রায় দশ মাইল—সন্ধ্যার আগে না হোক একটু পরেই পৌছে যাবো।

এমন সময়ে মজুর লইয়া আসিল। বোঝা সব ঠিকমত ব্যবস্থা করিয়া সাহেবেরা নাকে হাত ঠেকাইয়া নমস্কারে আপ্যায়িত করিয়া চলিয়া গেলে, অবধূত বলিলেন, এ এক অভিনয় হয়ে গেল বেশ।

আমরা তো দুই-একদিনেই কাশী পৌছে যাবো, আপনি কি কাশী ছেড়ে যাবেন, কাশীতে রাত্রিবাস করবেন না ?

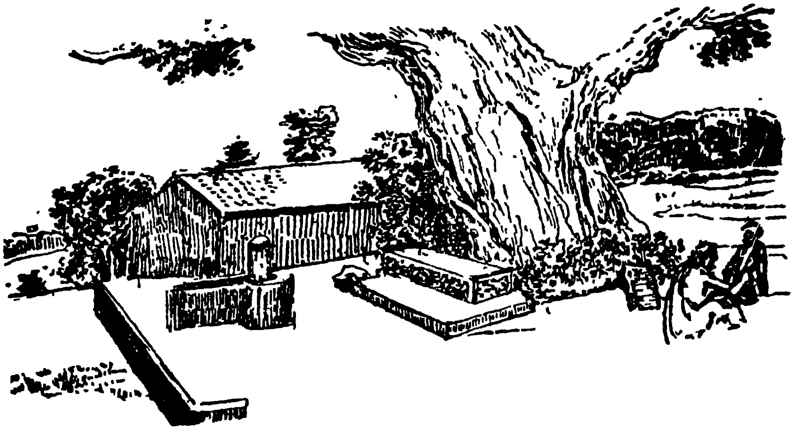
অবধূত আমায় যেন এড়াইতেই চান, এখন বলিলেন,—এখন এত আগে সে কথা

কেন, আগে কাশী আসুন, গঙ্গার সেই দৃশ্য চক্ষের সামনে ফুটে উঠুক—মনে তখন কি ভাব আসবে এখন কি করে বলবো ? আমি একটু দুঃখিত হইলাম দেখিয়াই যেন একটু বেদনা অনুভব করিলেন বোধ হয়, কারণ তারপরই আমার দাড়িতে হাত দিয়া বলিতেছেন, দুটি স্থানে আমি নিঃসঙ্কোচে অনিয়মিত বিচরণ করতে পারি,—এক বৃন্দাবনে যমুনা-তীরে আর বারাণসীতে গঙ্গাতীরে। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এইখানেই আমার পুরস্কার লাভ।

পরদিন আমরা পথে যেস্থানে দিনরাত কাটাইলাম সেখানে কেমন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অবধূতকে খুঁজিয়া পাইলাম না, স্বচক্ষেই দেখিলাম, এখানে তিনি প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিলেন এবং প্রবেশ করিলেন গ্রামে এবং গ্রামখানি অতিক্রম করিয়া বাহিরে শস্যক্ষেত্রের কাছে পথের উপর বাঁধানো চৌতারায় বসিলেন। আমি একটু ক্ষণেকের জন্য এদিক ওদিক করিতে গিয়াছিলাম—আসিয়া দেখিলাম অবধূত সেখানে নাই। নিকটেই গিয়াছেন,—এখনই আসিবেন ভাবিয়া অবশ্য অপেক্ষাই করিলাম। কিন্তু দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল তিনি আসিলেন না দেখিয়া আমার দৃষ্টিতে অন্তরে চারিদিক যেন অন্ধকার হইয়া গেল,—ভোজনের ব্যাপার কিছুই হইল না। আজ এমন যে হইবে তাহার কোন আভাসই পাই নাই—মনে হয় এইবার তিনি আমায় পরিত্যাগ করিলেন।

বলিতে লজ্জা হয় আমার চক্ষে জল আসিল, বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল, স্পষ্টই মনে হইল আমি যথার্থই মহাপাতকী। তার মত পবিত্র পুরুষ কেন আমায় সঙ্গে রাখিবেন, আমি কি তার যোগ্য সঙ্গী ? আমাকে এতদিন যে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন সে যে কি গুণে তা অনুমানও করিতে পারি না, তিনি নিজ গুণেই আমায় অহৈতুকী কৃপা করিয়াছিলেন। যেটুকু পুণ্য আমার ছিল ততটুকুই তাঁর পুণ্যসঙ্গ লাভ হইয়াছে, এখন সেটুকু ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—তাই এখন তিনিও ত্যাগ করিলেন। মনের উদ্বেগে খানিক ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন উঠিলাম তখন প্রায় চতুর্থ প্রহরের মাঝামাঝি। ভাবিলাম আমি কেন আর এখানে পড়িয়া থাকি, আমি তো এখন নিজেই কাশীর দিকে চলিয়া যাইতে পারিব। এখানে থাকা কাহার জন্য ? সকালের দিকে বোধ হয় ন'টা কি দশটার সময়ে এখানে আসিয়াছিলাম, এখন বৈকালে চলিলাম পথে। একা, আজ আমার আর সঙ্গী নাই। এই কয় মাস একত্র সঙ্গে থাকার ফলে যে ঘনিষ্ঠতা, যে মমতা এবং আকর্ষণ জন্মিয়াছিল, ভিতরে ভিতরে উহা ঘনীভূত হইয়া বর্ষণ শুরু করিল। ঠিক কাঁদিতে কাঁদিতেই চলিতেছি। হনহন করিয়া চলিয়াছি, আর ধীরে ধীরে বেড়াইতে বেড়াইতে নয়। যেন আজই সন্ধ্যার পূর্বেই কাশী পৌছাইব, আবেগভরেই চলিয়াছি। ডানদিকে অদূরেই গঙ্গার চর, জল সবই দেখা যাইতেছে, কাশী এখনও নজরে আসে নাই,—প্রায়

তিন মাইল আসিয়া সূর্য্যাস্তের লাল আভা দেখিয়া একটু দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিলাম, মনের আঁধার যেন অনেকটাই কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে সেই যে একটা ফাঁকা ভাব, এ জগতে আমি যেন একা, এই বোধটাই অনেকক্ষণ পীড়িত করিয়াছিল,—এখন খানিকটা যেন পূর্ণ হইল। এইভাবে তখন পা চালাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।



এইখানেই পথের একধারে স্থানটি, বেশ বড় চাতাল, তাহারই উপরে ফাঁকায় একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত, তাহারই সম্মুখেই বিশাল কাণ্ড একটি বৃক্ষতলে বেদী—আজ অবধূত সঙ্গে থাকিলে এইখানেই আড্ডা করিতেন নিশ্চয়ই। কোথায় যে গিয়া পড়িলেন! তিনি যে এইভাবে আমার সঙ্গে এমনটা করিবেন, আমার স্বপনের অগোচর। যাই হোক, চলিতে চলিতে পথের অপর পার্শ্বেই নজর পড়িল। চমৎকার, আশ্চর্য্য,—দেখি ধূলা-মাটির সঙ্গে এক সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, আপাদমস্তক চাদর-ঢাকা একটি শব,—পথের পাশেই পড়িয়া আছে। দেখিয়াই এখন আমার বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল, এখানে নির্জ্জন পথে এভাবে মাটির উপর কাছে কেহ নাই এমন অবস্থায় কে এমন ভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে? জীবনের কোন চিহ্নই নাই, তাঁর এইভাবে থাকার কথা তো আমি জানি, প্রত্যহই দেখি, চৌকিদারি করি যাতে ঐ সময়ে কোন স্পর্শ না লাগে, তাই তো আমায় বডিগার্ড নাম দিয়াছেন। আজ আমার কাছে না হইয়া এতটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু পা ঠেলিয়া ডাকিবার ব্যাপার তো নয়, অপেক্ষা করিতেই হইবে। যখন হারানিধি পাওয়া গিয়াছে, আর কি ছাড়া যায়,—এইখানেই আজ আড্ডা। জয় ভগবান,—এইভাবে এতদূর আসিয়া শুইয়া আছেন, আর সারা দিনটাই আমি খুঁজিয়া অবসন্ন! নিকটেই বসিয়া পড়িলাম। ঐ সময়ে স্পর্শ করিতে নাই তাই অপেক্ষায় রহিলাম। আরও প্রায় পনেরো মিনিট কাটাইয়া, তিনি নড়িলেন।

আড়ামোড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমায় দেখিয়া এবং আমার চক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই মধুর হাসি, তারপর বলিতেছেন, আমায় আর বিশ্বাস নেই তো?

বলিলাম, আপনি কি আমার বিশ্বাস কি অবিশ্বাসের পাত্র?

যাই হোক, আজ আমারা ঐখানেই রাত্র কাটাইয়া প্রভাতে কাশীর দিকে যাত্রা করিলাম। যত তাড়াতাড়িই আমি করি না কেন, চুনার হইতে নয় দিনের আগে কাশী পৌছানো ঘটিল না। ইতিমধ্যেও কত কাণ্ড হইয়া গেল। কাশীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম এখানে পৌছিয়া অবধূত যেন আর এক রকম হইয়া গেলেন, যেন সে মানুষ নয়। সমাজের বাইরের সেই সঙ্কুচিত অবধতের মূর্ত্তিও বুঝি বদলাইয়া গেল। দেবালয়ে প্রবেশ, গঙ্গাস্নান, শিব শিব,—সর্ব্বক্ষণ যেন এক প্রচণ্ড শৈব হইয়া গেলন। গঙ্গার মাটি লইয়া কপালে ত্রিবলী রেখা দাগা হ'ল, আর গঙ্গাধারেই হইল আড্ডা।

কিন্তু আমার আসল কথাটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। সোজা কথা এই যে, উনি জানেন সব, আমার সেই কয়েক দিন হইতে, তাঁহার গুরুর জীবনকথা শুনিতে হইবে অবিরাম মনে উঠিতেছে, কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখিতাম এখন ঠিক বলিবার সময় আসে নাই, কাজেই চুপ করিয়া যাই। তবে নানাভাবে আনন্দেই আমাদের দিন কাটিতেছে। আজ মুন্‌সি ঘাটের কাছে একদল, তাহার মধ্যে প্রবীণ আছে, নবীন আছে, অবশ্য কলেজ-ছাত্র বোধ হয় দুই-চারজন—প্রৌঢ় দুই-তিনজন, বেশ বৈকালের সান্ধ্য-উপভোগের বেলা অবধতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধরিয়াছে। যেমন করিয়া সাধুর কাছে বসিতে হয় সেই ভাবে ঘাটের পাটে বসাইয়া আরম্ভ করিয়াচে। এক-দুজন, বাঙ্গালীর মতই দেখিতে কিন্তু এই দেশেরই হিন্দুস্থানী,—আশ্চর্য্য, বাইরের কোন পার্থক্যই নেই, মাথায় চুলের পাট ব্যাকব্রাস করা, আর পাতলা কাপড়ের হয় শার্ট না হয় পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল না হয় পশোয়ারী কিম্বা পিণ্ডির দোচামড়ার জুতা। বসিয়া আড্ডা দিবার ধরণটাও একই রকমের। তখন আমি একটু আড়ালে গিয়াছিলাম, ইতিমধ্যেই দেখি তাহারা ঠিক আরম্ভ করিয়াছে। তিনিও দেখিলাম বেশ প্রসন্ন মনেই তাহাদের সঙ্গে আছেন। বসিয়া শোনা ছাড়া আর কি কাজই বা আছে আমার? এর মধ্যে বাঙালীও আছে দেখিলাম, তবে তারা পিছনে এমন আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব লইয়া বসিয়া, মনে হয় যেন অনুগ্রহ করিয়া এখানে রহিয়াছে।

কলেজের ছেলেদের বুদ্ধি তো! কখনও স্কুল এবং তাদের গৃহস্থালীর অতিরিক্ত কোন রাজ্যের বাইরের তাদের খবর তো জানা নেই, তাই তার মধ্যে থেকেই প্রশ্ন তুলেছে। মনে হলো তাদের প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তরে অবধূত, এসব ভগবানের লীলা, কিম্বা এই ভাবেরই কটা কিছু বলে থাকবেন। এখন আমি শুনিলাম অবধূত বলিতেছেন,—হাম লোক তো মনুষ, বড়া বড়া বাৎ ক্যা সমুঝে। সওয়াল তো পহলা হোগা তব না জবাব?

একটি ছেলে একটু গৌরচন্দ্রিকা করে, যথা—হাম'লোক তো বিদ্যার্থী, জ্ঞান-ভক্তি কী কুছ বাত সমঝতে নাহি, আগর আপ বুরা না মানো তো এক বাত মৈনে পুছ সকত হুঁ ?

জরুর, জরুর,—কাহে নেহি পুছেগা, আপ পুছিয়ে না।

বো সব যো কুছ ইয়ে দুনিয়ে মে চলতা হৈ, ঘটতে রহতে হৈ, আপলোক ইএ সব কুছ ভগবানকে লীলা বোলতে, ই ক্যা সাচ্চি বাত ? ম্যা ইয়ে পুছ রহা হুঁ।

হাঁ, হাঁ, ইয়ে ভি তো বহোত সাচ্চি বাত, ইহ দুনিয়াকে উপর যো কুছ হো রহা ইয়ে সবহি উনহি'কা লীলা সমঝো তো হরজা ক্যা।

এখন এই সব কথা যেভাবে দুপক্ষে হয়েছিল এখানে হিন্দি থেকে আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

লীলা, এসব তাঁর লীলা, একথা মানুষের বলা সাজে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কেন সাজে না বল তো বাবা—

আপনি কি যে বলেন, এই যুদ্ধবিগ্রহ, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, অনশনের ফলে তিলে তিলে মরা, দুর্ভিক্ষের জন্য শত শত সহস্র সহস্র অনাহারে শীর্ণ-জীর্ণ শরীরে মরে যাচ্চে, মানুষ মানুষকে ছিঁড়ে খাচ্চে—এসব আপনি লীলা বলবেন ? আমার সৈন্যবল বেশী, আমি তোমার রাজ্য আক্রমণ করে সহস্র সহস্র প্রজা হত্যা করে যুদ্ধের নামে ক্ষেত নগর গ্রামকে-গ্রাম উড়িয়ে জালিয়ে পুড়িয়ে বিধ্বস্ত করে, নরনারী পরিবারবর্গ বন্দী করে, হত্যা করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করলাম,—হাহাকারে ভরে উঠলো দেশ,—এই সব লীলা ভগবানের ? এ আপনি বিশ্বাস করেন ? খেলা, লীলা, এসব ভগবানের শুনলে আমার গা রী-রী করে ওঠে ;—ভগবান যদি এই ভাবের খেলা করেন তা হলে তো তিনি শয়তানের উপর শয়তান !

তা হলে তোমার বিশ্বাস কি ?

উত্তর হইল, আমার বিশ্বাস মানুষই এ জগতের সব, শয়তানগ্রস্ত মানুষেরই এসব কীর্ত্তি বলতে পারেন, এখানে ভগবানের কোন হাত নাই। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্চি, কত লোক হত্যা করে কত লোক কত সর্ব্বনাশ করে সহজেই বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চে আর নিরপরাধী রাজদ্বারে দণ্ড ভোগ করচে,—এটা কি ভগবানের রাজত্বে সম্ভব ! ভগবান ঐ পুরীর জগন্নাথ হয়ে আছেন, দুই অ্যাম্পুটেটেড হাত নিয়ে, যদি তিনি থাকেন !

তা হলে মানুষই এখানে সবই তো ? এই তো তুমি বললে, নয় ?

নিশ্চয়ই।

তা হলে ঐ মানুষেরই সব লীলা বলো না চমৎকার হোক,—খেলাটা ভগবান থেকে মানুষেই আসুক যখন মানুষই এখানকার কর্ত্তা।

তাই বা কি করে বলি, মানুষ তো সব নয়, মানুষের সকল শক্তি কোথা ? সব

দেশেই তো দেখা যায়, একদল কি করে যে শক্তিমান হয়ে ঐ দেশের প্রজাসমষ্টির উপর আধিপত্য করচে—কি জানি কি করে শক্তিলাভ করে এতটা প্রভাব বিস্তার করে—· সাধারণের উপর তম্বি করে টাকা আদায়, দেশবিদেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ জড়িয়ে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়ে জগতের মানুষসমাজকে অবিরাম উত্ত্যক্ত করচে, দেশে শান্তি থাকতে দেবে না।।

কেন যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের শক্তিশালী হওয়ার পরিচয় এর আগে কি কোথাও পাওনি ? এ-দেশ ও-দেশ সব দেশেই তো মানুষসমাজেই ঐ সব কর্ম্মই আছে, যেমন আগেকার দিনে ছিল এখন আবাব নূতন করে কি হয় !

এমন, এখন যেমন ইউরোপ আমেবিকা বাশিয়ার মধ্যে হচ্চে এমনধারা আগে ছিল কি ?

কেন স্বাধীন ভারতেব সময়েও ঐ যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ প্রতি যুগে-যুগেই সমাজকে ওলটপালট কবে দিয়েছে—তারও আগে পুরানো কালেও ঐসব ঠিক হয়ে গিয়েছে। রাবণেব নাম শোনোনি ? কি অসাধারণ শক্তিব অধিকারী। সে তো একটা লোক,— সে আর কত কববে ?

তাবা তো রাক্ষস। তাদেব কথাই আলাদা।

আবে বাবা এটা জানো না, আর্য্য জাতি ভগবানের প্রিয়তম, সর্ব্বকনিষ্ঠ আদুরে ছেলে যে, তাই তো যারাই আর্য্যদের চেয়ে শক্তিমান, প্রতাপশালী দেখা যেতো, যাবাই আর্য্য-দলকে ঠ্যাঙ্গাতে পারতো তারাই, হয় বাক্ষস না হয় দানব না হয় দৈত্য ঐ রকমই অসভ্য বর্ব্বব গোছের উপাধিতে ভূষিত হোতো। কাজেই রাবণ রাক্ষস হিরণ্যকশিপু দৈত্য ঐরকম সব। যাই হোক, তখনকার দিনে রাবণের মত প্রতাপশালী রাজা তো আর ছিল না। একটা লোক, তখনকার দিনে রাজা হলে অনেক কিছুই করতে পারতো, তা ছাড়া শক্তিলাভের তপস্যায় কত শক্তি একটা মানুষেই লাভ করতে পারে, ঐ রাবণই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে ছিল পুলস্ত ঋষির ছেলে, তার তো ঋষি হবারই কথা, কিন্তু সে হোলো রক্ষরাজ। মাতৃকুলের শক্তিতেই তার যা কিছু। শুধুই নিজের ভোগ মেটালে চলবে না, স্বর্গ-মর্ত্ত্য জুড়ে চাই শক্তির প্রভাব, সব চাই, যা ইচ্ছা করবো। আমার শক্তির প্রভাব দশ দিকে অনুভব করবে লোকে। সে কী মনে করে এটা করেছিল তা তো শেষকালে বলেও গিয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল সবার উপরে যাবে তার কর্ম্মশক্তি ;— তা সে পেয়েছিলও। সে প্রজাদের সুখী করতেও চেয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ পুত্র, ভাই বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ সেনাপতি,—সোনার লঙ্কার কত আশ্চর্য্য ধনসম্পদ ঐশ্বর্য্য তার কথায় আর কাজ কি—ওদিকে আবার ইন্দ্র তার উদ্যানপাল, যম অশ্বশালাধ্যক্ষ, চন্দ্র তার আজ্ঞাবহ, শিব দ্বারি, দুর্গা পুরিরক্ষক,—এই রকম সব দিকেই তার শক্তির মহিমা প্রচারিত

হয়েছিল, তবুও তার পতন ঘটল মানুষের হাতেই। সব সামলাবার শক্তি মানুষের কোথা? বিশেষতঃ একটা রাজা—একজনের বুদ্ধিতে সব কিছু রক্ষার সম্ভাবনা নেই দেখেই না এতদিনের পর মানুষসমাজ গণতন্ত্রের পক্ষপাতি হয়েছে? কিন্তু তাতেই বা কি এমন উন্নত হয়েছে, শান্তির পথে গতি হয়েছে কি? সেই দম্ভ সেই শক্তির আস্ফালন সবই তো ঠিক ঠিক রয়েচে, বরং বেশী বেশী প্রচারটা হয়েছে।

কল্পনায় দেখতে কেমন লাগে। একটা মানুষের শক্তির কতটা বিকাশ, তারপর যা কিছু সবই তার শেষ হোলো নিজের দম্ভের সঙ্গে সঙ্গে,—দুই আর দুই চার—পাঁচও নয় তিনও নয়। এ তো হবেই, তবুও মানুষের দম্ভ যায় না।

কেন বলুন তো? মানুষ হেরেও হার স্বীকার করবে না! আবার শক্তিসঞ্চয় করে আবার উঠবে। মানুষের সত্তা যেটা সে আত্মা, সে তো পরাজয় জানে না—সেইজন্য রণে পরাজিত হলেও মনে অপরাজিত। তবে দম্ভ অহঙ্কারটা আত্মতত্ত্বের বিরোধী…কিন্তু আসলে আত্মা তো মহান, তিনি এখানে খেলতে এসে মনের সাহায্যেই কর্ম্ম এবং ভোগ আরম্ভ করলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ অথবা নিজ প্রবৃত্তির বশে চলতে চলতে বুদ্ধি বিবেক চাপা পড়তে লাগলো যতো, আর মন কল্পিত স্বাধীন ইচ্ছা বা শক্তিলাভের কামনা তীব্র হতে লাগলো। ফলে আত্মা, শক্তি ও ভোগের অধিকারে এসে দুরাত্মা হয়ে উঠলো। তখন শক্তিলাভই প্রবল আকাঙ্ক্ষা দাঁড়ালো।

আচ্ছা, ঐ তপস্যায় বরলাভটা কি?

সেই যে, আত্মার বা আমির সর্ব্বশক্তিমানতা, সংস্কাররূপে বা বুদ্ধিরূপে এটা তো সব সময়েই তার মধ্যে আছে? কেবল বর্ত্তমান ও অতীতের ভোগ ও কর্ম্ম সংস্কারে যুক্ত বলেই সব সময়ে সেটা প্রতিভাত হয় না। ভিতরে থাকে তো। এখন হয় কি, যখন অন্ধ মনের অর্থাৎ কামনার লালসে কোন প্রবল একটা ভোগের অবস্থায় মাথা ঠুকে যায় অর্থাৎ সেই কর্ম্মের সাফল্যের পথে কোন প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হয় যেমন বিশ্বামিত্র প্রভৃতির হয়েছিল। গাধীসুতের সব চাই। আমি রাজা, রাজদণ্ডে হুকুম হোলো ঐ কামধেনুটাও চাই। বশিষ্ঠ বলেন, এতে রাজার অধিকার নেই, রাজার ভাগ রাজস্ব মাত্র, তারপর যা কিছু শ্রদ্ধার দান, দাবী নেই বা দাবী করার অধিকারও নেই। অন্যায় দাবী, রাজার স্বধর্ম্ম চ্যুতির লক্ষণ, চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও শান্তি নেই। তখন রাজা তো আর ধর্ম্মাত্মা নয়, তখন দুরাত্মা অবস্থা বিশ্বামিত্রের, ফলে স্থূলদম্ভ প্রসূত রাজশক্তির অপব্যবহার, —জোর করে নেবো। তার চরম পতন তো আগেই হয়ে গিয়েছে।

— কখন? যখনই বশিষ্ঠের তপোলব্ধ অথবা আত্মশক্তিতে উৎপন্ন কামধেনুর উপর দুর্জ্জয় লোভ হয়েছে, অমন একটা আশ্চর্য্য জিনিস, ওটা রাজভোগ,—বুদ্ধিকে দাবিয়ে মনের খপ্পরে পড়েছেন রাজা তখনই তো চরম পতন। তারপর যুদ্ধবিগ্রহ বা পশুবলের অপর

নাম রাজশক্তির সাহায্যে যা কিছু তার স্বাভাবিক পরিণতি। ঐ প্রবল ধাক্কাটি খাবার পর তখনই না তপোবলের মহিমা তাঁর বুদ্ধিগোচর হোলো।

সত্য—এই সব সহজ সত্য তখনকার দিনে এতটা শৌর্য্যবীর্য্যশালী ক্ষত্রিয় রাজাদেরও উপলব্ধির পথেও কত বাধা ছিল, তাইতেই পশুভাবটা মানুষ-মনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত মনে হয়।

সবাই কেন হবে? ধাত বুঝে হবে তো? পশুভাব-মুক্ত হলেই না আত্মশক্তির মহিমা প্রকাশিত হয়। মনের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি না হলেই বা সেটা হয় কি করে? রাজা হয়ে যখনই সিংহাসনে মাথা উঁচু করে বসা, তখনই তো অন্তরে পাপ-দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েচে।

একদিকে মন বাইরের দিকে চেয়ে বলে সবার বড় হব, বুদ্ধি বলে, ও কি কথা, সবাই তো আত্মা, তোমারই সত্তা, সবার বড় হবে কেন, সবাইকে তোমার সঙ্গে এক করে নাও অথবা সবার সঙ্গে মিলে যাও, এক হয়ে যাও। কিন্তু তা হলে তো সিংহাসনে মাথা উঁচু করে বসা চলে না। ঐখানেই তো দ্বন্দ্ব। তখন মনের প্রভাব—সিংহাসন কত তপস্যা করে পাওয়া যায় সুতরাং সিংহাসন ছাড়া যায় না, আবার বুদ্ধির তাগিদও আছে—সবাইকে নিয়েই তুমি আত্মা—সর্ব্বশক্তিমান। বড়-ছোট নিয়ে কথা নয়। তারপর বলুন তখন, বিশ্বামিত্র তপস্যায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আত্মসংস্থিত হয়েছিলেন কি? অবধূত বলিলেন, ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন সবশেষে, সকল গলদ কেটে যাওয়ার পর। প্রথম তপস্যার আরম্ভটাই হোলো রজোস্তম গুণেই। রজগুণি আধার তো, সেই গোড়ার গলদ তখনও রয়েচে, তাই প্রথম পতন ঐ ইন্দ্রিয়ভোগের গলদ,—শকুন্তলার জন্ম, তারপর হিংসা-প্রতিহিংসার গলদ,—বশিষ্ঠের শতপুত্র নাশ—আঃ, সে-সব গলদ এ ধরণীর নূতন পুরানো প্রত্যেক জাতির সমাজ-মধ্যে গজগজ করচে,—চারিদিকে দেখতে পাচ্চ না? হয় শত্রু, না হয় মিত্র—এ ছাড়া তার বুদ্ধি যাবে না। আমার এটা চাই, তুমি দেবে না, তুমি শত্রু সুতরাং যুদ্ধং দেহি। ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়ে গেল। আপস চমৎকার মন-বুদ্ধির,—তার চরম হোলো ধর্ম্মকে এই যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনা। আমার দাবী ধর্ম্মের দাবী, তাই যুদ্ধ করচি, অপর পক্ষও বলচে এক্ষেত্রে আত্মরক্ষাই আমার ধর্ম্ম সুতরাং তোমার আক্রমণ প্রতিরোধ করা আমারই এটা ঠিক ধর্ম্ম। তারপর দুই পক্ষেই চেষ্টা চললো অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদের যতটা নিজ দলে টানতে পারে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সফল করতে। এই তো এখনকার রাজনীতি, তখনও তাই ছিল, আসলে শক্তি থাকলেই ঘাত-প্রতিঘাতের কর্ম্ম অবাধ হবেই। যারা এটা বুঝে নেয় তারা রাজনীতি রাজধর্ম্ম নিয়ে কালক্ষেপ করতেই পারবে না। শান্তির পথ বেছে নেয়।

আচ্ছা তপস্যাও আত্মশক্তির প্রয়োগ তো? তাই তো, যেটা এখনই আমার আয়ত্তের-

মধ্যে নয়,—আত্মশক্তির প্রয়োগ করেই সেই শক্তি প্রয়োগের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা—নয় কি ? রাবণ তো তাইই চেয়েছিল,—অপ্রতিহত রাজশক্তিই তার চাই—যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো।

ভগবানের এই সৃষ্টি, এটি রক্ষার ব্যবস্থাও এর সঙ্গে আছে ;—সেই রক্ষার নিয়মেই যথেচ্ছচারীরা ধ্বংস হয়েছে —এঁর জন্য তাঁকে উপস্থিত হয়ে পৃথকভাবে শক্তিপ্রয়োগের দরকার হয়নি তো !

তাহলে অবতার ? অবতার বলে এক্ষেত্রে যদি তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় তো বলো না। এ হিন্দুস্থানের হিন্দুরা লীলাময় ভগবানে বিশ্বাসী, ভগবানকে ভগবানের জায়গায় রেখে দূর থেকে লক্ষ্য করতে ভালবাসে না ; অনেক দূর ব্যবধান রেখে সুখ নাই, তাঁকে আমাদের মধ্যে এনে ফেলতে পারলে, তাঁকে নিকটে পেয়ে ভোগ করা যায় ভালো। তাইতেই পরম সুখ। নয় কি ? তারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা চরম আবিষ্কার হোলো এ জগৎ তাঁরই লীলা, প্রথমেই যেটা তুমি মানতে চাওনি।

তা হ'লে আপনি যেন অবতার স্বীকার করতে চান না, মনে হয় আমার।

ঐ দেখ, কি একটা ছেলেমানুষের মত কথাই বললে ! ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান যদি বলি আর মানি, তা হলে অবতার স্বীকার-অস্বীকারের কোন জটিলতা থাকে কি ?

তবুও যেন একটু কিন্তু আছে আপনার মধ্যে।

কি যে বলো, কিন্তুটা আবার তার মধ্যে কোথা থেকে আনচো ?

সেটা এই যে, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান সুতরাং অবতীর্ণ হতে পারেন যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সে ইচ্ছা করেন কিনা এইখানেই আপনার কথা, আপনি যেন মনে করেন তিনি সে-ইচ্ছা করেন না।

অবধূত বেশ প্রসন্ন মনেই কথা কহিতেছিলেন, এখন এমনই একটা তন্ময়তার মধ্যে ডুবিলেন, আর কারো কথা কহিতেই সাহস হইল না। কিন্তু তিনি এই ভাবেই কথাটা শেষ না করিয়াও আমাদের উঠিতে দিলেন না ,—তিনি অমৃত-নিঃস্যন্দিনী কণ্ঠে বলিলেন, আমরা মানুষ, আমাদের ভগবানের ইতি করা ঠিক নয়।

এবার যোগী একটি ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতে ছিলেন,—দেখিয়া ছেলেদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, আপ ক্যা দেখতে ?

উত্তরে যোগী বলিলেন, ম্যায় দেখতা হু কি বোহি বিদ্যার্থীকো যোগিকা লক্ষন প্রকট হৈ।

বো ক্লাস মে ভি আচ্ছা হৈ, সবকোই কো উপর রহতে,—ম্যাথামেটিক্স মে বহুত অচ্ছি হৈঁ। পরিচয়ে জানা গেল এরা সবাই বি. এস-সি. স্টুডেন্ট।

একজন বলিল, মুখ দেখিয়া না শরীর দেখিয়া যোগী চেনা যায় ?

অবধূত কথার কোন উত্তর দিলেন না। আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম এই বোকার মত প্রশ্ন শুনিয়া। অবধূত আমার দিকে ভৎর্সনা-মিশ্রিত একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। ছেলেটি আর কোন প্রশ্ন করিল না।

১৩

অবধূত গুরু যোগী নির্ম্মল

পরদিনই তাহাকে ধরিয়া বসিলাম, বলুন আপনার গুরুদেবের কথা, এইখানেই কতদিন কেটে গেল, শেষে আর ঘটবে না বোধ হয়। তিনি এমন ভাবেই আমার দিকে দেখিলেন, —তাহাতেই আমার মনে হইল যে আজও তিনি উহা এড়াইতে চান। তখন আমি জোড় হাত করিয়া বলিলাম, প্রভু, আজ আর মুলতুবী রাখবেন না, দোহাই আপনার!

তখন তিনি বলিলেন, দেখো আজ তুমি আমায় যে ভাবে ধরেচ, না শুনে যেন ছাড়বেই না, —কিন্তু আমার দিক থেকে একটু ভাববার আছে।

আমি বলিলাম, এমন কি ঐ সাধুজীবনে থাকতে পারে ?

ঐ ডাকিনীসিদ্ধির কথাটা, বলিয়া তিনি সহজ ভাবেই আমার দিকে চাহিলেন, তারপরে বলিতেছেন, এখনকার দিনে ওসব শুনে তোমার মত একজনের মনে মোটেই কোন শুভ ফলের বা আনন্দের আভাস পাবে না, সেইজন্য ওসব এখন আলোচনাও করা উচিত নয়।

আমার মনে হইল, আর চাপাচাপি করা আমার উচিত নয়। কিন্তু তা মনে হইলেও মুখে ঠিক অন্য কথা একটা বাহির হইয়া গেল,—আপনিই ডাকিনীসিদ্ধির কথাটা বলে-ছিলেন, সেই সাধনের বিষয়টি শুনবো, জানবো, বুঝবো বলেই আমার কৌতূহল বেড়েও রয়েচে।

তা হলে আমায় বলতেই হবে, তবে তখনকার দিনে এইসব সাধনা যারা করেচে তারা কি মনোভাব নিয়ে ঐসব সাধনায় প্রবৃত্ত হোতো, আর সিদ্ধ হলে কি লাভ, আর পথভ্রষ্ট হলে কি ভয়ানক দণ্ডভোগ করতো—সেই পরিচয়টুকু অন্ততঃ পাওয়া যাবে।

তাহলে আজ আর ঘুমাবে না বলো,—

এখানে পরিস্থিতির কথা একটু আছে। বেণীমাধবের ধ্বজা অর্থাৎ পুরাতন সেই মসজিদের মিনার যেখানে, তারই তলায় আমরা বৈকালে আসিয়া বসিয়াছি,—নিরিবিলি, আর বেশ ঠাণ্ডা ছিল, কারণ সারাদিন আজ মেঘে ঢাকা আকাশ, পাথর তাতে নাই। এইভাবে তিনি তখন আরম্ভ করিলেন, আমার গুরুর কথা,—যখন তাঁকে পেয়েছিলাম, তখন শেষ অবস্থা। তিন বৎসর তাঁর আশ্রয়ে ছিলাম, এর মধ্যে এক-একটি উপলক্ষ করে

তিনি তাঁর জীবনের প্রধান কথাগুলি আমায় সবই বলেছিলেন, যেমন এই কয় মাসে তোমাকে আমার জীবনের প্রধান কথাগুলি সব বলেছি। তাও এখন বলি, তার জীবন-কথা ঐভাবে না শুনলে আমিও তোমায় অমন করে বলতেই পারতাম না। অবধূত আমরা, সন্ন্যাসী হলেও সাধক সমাজের আইনকানুনও সব সময় মেনে চলি না, যখন নির্ম্মল আনন্দ লাভের সুযোগ আসে। আমার গুরুর নামটিও ছিল নির্ম্মলানন্দ। তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের নাম পুরন্দর শর্ম্মা, পরম রূপবান ছিলেন। শাক্ত বা তান্ত্রিক বংশ তাঁদের, তাঁর বাবা একজন কর্ম্মী, গার্হস্থ্য জীবনেও অনেক দূর উন্নত সাধনসম্পন্ন, অথচ সামাজিক মানুষ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের মধ্যে তাঁরা বেশ সম্ভ্রান্ত মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।

পুরন্দর নিজ গ্রামে টোলে সংস্কৃত পড়েছিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁর মেধা ছিল অসাধারণ, এমন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ছিল, তুমি তার কথা শুনলেই বুঝতে পারবে, তিনি কোন বিষয়ে যা কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন, সেই জ্ঞানোদয় থেকে, তখন পর্য্যন্ত কিছুই ভুলে যাননি। তাঁরা তিন ভাই, ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ, সুতরাং বাপ-মায়ের খুবই প্রিয়। জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় তাঁর বাল্যকাল থেকেই পিতামাতার জানা ছিল। তাঁর কোষ্ঠীর ফল এইরকম ছিল, তিনি গৃহ-বাসী হবেন না, পর্য্যটক হবেন এবং সিদ্ধযোগী হবেন। তিনি তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে ও নৌকাপথে ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি তাঁর পাঠ্যাবস্থায়ই দেখে এসেছিলেন।

পুরন্দর শর্ম্মা ছিল তাঁর পিতৃদত্ত নাম, দীর্ঘ শরীর, গৌরবর্ণ, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন তিনি—বাল্যকাল থেকেই তিনি নারী সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁর উপনয়নের সময়ে এক মা ব্যতীত অপর কোনো নারীর হাতে ভিক্ষা নেননি। উপনয়ন হয়েছিল তাঁর যখন দশ বৎসর বয়স,—আকুমার ব্রহ্মচারী, নিষ্ঠাবান ছিলেন তিনি,—শেষে পিতাই যোগমার্গে দীক্ষা দিয়েছিলেন উপনয়নের পর। পাঁচ বৎসর অভ্যাসের পর তাঁর যোগবিভূতির বিকাশ হয়েছিল। এ বিভূতি অসাধারণ রকমের। সেই সম্বন্ধে যা কিছু পরে বলচি, এখন তাঁর প্রথম থেকে ঐ স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষা নিয়ে যে ভাবের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে-ছিল তাঁর মধ্যে, যার ফলেই তাঁকে ঐ এক অদ্ভুত সিদ্ধির আবর্ত্তে পড়তে হয়েছিল। তাঁর সংস্কারও এমন ছিল যে শাক্তবংশের মধ্যে এই ভাবের সংস্কার আর একজনেরও ছিল না। সেইজন্য তাঁর পিতা বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলেন। এই সৃষ্টিছাড়া পুত্রের উপনয়নের পর তাঁর আচার ও ব্যবহার নিয়ে তাঁদের সংসারে একটি বিষম অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। অবধূত গুরু আশ্রয় করবার পূর্ব্বে, বোধ হয় সেই কারণেই প্রথমে তাঁকে তান্ত্রিক কৌলাচারের মধ্যে যেতে হয়েছিল।

পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ এক পুষ্করিণীর মধ্যে একই ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে সবাই স্নান করে। ঐ গ্রামের মধ্যে তাদের পল্লীতে ঐ এক পুকুরেই সবার জলের অভাব মোচন

হোতো। কিন্তু কেউ কখনও পুরন্দরকে দিনমানে সেই পুকুরে নামতে দেখেনি। পথে চলতে সব সময়েই পুরন্দর মাটির দিকে চেয়ে চলতেন। বাল্যকালে এমন ভাবের সকল বিষয়ে সংযম আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি। সেই জন্য যথার্থ আপনজন ব্যতীত অপরে তাঁকে একটু বিশেষ বিদ্বিষ্টভাবে দেখতো, তারা মনে ভাবতো এসব বাড়াবাড়ি, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের অশুভ লক্ষণ।

ঐ সময় একদিন এক ভৈরবী গ্রামে এসে শিবমন্দিরের দাওয়ায় বসে বিশ্রাম করছিল, কয়েকটা ছেলে সেখানে তার কাছে গিয়ে নানাভাবে জ্বালাতন আরম্ভ করে দিল। ঐখান দিয়ে পুরন্দর যাচ্ছিলেন, তখন চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের কিশোর, পরম সুন্দর তাঁকে দেখতে,—দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান, লাবণ্যমণ্ডিত দেহ, পথের পানে দৃষ্টি রেখে চলেছেন। ছেলেরা তখন কেউ ভৈরবীর হাত ধরে টানে, কেউ তার বোঁচকা নিয়ে খুলে দেখবে কি আছে, কেউ তার ত্রিশূল নিয়ে টানাটানি লাগিয়েছে। পুরন্দরকে আসতে দেখে ভৈরবী চেঁচিয়ে বললেন, বাবা, আমায় রক্ষা কর, এদের হাত থেকে বাঁচাও।

পুরন্দর সেখানে এসে ছেলেদের দিকে কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন,—কোনো কথা নয়, সঙ্গে, সঙ্গেই ছেলেরা কোন কথা না বলে যে যেদিকে পারলে দৌড় দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরও ফিরে গন্তব্যের দিকে যাবেন, ভৈরবী বললে, একটু দাঁড়াও।

শুনে তিনি দাঁড়ালেন, দৃষ্টি মাটির দিকে। ভৈরবী বললে, আমার দিকে চাও।

পুরন্দর বললে, কেন? আমার নিষেধ আছে। দৃষ্টি তাঁর স্থির,—নিম্নদৃষ্টিতেই বললেন, বলুন আপনার কথা, এখনই যেতে হবে আমায়।

ভৈরবী উঠে দাড়িয়ে একখানা হাতে পুরন্দরের হাত ধরতে গেল, সঙ্গে-সঙ্গেই কি ভাবে যেন আঘাত পেয়ে 'বাপ রে' বলে পিছনে হটে এলো, তখন পুরন্দর সোজা নিজ পথে অগ্রসর হয়ে পড়লেন।

এখন ভৈরবী আর কোন কথা না বলে নিজস্থানে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো—পুরন্দরের গতি অনুসরণ করে চললো তার দৃষ্টি। তারপর কি মনে হোলো তার, উঠলো, দৌড়ে পুরন্দরের পিছনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভদ্র! তুমি কি দীক্ষিত, তোমার গুরু কে?

আমার পিতাই আমার গুরু।

পুরন্দরও চলতে লাগলেন, ভৈরবীও চলতে লাগলো। বাড়ী পৌঁছে পুরন্দর সোজা তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত, পিছনে ভৈরবী।

পিতা সব দেখলেন, কি বুঝে পুরন্দরকে বললেন, তুমি একটু অন্তরে যাও তো। পুরন্দর চলে গেলে তিনি ভৈরবীকে বললেন, কি ব্যাপার?

প্রণাম করে ভৈরবী বসলো তার পায়ের কাছে। যা কিছু কথা তা গোপনেই হয়েছিল। তারপর ভৈরবী সে গ্রামে আর রইলো না, কোথায় চলে গেল কেউ জানে না।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আর এক ব্যাপার। এক অতি প্রাচীনা বুড়ী, কত যে তার বয়স বলার যো নেই, মাথায় কাঁচা পাকা ঝুপী জঙ্গলের মত চুলের বোঝা, পরনে ছেঁড়া কাপড় মাত্র কোমরে বাঁধা, সারাদেহ মুক্ত, কাঁধে একটি ঝুলি তাও ছেঁড়া, তাতে কি যে আছে তা জানবার কথা নয়, তবে তার মধ্যে কিছু ছিল এটা বুঝা যাচ্ছিল তার আকার দেখে। পুরন্দরের দ্বারের ছাঁচের কাছে এসে বসলো। পুরন্দরের পিতা বার হবার সময় দেখলেন, কিছুই বললেন না। হয়তো ভাবলেন সাধারণ ভিখারিণী, কিন্তু পুরন্দর যখন বার হলেন, তিনি,—কখনও যার মুখ তুলে চাহবার কথা না, হঠাৎ মুখ তুলে চাহলেন, সেই বুড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়লো, তখনই ফিরে সেই বুড়ীর দিকে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন। আর বুড়ীও তখনি উঠলো ও চলতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরও চললেন তার পিছনে পিছনে। এই ভাবে পথ দিয়ে চলচেন দুজনে,—যারা দেখচে তারা যেন একটু আশ্চর্য্য হয়েই দেখচে, এমন ভাবে একটা বুড়ীর পিছনে বালক পুরন্দরকে চলতে দেখে তাদের মনে কোন প্রশ্ন উঠচে কি না বলা যায় না তবে যে দেখচে সেই ব্যক্তি আর একবার দেখে তবে নিজ পথে চলতে বা নিজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করতে পেরেচে। এইভাবে গ্রাম পার হয়ে যখন মাঠে পড়লো তখন বুড়ী পথের পাশে একটা নিরিবিলি স্থান,—একটা বটগাছের তলায় এসে দাঁড়ালো, পুরন্দরও দাঁড়ালেন। এবার বুড়ী বসলো, পুরন্দরকে বললে, বোসো এখানে, বলে যেখানে বসতে হবে ইঙ্গিতে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে। পুরন্দর বসলেন যেখানে সেথায় কোমল ঘাসে ভরা,—বেশ পরিষ্কার স্থানটি।

এবার বুড়ী ঝোলা নামিয়ে তা থেকে একটি শিকড়ের মত দ্রব্য বার করে পুরন্দরের হাতে দিলে, বললে, এটা রাখো। আবার বুড়ী বললে, বেশ ভাল করে স্থির হয়ে আসনে বসো। পুরন্দর তাই করলেন। তখন বুড়ী বললে, এখন দেখো তো,—আমার দিকে,—দেখো চেয়ে।

পুরন্দর দেখলেন। কি দেখলেন বুঝা গেল না বটে, তবে সেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল, তারপর তার ধ্যানাবেশে স্নিগ্ধ দৃষ্টি ক্রমে বিস্ফারিত হতে দেখা গেল। সে কি বিস্ফারণ,—পূর্ণ আয়তনে সেই চক্ষু যেন সামনের মূর্ত্তি গ্রাস করে ফেলতে চাইলো। তারপর ধীরে ধীরে পুরন্দরের চক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। নারীজাতার প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব থাকলেও, এই বুড়ীর সঙ্গে কেমন একটা শ্রদ্ধা ও স্নেহমিশ্রিত ভাবের সম্পর্ক যেন হয়ে গেল। বুড়ীর কিন্তু রূপের পরিবর্তন না হয়ে একটা অপরূপ লাবণ্য ফুটে উঠলো তার শীর্ণ শরীরে।

ইনি কে ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া গেল, আমি ত্রিপুরাসুন্দরীর দাসী—প্রধান লীলা-সহচরী, পরে আমার যা পরিচয় পাবে, তা সাধকের সিদ্ধিদায়িনী। পুরন্দর যেন সমাধিস্থ।

এই যে পরিবর্ত্তন, জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ শরীর ক্রমে ক্রমে যেভাবে অনির্ব্বচনীয়া লাবণ্যময়ী গম্ভীর মূর্ত্তিতে পরিণতি—এ দেখা যার ইন্দ্রিয়-মনে ঘটে, সেইই জানে বা বুঝতে পারে, কিন্তু জীব সাধারণের কোন সম্ভাবনা নেই। পুরন্দরের মধ্যে এই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই এক পরিবর্ত্তন এল যা তিনি তখনই ধরতে পারেননি, কিছু সময় লেগেছিল ঐ পরিবর্ত্তন অনুভব করতে।

কিছুদিন এইভাবেই কাটিলে পর তিনি গৃহত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে পরশুরাম কুণ্ডে আসামের প্রান্তে চলে যান। সেইখানেই এক কৌলের কাছে নিজ খেয়ালবশে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পূর্ব্বেই গুরু শিষ্যকে দেখেই বুঝতে পারলেন, এই অসাধারণ বালকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, দৈব্য সম্পদে ও শক্তিতে পূর্ণ।

এমন শিষ্য পাওয়া গুরুর ভাগ্য। যাতে পুরন্দর তার কাছেই থাকেন, সেইজন্য তাকে যত্ন-স্নেহে মুগ্ধ করে রাখতেই চেয়েছিলেন। সাধনার কৌশলগুলি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে খুলছিলেন এমনভাবে যাতে শিষ্য সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, কারণ তাঁর সাধন-তৃষ্ণা এবং বৈরাগ্য প্রবল ছিল। তারপর ঐ যে ত্রিপুরাসুন্দরীর সহচরী অথবা দাসীর সেই মূর্ত্তি তিনি দেখেছিলেন, তখন থেকেই তার সিদ্ধির পিপাসা অদম্য হয়ে উঠেছিল, সেজন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তিনি ঐ কৌল গুরু করলেন। তাঁরা তান্ত্রিকের বংশ ছিলেন বলেই ঐ প্রবৃত্তি তার হয়েছিল।

এই গুরুই তাঁকে ডাকিনীসিদ্ধির কথা শুনিয়েছিলেন, আর বুঝিয়েছিলেন ডাকিনী স্বয়ং ঐ ষোড়শী, তাই তখন তিনি ঐ সাধনার পথেই যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ গুরুর সাধ্য ছিল না তাঁকে সে-পথের যথার্থ নির্দ্দেশ দেবার। এই কথাটি যখনই বুঝলেন ঠিক তখনই তিনি বড কাতর হলেন, কে আমায় পথ দেখাবে ! এই ভেবে একেবারে বিমুখ হবার আগে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তিনি পাশমুক্তির সাধনটি সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, এইজন্যই তাঁর পরে অনেক সুবিধা হয়েছিল। এই রকম অশান্তিকর অবস্থায় তাঁকে বেশীদিন থাকতে হোলো না।

কোন আভিচারিক কাজে একদিন তাঁর গুরু কিছুদূরে গেলে তিনি কাছে এক জলাশয়ের ধারে বসে ভাবছিলেন। এমন সময়ে আশ্চর্য্য হয়েই দেখলেন, সেই বুড়ী তাঁর দিকে লক্ষ্য করচে জলাশয়েরই ধারে ওপার থেকে। দেখেই তিনি ছুটলেন তাঁর কাছে। গিয়ে বললেন, আমার কি হোলো, আমার সেই শক্তি কোথা গেল, আমি কুমার—কখনও কোন নারীর প্রতি আসক্ত হইনি, কখনও হবো না এই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এখন আমি এসব কি করচি, আমার ভাল লাগে না।

বুড়ী বললে, ঐ দম্ভ ছিল তোমার, তাই দেখেই আমি তোমার শক্তি হরণ করেচি।

আবার ঐসব শক্তি তোমার ফিরে আসবে, আগে তুমি শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ কর।

তাতে পুরন্দর বললেন, তাতে নারীসহায়তা লাগবে যে, আমি নারী নিয়ে কোন সাধনে বিশ্বাস করি না।

ঐখানেই তো তোমার গলদ—মহাবিদ্যাকে মানবে না, তাকে অবজ্ঞা করে কেউ কোনদিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারবে কি? কাজেই তোমার সিদ্ধির পথ বন্ধ।

তখন তিনি শরণাগত হয়ে বড়ই কাতর ভাবেই তাঁকে ধরলেন, আমায় উদ্ধার করুন। তাইতে তিনি তাকে ডাকিনীসিদ্ধির হদিস দেন, —ঐ সিদ্ধিতে নারী-সহায়তার প্রয়োজন হবে না, আর আমার দ্বারাই সম্ভব হবে। আমি তার সব কিছুই তোমায় দেখিয়ে দেবো। জেনে রাখো এটা একাসনে তিনটি দিন ও তিনটি রাত্রের সাধন,—তৃতীয় রাত্র-শেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সিদ্ধি।

তাইতেই রাজী হয়ে তিনি প্রথমে ঐ ভিখারিণীর সাহায্যে সাতদিন ধরে ঐ সাধনের প্রকরণ,—প্রথমে কি করতে হবে, তারপর কি করতে হবে এইভাবে করণীয়গুলি অভ্যাস করে নিলেন, যাতে তার দীর্ঘ সাধনকালে কোন ভুল-ত্রুটি না হয়। এইগুলি যখন তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেল তখন ঐ বুড়ী তাঁকে সিদ্ধ বীজমন্ত্র দিলেন, ঐ সিদ্ধ শক্তিবীজ গ্রহণ করে তিনি সাধনে লাগলেন।

যাদের গোড়া তৈরী থাকে, তাদের তিনটি দিনে ও রাত্রের সাধন। ডাকিনী রাজ্যে যাবার,—প্রথম দিনে মরু, দ্বিতীয় দিনে জল, তৃতীয় দিনে বন, ভয়ানক পর্ব্বত ও বন-রাজ্য অতিক্রম করে তবে ডাকিনীরাজ্যে পৌঁছাতে হবে। ঐ তিনটি দিনেই যা হোক একটা ঘটে যায়। হয় ঐশ্বরিক শক্তিলাভ, না-হয় চির পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকতে হয়।

আমি অবাক বিস্ময়ে ঐ সকল সাধনের ক্রম শুনিতেছিলাম। এখন হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, অনেক দূরে—সে কি ভারতবর্ষের মধ্যেই তো?

শুনিয়া অবধূত একটু হাসিয়া কৌতুকভরে, কতকটা রহস্যের ভাবেই আমার দিকে দেখিলেন, তারপর আস্তে বলিলেন, তুমি সব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জেনে কি করবে—সব বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তবে আমি কিছু মনে করবো না একটা কারণে—সেটি এই যে, আমারও ঐ সব কৌতুহল হয়েছিল, আমিও তাঁর কাছে ঐ রকম সব কিছু জানতে চেয়েছিলাম,—না শুনলে যেন শান্তি পাওয়া যায় না। তিনি সবটাই বলেছিলেন। আসলে স্থান বা আসন ছেড়ে কোথাও যেতে হয় না, সিদ্ধমন্ত্রের গুণের ঐ সকল প্রাকৃত দৃশ্য এমনভাবে সাধকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় আর এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, মনের চক্ষে ঠিক যেন আমি ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতেই ঐ ভূমি দিয়েই চলছি। বিপদ, প্রকৃতির বিপর্য্যয় যা কিছু ভয়ানক বিপদাপদ সবই চিত্তক্ষেত্রেই ঘটে, সাধক আসনে বসে সাধনায় ডুবে ঐ সকল উপসর্গ ভোগ করতে করতে যান।

এটা কি করে ঘটে? সেইটাই আশ্চর্য্য, ভাবচি।

তুমি স্বপ্ন দেখ যখন, তখন যা-কিছু প্রাকৃত বিষয় দৃশ্য প্রভৃতি ভোগই ইন্দ্রিয় সাহায্যে অনুভব করো, তখন কি ঐসব স্থানে সত্যসত্যই যাও?

বুঝিলাম—আর কিছু বলিলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন, তখনকার দিনে, যখন তন্ত্র বৌদ্ধ কাপালিকদের অধিকারে শক্তিলাভের একমাত্র উপায় বলে প্রচারিত হয়েছিল—তখন ঐ মন্ত্রশক্তির অধিকারে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা নিয়ে পরবর্ত্তীকালে অনেক তন্ত্রসিদ্ধ কৌল তাঁদেরই একদল শিষ্য-সেবকদের ভিতর দিয়ে গার্হস্থ্য আশ্রমের মধ্যে ঢুকিয়েছেন, তবে কালে কালে ঐ সকল ক্রিয়া বা সাধনশক্তি ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এসেচে। যাক এখন,—আমার গুরু যা কিছু প্রয়োজন ঐ বুড়ীর সাহায্যে সংগ্রহ করে এক পর্ব্বতগুহায় আসন করলেন। ঐ আসামেরই প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ডের কাছেই সেই সময়ে সিদ্ধ কৌল একজন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাছে কোন রকমে তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ বা তার প্রভাব তাঁর উপর আসে, সেই জন্য ভিন্ন স্থানেই তাঁর সাধনের ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হল। বুড়ী হোলো তার গুরু। নারীসাহায্যে কিছু করবেন না তাই ঐ বুড়ী তাঁকে ভুলিয়ে নিজ প্রভাবে এখন যথারীতি সব কিছু করিয়ে নিয়েছিলো। এ ভাবের উত্তর-সাধিকা পিছনে না থাকলে নিজ শক্তিতে সম্পূর্ণ সিদ্ধি অসম্ভব।

যে দিন আরম্ভ করবেন, তার পূর্ব্ব রাত্রে বুড়ী এসে তাঁকে জানিয়ে দিলে যে প্রভাত-সূর্য্য উদয়ের অনেকটা আগেই আসনে বসে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে আর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ারম্ভ হবে। তারপর মন্ত্র সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিলেন, আসলে কি করে এক-জনকে সাধনচ্যুত করে ঐ বীজমন্ত্র,—যার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হবে তারই অপব্যবহারের ফলে। কোন রকমে লক্ষ্যচ্যুত হলেই বিপদ। তাঁকে ভাল করে পুনঃ পুনঃ ঐ কথাই বুঝিয়ে দিলেন যে, যা-কিছু বিপদাপদ সামনে আসুক না কেন আসলে সে-সবের আবির্ভাব সাধনভ্রষ্ট করতে, কাজেই তোমার মন ঐ মন্ত্র থেকে কখনও যেন না সরে, ক্ষণকালের জন্যও লক্ষ্যচ্যুত না হয়। প্রথমবারে উচ্চারণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়বার আরম্ভ, ঐ একটির শেষ ও অপর একটির আরম্ভ, ঐ সন্ধিতে লক্ষ্য থাকলে কখনই ভ্রষ্ট হবার কারণ থাকবে না, ঐটিই মন্ত্রের মর্ম্মস্থান। এইভাবে এমন করে তাঁকে প্রস্তুত করে দিলে যাতে তার কোন বিঘ্ন না আসতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে ভয়ের বিষয়—সে সকল অবস্থায় তাঁকে নানাপ্রকারে সতর্ক করে দিলে। দেখো, তোমার ঐ সাধনের মাঝখানে আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর আর আমারও সঙ্গে দেখা হবে না। যদি সিদ্ধিলাভ করতে পারো, সেই সিদ্ধির ক্ষেত্রেই দেখা হবে,—সেই শেষ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে। কাজেই এখন বেশ করে বুঝে নাও সব।

এখন এই ডাকিনীর কথায় সাধারণের মধ্যে অনেক ধোঁকার সৃষ্টি হয়েছে, যেন একটা

দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই হয়ে আছে ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি নাম। আসলে বৈষ্ণবতন্ত্রের মধ্যে যেমন রাধার অষ্টসখী আছে, ঠিক তার অপর পিঠে আদ্যাশক্তিরও সহচরী আছে, তাব মধ্যে ডাকিনী প্রধানা, বৈষ্ণবতন্ত্রে যেমন রাধার প্রধানা ললিতা। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে চিরদিনই এই ভাবের একটা পবস্পর প্রতিযোগিতা অনুসারী নীতি অথবা প্রতিপক্ষ ভাবের সৃষ্টি বরাবরই চলে আসচে। পুরুষ ভগবানের বাণী যেমন শ্রীমৎভগবদ্গীতা, তেমনি প্রকৃতিবাদে আদ্যাশক্তির শ্রীশ্রীচণ্ডী উৎপন্ন হোলো। এইভাবে একই দেশে পিঠাপিঠি দুই ভাবের ব্যাখ্যা থাকায় এই রকমটা ঘটে আসচে। এই যে ভেদ, পুরুষ ভগবান আর নারী ভগবতী, সাকার উপাসনার এইখানেই গলদ! কিন্তু উপায় নেই। ঘোর তামসিক মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত যাদের ভগবৎ সংস্কার তাদের কি করে বুঝাবে যে ভগবান ও ভগবতী দুইই প্রকৃতি পর্য্যায়ের বস্তু। যাই হোক এখন আমাদের ঐ ডাকিনী সিদ্ধির আদি মধ্য ও অন্তে,—সিদ্ধির স্বরূপটি বলা হলেই বুঝা যাবে এক সময়ে একশ্রেণীব শক্তি-উপাসক ঐপ্রকাব সিদ্ধিব কতটা অনুবক্ত হয়েছিল এবং তার ফলে কি পেয়েছিল। একাসনে বসে তিনটি দিন-রাত্রের মধ্যে বাহ্যপ্রকৃতির যা কিছু পেবিয়ে গুহ্য প্রকৃতিব মধ্যে যাওয়া চাই, তবেই না ঐ রাজ্যের খবর পাওয়া যাবে।

মোটামুটি এ পৃথিবীতে মহান প্রকৃতির বাহ্য স্থূল বাজ্যে আছে মরু, অরণ্য আর আকাশ ও জল। দেহধারী জীব এই তিনটি ক্ষেত্রেই বিচবণ করেন। কিন্তু যে লোক মরুরাজ্যে বাস করে অরণ্যের অভিজ্ঞতা তার নেই, অরণ্যবাসীর মরুভূমির জ্ঞান নেই, আবার যারা সাধারণতঃ দেশমধ্যে বাস করে তাদের মধ্যে সমুদ্রের জলরাশির অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই এই প্রকৃতির স্থূল বৈশিষ্ট্য যা-কিছু ধরণীর কোলে এসে জীবের আংশিক পরিচয় মাত্র হয়, কিন্তু তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় প্রয়োজন একজন সাধকের শক্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে। সেই কারণেই খণ্ড বুদ্ধি ও মনাদি নিয়ে আদ্যাশক্তির স্থূল পরিচয়ের সীমারেখা অতিক্রম করা,—তবেই ডাকিনীরাজ্যে অর্থাৎ মহাবিদ্যার রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটবে। অবশ্য এটা যেমন বাহ্যপ্রকৃতি নিয়ে, জীবাত্মার স্থূল দেহের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ,—তারপর তেমনি স্থূল থেকে সূক্ষ্ম গতিও ঐ সম্পর্ক ধরে বুঝতে হবে। মোট কথা এই প্রকৃতির পূর্ণ স্থূল রূপটির প্রভাব সহ্য করে তবেই সিদ্ধি।

যাবার আগে বুড়ী তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রাথমিক ক্রিয়াগুলির সম্বন্ধ শেষ বলে দিলেন, মনে আছে তো, এক আসনে বসে আহার-নিদ্রা, তার সঙ্গে সর্ব্ববিধ শরীর-কর্ম্ম থাকবে না, কোন কারণে আসন ত্যাগ না করে ঐ কাজ। সংযমের বলে আগেই দেহ বাঁধতে হবে, প্রাণকে মন্ত্রসাহায্যে কেন্দ্রস্থ করা দ্বিতীয় কাজ, তারপর তন্ময়তার সঙ্গে সঙ্গে সাধক যা যা অনুভব করতে থাকবেন, সে সব আর আর যা-কিছু নির্দ্দেশ দিলেন সেই রাত্রে। শেষে বললেন, আবার কাল ভোরে আসবো, দেখবো কেমন মরদ তুমি। দেখ, যথাস্থানে গিয়ে

আসনে বসবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই আমাব সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ, তারপর তুমি কে বা কোথা, আমিই বা কোথা। যাও আজ তোমার ছুটি,—বলে বুড়ী চলে গেল।

পরদিন যথাকালে ভোরেই বুড়ী ঠিক এসেছে—এখন তাঁকে যেখানে নিয়ে গেল, ছোট একটি পাহাড়ের ধারে, সেখান থেকে একটা সরোবরের খানিকটা দেখা যায়; সেই পবিত্র হ্রদের নীল জল খানিকটা যেন আঁচল বিছানো প্রকৃতি-মায়েব,—দৃশ্য মনোরম। বুড়ী আগে, পিছনে পুরন্দর যন্ত্রচালিতেব মতই চলছেন। খানিকটা উঠেই একদিকে ঘুরে প্রায় অন্ধকার এক গলিপথে এসে পৌছাতে দেখা গেল, এই নির্জ্জন স্থানে অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটি উজ্জ্বল চক্ষু তাঁদের দিকেই চেয়ে আছে। বুড়ী তাই দেখে হা-হা, হা-হা অদ্ভুত হাসি আরম্ভ করে দিলে। পুরন্দরের ভয় ছিল না, তিনি নিঃসঙ্কোচেই চলতে লাগলেন বুড়ীর পিছনে পিছনে।

বন্ধুভাবে বুড়ী পুরন্দরেব গলা জড়িয়ে বলতে লাগলো, আগে এখানে ডাকাতদের বড় আড্ডা ছিল, সমস্ত পাহাড়টা জুড়ে তারা থাকতো। এইখানে এখনও কোন গুহায় তাদের বিস্তর ধনরত্ন লুকানো আছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে বজ্রনাদি সিদ্ধবাবা এখানে এসে ডাকাতদের দলকে দল দীক্ষিত করে ফেলেছিলেন,—তারা যোগী হয়ে নানাদিকে চলে গেল, অতদিনের সঞ্চিত অতটা ধনদৌলত ফেলে। সিদ্ধগুরু বললেন, যেখানে যা আছে সব থাক কেউ ছোঁবে না। সেই অবধি এই পাহাড়টা এইরকম পড়ে আছে;—কখন কখন পথিক বা পর্য্যটকেরা এসে থাকে, আবার কোন গুহার মধ্যে আসন করে কেউ বা বসে গেল। এখন এইখানেই তোমার আসন হয়েছে, বুঝলে?

পুরন্দর তা আগেই বুঝেছিলেন, আরও কিছু বুঝেছিলেন,—সে কথা এখন থাক।

কথা কইতে কইতে তাঁরা সেই ছোট গুহামুখে এসে দাঁড়ালেন। অন্ধকারটা এখানে ততটা ছিল না, দেখা গেল প্রায় চার হাত গোলগাল গুহাটি, মধ্যে তার একটি এক হাত উঁচু বেদী, তার উপর তৈরী আসন; একখানা প্রশস্ত বাঘছাল পাতা—তার চারদিক ঝুলচে, লেজটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। গুহার প্রবেশদ্বার প্রায় দু'হাত চতুষ্কোণ একখানা পাথরে ঢাকা থাকে, সেখানা পাশেই রাখা আছে। আসনের সুমুখে একটু খুলখুলির মত, তার মধ্যে একটি পানপাত্র।

বুড়ী বললে,—এইখানেই হল তোমার সিদ্ধির আসন। পরে অর্থাৎ তোমার পরে এই আসনে একদিন তোমার প্রিয় মনোনীত হয়তো কেউ বসে যাবে, এখন তো তোমায় এনে বসিয়ে দিলাম। এইবার তোমায আরম্ভ করতে হবে—আমি চলে যাবো পাথরখানা দরজায় চাপা দিয়ে; কেউ খুলবে না সে পাথর, খুলতে পারবে না,—ঠিক সময়ে আমিই এসে খুলে দেব।

এখন শোনো, শেষ একটা কথা বলে দি যেটা কাল বলিনি। মন্ত্রের গুণে, আসনে

বসে জপে ডুবে যাবার পরেই তোমার নানারকমের অবস্থা হবে, এমন কি ভিতর-বার, উপর-নীচে, সামনে-পিছন সব দিক স্বচ্ছ হয়ে যাবে—ঘব-বার আকাশ-পাতাল এক হয়ে যাবে। কত কত অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শন হবে—ভয় দেখিয়ে তোমার জপ বন্ধ করবাব চেষ্টা করবে সেইই, যাকে তুমি পেতে চলেছো। পরে আপনিই বুঝবে, সে-সব কিছু নয়। আসলে যতক্ষণ না তোমাব ডাকিনীব সঙ্গে মিলন হয়, ততক্ষণ ঐরকম অনেক কিছুই হবে, —সেইটি তোমায় বিশেষ করে জানিয়ে দিলাম। সাবধান, মধ্যপথে ক্ষণেকের জন্যও যেন তোমার মন্ত্রচ্যুতি না ঘটে। মন্ত্রের সঙ্গেই ডাকিনীকে পাবে। কিন্তু যতক্ষণ না তুমি শেষ পর্যন্ত তার অধিকারে পৌছে তার সঙ্গে এক হয়ে তাকে অধিকার করতে পারবে, ততক্ষণ সে তোমার শত্রু হয়েই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে সারাপথ। ঐ মন্ত্রই তোমার একমাত্র বন্ধু জানবে,—একমাত্র অবলম্বন। মধ্যপথে যদি কোনরকমে তোমাব ক্ষণেকের জন্যও চাঞ্চল্য আসে, ডাকিনী মহাশত্রুতা করবেই, এমন কি তোমায় ধ্বংস করে ফেলবে,—তার রাজ্যে তার অধিকারে তোমায় যেতে দেবে না, কারণ সেখানে প্রবেশমাত্রই তাকে তোমাব অধীন হতে হবে। একথা যেন কোনক্রমেই ভুলো না,—তুমি পুরুষ, তুমি পুরুষ, তুমি পুরুষ। তিনবার এই কথা বলে সে পুরন্দরের মুখপানে চেয়ে রইলো।

যে উদ্দেশ্যে বুড়ী পুরন্দরকে এই কথাগুলি এত জোর দিয়ে বললে, সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার মুখ দেখেই বুঝলো। সেটা বিশেষ আর কিছুই নয়, সাধকের মনে আত্মশক্তিতে প্রবল আস্থা, যে শক্তির কাছে আর যা-কিছু সবই তুচ্ছ বোধ হবে সেটা আছে কিনা তার মুখে—তাই দেখা। সিদ্ধি করায়ত্ত ভেবে আনন্দে যেন মধ্যপথে কোন দুর্ব্বলতা না আসে, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সাধকের চিত্তে দৃঢ় এবং অদম্য শক্তির ধারা বর্ত্তমান থাকে, তাই গোড়ায় এতটা সাবধানতা।

অবলীলাক্রমে সেই দু'হাত সমচতুষ্কোণ যন্ত্র আঁকা পাথরখানা গুহাদ্বারে সরিয়ে একেবারে বন্ধ করে রহস্যময়ী অজ্ঞাত বন্ধু-উপদেষ্টা দৃষ্টিপথের বাইরে যেতেই, গুহার মধ্যে একেবারেই গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেল। পুরন্দরও আপন আসনে বসলেন দৃঢ় হয়ে।

এইভাবে কতক্ষণ পর যখন সাধকের শরীর স্থির, সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্যরহিত হয়ে গিয়েছে —মন্ত্রবীজ এক দুই তিন চার এইভাবে বার বার মানস উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দোময় হয়ে উঠেচে, প্রাণময় সেই সিদ্ধ বীজমন্ত্র সাধকের নিজ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যেন নৃত্যশীল হয়ে উঠেছে কোন এক অনন্তের সন্ধানে, পুলকে অন্তরক্ষেত্র পূর্ণ করে ক্রমে আলোর প্রথম আভাস পৌছালো সাধকের চারদিকে। তারপর গুহা নাই, বদ্ধ আবেষ্টনী, অন্ধকার, বদ্ধ বায়ু উৎকট গন্ধপূর্ণ অভ্যন্তরে সে সুরঙ্গপথ নাই, উপরে মুক্ত নীলাকাশ, মুক্ত সমীরণ, চারিদিকে, দূর বহুদূরবিস্তৃত ভূমি, সে যেন এক অপূর্ব্ব শূন্যের রাজ্য। এমন অবস্থায় হা-হা, হা-হা সেই হাসি। সেই রহস্যময়ী বৃদ্ধার মূর্ত্তি, শুধু মুখখানি কুটিল আর

তেজপূর্ণ চক্ষুতে হৃদয়ভেদকারী সেই দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে এক শব্দ কানে এলো,—যাও বাছা যাও, আপন দেশে,—পথ মনে আছে তো? মায়াবিনীর সেই অট্টহাসি, আবার সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই তার অন্তর্দ্ধান। সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা, এই প্রথম অবস্থার পরিবর্তন, আসনে বসবাব পর জপের এই প্রথম ফলটি কেমন পেয়েচ তাই একবার দেখে আর একবার দেখা দিয়েও গেলাম, আবাব একবার হয়ত আসতে হবে।

আরও একবাব সত্যসত্যই আসতে হয়েছিল,—সেই কথাটা বলে নিই। এরপর পুরন্দব দেখলেন তাঁর মন্ত্র তাঁকে নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু ক্রমে এর সঙ্গে একটা বেগ অনুভব হচ্চে, আর তা এমন ভাবেই হচ্চে যে সময় সময় এই সন্দেহ তাঁর মনে আসচে যেন সেই বেগ কোনো অজানা অবস্থায় নিয়ে ফেলবে যাতে সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন?

এই সন্দেহ যেমন হওয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই অট্টহাসি, আবাব তার আবির্ভাব। যদি এতই সন্দেহ, তবে এ পথে কেন এসেছিলে বাছা? আমাকেই বা এত খুঁজে খুঁজে ছট্‌ফট করে বেড়ালে কেন? আমি কি তোমায় বলিনি যে, চব্বিশ বছরের অটুট ব্রহ্মচর্য্য যার নেই, তার এপথে আসবার যো নেই! তোমার যখন তা আছে, তখন তোমার মত একজনের দ্বারাই এ কাজ হবে। তখন বিশ্বাস করলে, এখন আবার সেকথা ভুলে আগড়ম্‌-বাগড়ম্‌ নানারকম সন্দেহ মনে আনচো কেন বাছা? আব আমি আসবো না, দেখ সুমুখে চেয়ে,—চলো আপনার পথে।

পুরন্দর অন্তরে আনন্দের পুলক অনুভব করলেন, সুমুখে চেয়ে দেখলেন জগৎপ্রাণ সবিতা স্বর্ণসিন্দুর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠচেন। দিকচক্রবালে সবেমাত্র তার প্রথম প্রকাশ হয়েচে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পুরন্দরের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হয়ে উঠলো, তিনি সুমুখে দক্ষিণ পা বাড়ালেন,—গতি এবং মন্ত্র একই ছন্দে চলতে আরম্ভ হল।

চলতে আরম্ভ করেই পুরন্দর দেখলেন যে পথের কোনো নিশানাই নাই, বিস্তীর্ণ মহামরুর মত অনন্ত, রুক্ষ, কঠিন পথ সুমুখে পড়ে আছে। প্রথম দিনে ক্রমে ক্রমে গোড়া থেকেই অসহ্য গরম বোধ, সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বক্ষণই যেন ঘামে ভিজে আছে। সে সকল লক্ষ্য করবাব মনোভাব তাঁর ছিল না। মন্ত্রের ছন্দে যথাস্থানে চলেছেন পুরন্দর। এক-একবার তাঁর দেহে জ্ঞান আসছিল আবার চলে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন দেহ নেই,—দেহের ভার থাকার সম্ভাবনাই নাই, শুধু যেন মন্ত্রময় হয়েই তিনি ভেসে চলেছেন শূন্যে। এইভাবে যেতে যেতে নানাপ্রকার অনুভূতি, পার্থিব-অপার্থিব বিচিত্র অনুভূতি তাঁকে অপূর্ব্ব ভাবে ভাবিত করে নিয়ে চলেছিল। সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করে মার্তণ্ডদেব অস্তাচলে নামলেন, তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা পড়ে গেল। তখন আরম্ভ হল শীতের কম্প। যখনই যেটা আসছে সেটাই অসহ্য, যেন এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কিন্তু মন্ত্রের শক্তির

সঙ্গে পুরন্দরের যথার্থ পরিচয় হয়েছে। তা ছাড়া আগে তার পাশমুক্তির সাধনা করাই ছিল, যখনই যে আঘাত বিষম হয়ে এসেছে, মন্ত্রের উপর মনসংযমের গুণে তা লঘু হয়ে একেবারে অন্তর্ধান করেছে। মন্ত্রের এই শক্তি প্রত্যক্ষ করলেও সঙ্গে সঙ্গে এর সিদ্ধি তাঁর সহজ মনে হল না। সারারাতও এইভাবে অবিশ্রান্ত পথ চলে প্রভাতে দিঙমণ্ডল ঘোর ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এলো,—তারপর উঠলো ঝড়।

ঝড়ের মাঝে পুরন্দর প্রকৃতির আর এক মূর্ত্তি দেখতে পেলেন, যা তিনি পূর্ব্বে কখনো দেখেননি। বাতাসের শব্দ আর গতি মূর্ত্ত হয়ে উঠলো, আর ঐ যে তার সুমুখে পাহাড়ের দৃশ্যও যেন তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল, ভয়ের ছায়া আর বিস্ময় যুগপৎ ক্রিয়া করতে লাগলো মনে, কিন্তু মন্ত্রের কৃপায় তাঁর অল্পক্ষণেই সকল রহস্য ভেদ হয়ে গেল,—শেষ দিকটায় দেখা গেল যেন একটি ভয়ঙ্কর অমানুষী মূর্ত্তি তাঁর সম্মুখে প্রকাশ হয়ে যেন তার পরিচয়টা দিয়ে একটু মুচকি হেসে মিলিয়ে গেল।

মনের ধর্ম্ম ভয়, এতটা দেখেও যেন যেতে চায় না,—যেই মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষ হোলো, ভয় রইল না। কিন্তু এভাবে যতবার যত কিছু হল, তিনি বুঝলেন শেষ অবধি ভয় থেকে একেবারে মুক্তি পাওয়া যায়নি। অন্তরের মধ্যে কিছুটা যেন অবশিষ্ট ছিল। এইবার তা যাবার সময়।

এই সময় তিনি এক বিশালকায়া নদীর সুমুখে উপস্থিত হলেন। কিভাবে পার হওয়া যাবে এ প্রশ্ন মনে উঠবার পূর্ব্বেই দেখা গেল একটা বিশালমূর্ত্তি চমরী যেন হেঁটেই পার হয়ে যাচ্ছে। বুঝলেন হেঁটেই এটা পার হওয়া যাবে। ধীরে ধীরে তিনি নামলেন,—সাবধানে চলতে লাগলেন। গোড়ালি থেকে হাঁটু, তারপর ক্রমে কোমর, শেষে বুক পর্য্যন্ত যখন পৌছালো তখন তরঙ্গ উঠতে শুরু হোলো। ভীষণ তরঙ্গের পর তরঙ্গ। পাহাড়ের মত ঢেউ মাথায় ফেনাসুদ্ধ, নদীকে যেন তোলপাড় করতে আরম্ভ করে দিলে। চারিদিকেই পেঁজা তুলার গাদার পর গাদা যেন ভেসে আসছে অথচ একটুও ঝড় বা বাতাস নেই। বুক দুরু-দুরু করছে। মন্ত্র কিন্তু এতটা ভয়ের ক্রিয়ার মধ্যেও ঠিক চলছে, বোধ হোলো মনটা যেন মন্ত্রের ভিতর দিয়েই প্রকৃতির এই ভয়ানক চেহারাটা দেখছে। ওটা কি? প্রকাণ্ড একটা ভয়ঙ্কর জন্তুর মাথা, হাঁ করে খেতে আসছে,—সাঁতারজলে এই ভয়ানক ব্যাপার দেখে তিনি মন্ত্রে ডুব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন, একেবারে নদীপারে একটা জঙ্গলের ধারে এসে পৌছে গেছেন। এখন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন,—নানা আকারের ধারালো পাথরের কোণ আর কাঁটা ঘাসের উপর দিয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছে। বাধা যে কত রকমের হতে পারে ভেবে মনে মনে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সুমুখে ঘোড়ার মত লম্বা মুখ, দুই পাশ দিয়ে দুটো দাঁত এসেছে, শরীরটা বিরাট মূর্ত্তি, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের হল্কা,—মন্ত্রের গুণে প্রথম অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর সারা বনভূমি কাঁপাতে কাঁপাতে সে

মূর্ত্তিও গেল মিলিয়ে। বন গেল, শব্দও গেল—তারপর এলো বিস্তৃত প্রান্তর একটা, তার দূরে দূরে পর্ব্বতমালা, একেবারেই মনোহর দৃশ্য। এ দৃশ্য কিন্তু উপভোগের আর সুযোগ হল না, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের আওয়াজ, গুড়গুড় শব্দ পাতাল থেকে আসছে, তার সঙ্গে আরম্ভ হল ঝড় আর তুষারপাত। তার পরেই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন তুষারপাত হতে লাগলো বুঝিবা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পুরন্দরের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো, ঠাণ্ডায় শরীর অবশ হয়ে এলো,—কিন্তু মন্ত্র তার ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে চলছিল। কি অদ্ভুত ব্যাপার, শীতে মন্ত্রও যেন জমে যাবার মত হয়ে আসচে; ক্রমে ঘোর অন্ধকার হয়ে এলো। সেই অন্ধকারে ফুটে উঠলো এক মূর্ত্তি, সে মূর্ত্তির মধ্যে অন্ধকার মোটেই নাই, ক্রমে ফুটে উঠলো তার রূপ, উজ্জ্বল লাবণ্য,—অন্ধকারের মধ্যেও অতীব স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। মনোহর রূপ যাকে বলে, সঙ্গে সঙ্গে তার পানে টানে যে। এ যে মোহের আকর্ষণ। চতুর পুরন্দর তখনি বুঝতে পারলেন এ তপভ্রষ্ট করবার রূপ, ইষ্ট থেকে বিপথে নিয়ে যাবার রূপ। মনের একাগ্রতা তার তীক্ষ্ণ হতেই সে মূর্ত্তি মধুর হাসি নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সাধকের হাত ধরবার জন্যে যেমন তার হাতটি বাড়ালে, পুরন্দর একবার মাত্র মনের মধ্যে সেই বুড়ীকে স্মরণ করে নিয়ে মন্ত্রের মধ্যে ডুব দিলেন।

প্রভাতের আলো দিকচক্রবালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, পুরন্দর চক্ষু চেয়ে দেখলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবাহু তাঁর স্পন্দিত হয়ে উঠলো—চলতে লাগলেন, পথে ক্রমে সূর্য্যোদয় দেখতে পেলেন, আকাশ পরিষ্কার, চারিদিকে যেন একটা উজ্জ্বল ধাতুর ছড়াছড়ি। এদেশে যেন মাটি নেই, সবই কোন ধাতুর। আশ্চর্য্য ভূমি, এখানে ছোট ছোট পাতা নানা বর্ণের গাছ সবই কিন্তু ধাতুময়, উজ্জ্বল, এমন দৃশ্য জীবনে তিনি দেখেন নি,—কল্পনায় আসে না। ক্রমে বেলা বাড়ছে, তিনি চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করছেন ভূমিও তপ্ত হয়ে উঠচে। প্রখর সূর্য্যকিরণে ধাতুময় দেশ আরও যেন উজ্জ্বল আর তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। চারিদিকেই অঙ্গার সিন্দুর অথবা রক্তবর্ণ, যেন আগুনের ছড়াছড়ি, কিন্তু তার মধ্যে নানা রংয়ের আভা আর তাপ, সে তাপ ক্রমে অসহ্য হয়ে আসছে। পুরন্দর যতই মন্ত্রকে আঁকড়াতে যান, তার সে আয়াসও সত্য বৃথা হয়ে যায়। আরও কত আছে এভাবের দৈব-দুর্বিপাক? হঠাৎ এ কথাটি যেমন মনে হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন। দেখলেন, অল্পদূরেই একটা ছোট পাহাড়ের উপর যেন ধাতুময় প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ চক্ষের সুমুখে ভেসে উঠলো, তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল অভীষ্ট স্থলে এসে পড়েছেন,—সঙ্গে সঙ্গে আবার দক্ষিণ বাহুর পুনঃস্পন্দন। তিনি গভীর ভাবে আবার মন্ত্রের মধ্যে ডুব দিলেন।

যন্ত্রের মত চালিত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এসে পড়লেন পাহাড়ের সেই প্রাসাদের ঠিক নিচেই। ঐ পর্বতের পাদমূলে এক ছোট ধারা, কিন্তু স্রোত তার অতীব তীব্র। সেই খরস্রোতার তীরে এসে নামবেন কিনা ভাবছেন,—সুমুখেই দেখেন ছোট্ট একখানা

চৌকির মত, বিনা বাধায় ধীরে ধীরে ভেসে আসছে তাঁরই দিকে। তাঁর কাছে এসে পড়তেই নিঃসঙ্কোচে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন তার উপর, সেটা অল্পক্ষণেই ঐ তীব্র স্রোত কাটিয়ে তাঁকে পরপারে পৌঁছে দিলে। এপারে নেমে তিনি পাহাড়ে উঠতে শুরু করে দিলেন।

এখন থেকে তাঁর মনের অবস্থার একটা বিষম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন। ভয় যেন তাঁর অন্তর থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেছে, শক্তির ভাণ্ডার তাঁর মধ্যে পূর্ণ; সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধির নিশ্চিত আশা প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনি অনুভব করচেন তাঁর সকল শ্রমের অবসান হয়ে এসেচে। কিন্তু তা বলে এখনও সম্পূর্ণ আনন্দ উপলব্ধির কাল আসে নি। সংযম তাঁর সর্ব্বাবস্থার সাথী। তা সত্ত্বেও যেন একটা কেমন অস্বস্তি ভাব,—যা বলা যায় না মুখের কথায়।

ঠিক যখন সূর্য্যদেব মাথার উপর তখন তপ্তশরীরে পুরন্দর সেই ধাতুমান পার্ব্বত্য দুর্গের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছালেন। সেখানকার বায়ুমণ্ডলও যেন তপ্ত, তামা, পিতল, লোহা, সিসা ও অভ্রের পাথরগুলি বেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে। এই ধাতুময় তোরণের যতটা শোভা ততটাই তাপ, যেন তার কারুকার্য্য স্থির হয়ে যাতে কেউ উপভোগ করতে না পারে তারই জন্য এই তাপের সৃষ্টি। স্তম্ভগুলি এতই নিপুণ হাতের কারু-কৌশলের পরিচয় দিচ্ছে যা দেবশিল্পী সেই বিশ্বকর্ম্মা ছাড়া আর কারো দ্বারা নির্ম্মাণ সম্ভব মনে হয় না। সেই অপূর্ব্ব তোরণের দুই পাশের স্তম্ভ আর ঊর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রাকার খিলান এই সবটাই যেন একখণ্ড ধাতুর, কোথাও জোড়া বা আঁটার চিহ্নমাত্র নেই। তোরণের পরে কতকটা অঙ্গনের মত, তার পরেই সিংহদ্বার, সেখানে দু'দিকে দুজন ভীষণদর্শন দ্বারপাল পাথরের গড়া মূর্ত্তির মত স্থির, —হাতে তাদের শূলদণ্ড। তাদের রক্তবর্ণ চক্ষু, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ বড ভয়ঙ্কর। চুলগুলি যেন তামার তার দিয়ে তৈরী, উজ্জ্বল, ঝকঝক করচে। পোষাক তাদের অদ্ভুত রকমের। কটিবন্ধের সঙ্গে নানা অলঙ্কার বেড়া, মোটা কাপড, তাও যেন তামার,—হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলচে। কণ্ঠে, বুকে ও কোমরে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, কানেও বড় বড সোনার কুণ্ডল; মাথায় পটি, তাও মনে হয় তামার। বাহুতে কবচ, চওড়া যতটা মোটাও ততটা, পেশীর উপর চেপে বসেচে যেন আর খোলা যাবে না। তাদের শরীরের তাপ যেন পুরন্দরের গায়ে এসে লাগছিল। মুখে তাদের একরকম গম্ভীর হাসি যাতে সাধারণ মানুষের ভয়ের উদ্রেক করে। সব মিলিয়ে একটা দুঃসহ তেজ যা মানুষের সহ্য করবার শক্তি নেই।

দ্বারপথে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরের মধ্যে একটা অসহ্য জ্বালা আরম্ভ হল; এটা বাইরের তাপ নয়, ভিতরের জ্বালা, আগে এমন অনুভব করেন নি। হৃদয়কে কেন্দ্র করেই এ জ্বালার বিস্তার, মধ্য-শরীরের সবখানেই। এ জ্বালায় মন্ত্র পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয়ে অতর্কে

ডুবিয়ে দেয় বুঝি। ক্রমে মন্ত্রস্থানে একটা মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করলেন। যে বস্তু তাঁর একমাত্র অবলম্বন সেথায় যে এমন বিপ্লব ঘটতে পাবে এটি কেমন করে জানবেন? শেষদিকে সব কিছুই দুঃসহ। এখন যেইমাত্র তিনি বুঝলেন যে, এই অবস্থার ঠিক আগেই যে নিশ্চিন্ত সিদ্ধির আশায় একটু আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলেন এটা তারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া, তখনই তার শেষ।

সে বিপ্লব শান্ত হয়ে গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে একাগ্র হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন মনের অগোচরেই তিনি ঐ বিশাল পুরীর বহির্দেশ পেরিয়ে অন্তঃপুর সংলগ্ন অঙ্গনে এসে পড়েছেন। এই ভাবের অবস্থান্তর, প্রথম থেকে এ পর্য্যন্ত মর্ম্মস্থানে যাতনা, মন্ত্রভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা,—এ সকল একটির পর একটি করে সেই বুড়া তাকে আগেই বলেছিল যে। পুরীর মধ্যে প্রবেশ করে অন্তঃপুরের অঙ্গন পর্য্যন্ত এই সব ভাব তার মধ্যে আসবে যাবে। তারপর কিন্তু ঐ অঙ্গন উত্তীর্ণ হয়ে যা যা ঘটবে, তার যে কোথায় গতি হবে, কিম্বা আবার কোন ভাবের সম্ভাবনার কথা,—কিছুই বলে নি। কেবল এই কথাটি বলেছিল, অঙ্গনের পরের কথা আর আমার বলবার নয়,—সম্পূর্ণ তোমার নিজের সাহায্যেই তা শেষ পর্য্যন্ত করে নিতে হবে, সেখানে আর কারো সাহায্য খাটবে না। এ কথা যখন তাঁর মনে হোলো তখন আবার নিজেকে সবল বোধ করলেন। এইভাবে চলতে রইলেন।

এই যে এতটা কাল ক্রমাগত চলা হয়েচে, এর মধ্যে একটার পর একটা যে সকল ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বিপর্য্যয়, তার মধ্যে যে সকল ভাবের পরিচয় ঘটলো, এর মধ্যে এখন অনেক কিছুই তিনি পেয়েছেন, এর উদ্দেশ্য বুঝেছেন, এর সার্থকতাও উপলব্ধি করেছেন, কোন কোন অবস্থা এ পর্য্যন্ত কেন এসেছে তাও বুঝেছেন,—কিন্তু এখন আর সে-সকল কিছু কাজের হচ্ছে না কারণ সুমুখে যেটা, অন্তরের মধ্যে তার গতিনির্দ্দেশ নেই, কেবল-মাত্র মন্ত্রজপের ঘনীভূত অবস্থা আর তারই গতিতে ভেসে চলা, এ ছাড়া তার জ্ঞানে কিছুই নেই। অবসাদ কিন্তু কোন বাধাই মানে না, কেমন একটা অপরাজিত অবসাদ লেগে রইলো তাঁর গতির সঙ্গে। মাঝে মাঝে যেন নৈরাশ্যও আছে, এতটা এসে বুঝি এইখানেই পতন সম্বল করতে হয়,—কি হবে? যখন এই ভাবটা সহ্যের সীমা অতিক্রম করবার মত হল, মন্ত্র যেন যায়, আর নিজ শক্তিতে তাকে আঁকড়ে রাখা যায় না,—এই দুঃসহ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কানে অমৃত বর্ষণ করলে অসংখ্য যন্ত্রধ্বনি, তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে আসচে অন্তঃপুর থেকে, আর সুমুখের দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তোরণদ্বার পিছনে ফেলে তিনি পুরীমধ্যে প্রবেশ করেছেন, মন্ত্র তাঁর আপন ছন্দে সতেজে চলচে, গতি এখন অপ্রতিহত। এখন আবার যা ঘটতে চললো, তা অভাবনীয় অচিন্তনীয়।

ঠিক সুমুখে দেখা গেল একটি বিশাল প্রাঙ্গণ—তার তিনদিকে অসংখ্য গুহার মত;

কিন্তু ঠিক গুহা নয়, গুহাদ্বারগুলি এক রকম বিচিত্র রংয়ের কপাট দিয়ে বন্ধ করা আছে। মধ্যে প্রাঙ্গণের বুকের উপর দিয়ে পথ—সোজা গিয়ে আবার একটা প্রকাণ্ড তোরণের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেদিকে আর লক্ষ্য না করে পুরন্দর চললেন সেই পথ দিয়ে দরজার পানে। পথটা তপ্ত ধাতু দিয়েই যেন প্রস্তুত, পায়ের তলায় পুরন্দরের যেন ফোস্কা হয়ে যাবার যোগাড়, কিন্তু সেদিকে তাঁর তো লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য এখন গভীরভাবেই মন্ত্রের মধ্যে নিবদ্ধ। এখন থেকে পুরন্দর লক্ষ্য করছিলেন যে মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই এক অপূর্ব অনুভূতি শরীরের মধ্যে শুধু নয়, চিত্তক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই যেন আলোড়িত করছে। সে কি এক অচিন্তনীয় শক্তির অনুভব। এত শক্তি তিনি কখনো অনুভব করেন নি। পায়ের প্রত্যেক আঙ্গুলের নখাগ্র থেকে সমস্ত শরীরকে পূর্ণ করে মাথায় কেশাগ্র পর্য্যন্ত যেন স্পন্দিত হয়ে কি যে অনন্ত যৌবনময় শক্তির অনুভূতি এনে দিচ্ছে—কিছুতেই তার প্রকাশ সম্ভব নয়। ক্রমে তার যেন মনে হতে লাগলো তাঁর শরীরটি আয়তনেও বেড়ে যাচ্ছে—অন্তরের শক্তি প্রসারিত হয়ে শরীরকেও যেন ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে তুলচে। কি লঘু শরীর তাঁর! শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলছে কিনা সন্দেহ। পায়ের নিচে যে তাপ অনুভব করছিলেন, ক্রমশ তা আর বোধ হয় না—পায়ের তলা থেকে যেন সকল অনুভূতি ক্রমে চলনের গতির মধ্যেই আসতে লাগলো, এমন সময়ে তিনি সেই প্রবেশদ্বারে এসে পড়লেন—যেখান থেকে সারি সারি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—উলঙ্গ ডাকিনী—নারী, নানাবিধ প্রহরণ তাদের হাতে, দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। অন্য সময় হলে ভয় আসা অতি স্বাভাবিক, কিন্তু তখন পুরন্দরের এমনই ভাব, এমনই অবস্থা যে তাঁর মুখের দিকে চাইবামাত্র যেন কি এক অদ্ভুত বস্তুর পরশ পেয়ে তাদের ভয়ঙ্কর রুদ্র ভাব শিথিল হয়ে পড়তে লাগলো—আর তারা কোন বাধা দিতে পারলে না। যখন তিনি সেই সব ডাকিনীদের সমুখ দিয়ে চলতে লাগলেন, পিছন থেকে মনে হল যেন তারা মিলিয়ে যাচ্ছে—তাদের কোন অস্তিত্বই থাকছে না। এইভাবে চলতে চলতে পুরন্দর এক বিস্তৃত সোপানশ্রেণীর সমুখে এসে দাঁড়ালেন। সেই সিঁড়ির ধাপগুলি যেন বিচিত্র ধাতুর তৈরী—সে রকম ধাতু তিনি কখনও জীবনে দেখেন নি। এখানে তত তাপ ছিল না কিন্তু আর এক রকম ব্যাপার ছিল। তিনি প্রথম ধাপে উঠেই বুঝতে পারলেন, এক দুঃসহ ভাব শরীরে আঘাত করতে আরম্ভ করেছে যা কোন ভাষায় বলা যায় না। মন্ত্র তাঁর ক্রমেই জাগ্রত হয়ে উঠছে, তিনি যেন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর আভাস পাচ্চেন—যতই ঘন ঘন মন্ত্রের স্পন্দন মর্ম্মস্থানে অনুভব করচেন ততই বাইরের অনুভূতি যা তিনি প্রথম ধাপে পা দিয়েই অনুভব করেছিলেন সেই স্পন্দনের সঙ্গে এক হয়ে যেতো লাগলো—ক্রমে তিনি যেন বুঝতে পারলেন এই যে তাঁর শরীরগত অনুভূতি, সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাচ্চে,—কোনটাই আর যেন পৃথক নয়। এই যে স্থান—বাইরে থেকে যাকে সোপান বলে মনে হয়, সেটার সঙ্গে তাঁর

শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—সেই বিচিত্র অনুভবটাই তার প্রমাণ। এক দুই করে দ্বাদশটি ধাপ উঠে সুমুখে দেখেন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় যেন স্থানটি উদ্ভাসিত—কি স্নিগ্ধ ভাব সেখানে,—চারদিকে অমল শ্বেত, নীল, বেগুনী, লাল, জরদের ঘনীভূত এক-একটি মূর্ত্তি—তারা অন্য কোন রকম বাধা সৃষ্টি করছে না, কেবল যেন আকর্ষণ করছে তাদের দিকে। প্রত্যেক মূর্ত্তির এমনও ভাব, এমনই অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত তাদের শরীর, যেন দেবকন্যাই মনে হয়,—সে মূর্ত্তির বর্ণনা হয় না। মোহ মাখানো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—তার প্রত্যেক অঙ্গের ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টার মনকে আকর্ষণ করে, যেন তাদের অঙ্গের মধ্যে মিশিয়ে নিতে চায়। এ কি ভয়ঙ্কর টান! প্রত্যেকেরই স্পষ্ট এই ভাব, যেন তাকে ছেড়ে আর কোনদিকে লক্ষ্য না যায়। প্রত্যেকটি টানছে নিজের দিকে এমন ভাবে যে মরশরীর-ধারী কারো সাধ্য নেই সে টান কাটিয়ে অন্য অবস্থা কল্পনা করতে পারে। যেন তাদের অঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর পথ নেই।

চিরদিনের সংযত মন নিয়ে পুরন্দর মুহূর্ত্তকাল যেন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। মন্ত্র-গুণে তার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে গোলমাল হল না—বুঝলেন সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হয়ে এখন প্রলোভনের মধ্যে পড়েছেন। যেটা আগে ভয়ের ব্যাপার ছিল অর্থাৎ ভয়ের উদ্রেক করে অভীষ্ট লাভে বাধা সৃষ্টি করেছে, এখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেইটাই প্রলোভন সৃষ্টি করে অভীষ্টপথে বাধা জন্মাচ্চে। আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই সত্যটি যেমন তাঁর উপলব্ধি হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরূপ সুন্দরীগণ দুধারে সার দিয়ে মধ্যে পথ করে দিলে—ঠিক যেন বললে এই তোমার পথ, চলে যাও। আর কোনদিকে লক্ষ্য না করে পুরন্দরও সেই পথে পা বাড়ালেন। দেখলেন তিনি যেন ক্রমশঃ চাঁদের ঘনীভূত কিরণের মধ্যে গিয়ে পড়ছেন। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিরশ্মির কেন্দ্রের দিকেই চলেছেন। কি অপূর্ব্ব আনন্দময় অনুভূতিতে সর্ব্বশরীর পূর্ণ—পা ফেলছেন যেন শূন্যে! শরীর অতীব লঘু হয়েচে, বায়ুর মতই হালকা—আর যেন তিনি নিজের চেষ্টায় শরীরের আয়াসে চলছেন না, এক অব্যক্ত শক্তি তাঁর গতি নির্দ্দেশ করে তাঁকে চালাচ্চে। নিজেকে মহাশক্তিমান অনুভব করে পুরন্দর যেন বিহ্বল হয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সুমুখে দেখেন সর্বার্থসিদ্ধির মূর্ত্তি। এ কি এ কি—! সমুখে যেন বিশাল একটি চাঁদ-বিচ্ছুরিত রশ্মির কেন্দ্রে ঐ অমানুষী—অমৃতে গঠিত একটি দেবীমূর্ত্তি। কিবা রূপ, কি বিস্ময়কর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাবেশ, কল্পনার অতীত এই শরীর—যেন দূর থেকে সূক্ষ্ম আবরণে একটু তমোময়, কিন্তু তাঁর সেই অপার্থিব অমিয় মাখা তনুর কোথাও অলঙ্কারের কলঙ্ক নাই—নিষ্কলঙ্ক চাঁদই তার ঠিক ভাষা।

মন্ত্র কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও গতিহীন নয়,—জাগ্রত হবার সময় মন্ত্র যেন জাপকের সমস্ত চৈতন্য আত্মসাৎ করে এক বিশিষ্ট পৃথক অস্তিত্বময় হয়ে উঠে। পুরন্দর বুঝলেন প্রলোভন এখন ভাব বদল করে বিস্ময় হয়ে সেই বাধা সৃষ্টি করেছে—এইবার যত কিছু সঙ্কোচ

কাটাবার সময়। নিজ শক্তিতে পূর্ণ নির্ভরশীল পুরন্দর এবারে মন্ত্রকে শেষ উচ্চারণ করলেন—সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সিংহাসনের সম্মুখে। উলঙ্গ দেবী প্রসন্ন মুখ, পুরন্দরের নয়নে নয়ন মিলবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্র লুপ্ত হল। অনুভব করলেন মন্ত্রময় ঐ দেবীমূর্ত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবল আকর্ষণ। পুরন্দর প্রথমে আলিঙ্গনাবদ্ধ, পরে তাকে আত্মসাৎ করে ফেললেন।

এইখানেই অবধূত শেষ করিলেন তাঁর গুরুদেবের পূর্ব্ব অবস্থার ডাকিনীসিদ্ধির কথা।

একটি কথা আমার মনে মনে বড়ই পীড়িত করিতেছিল, অবধূত উহা বুঝিয়াছিলেন, তিনি ইঙ্গিত করিলেন, বলো। কাজেই আমি বলিলাম, আপনি গুরুদেবের মুখে যেমন শুনেছিলেন সেই রকমই তো বললেন, কিন্তু তাঁর সিদ্ধিলাভের পর কি অবস্থা হয়েছিল—

তিনি বলেন, ঐ প্রকার সিদ্ধির পর তাঁর রূপের একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল, পথে-ঘাটে, কারো ঘরে যেখানেই তিনি যেতেন, নরনারী ভিড় করে আসতো তাঁকে দেখতে। বিশেষতঃ নারী, পরমাসুন্দরী গৃহস্থ কুলবধূ—তারা এগিয়ে এসে নির্লজ্জ ভাবে তাঁর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকতো। সকল স্ত্রীর চরিত্র তার কাছে নখদর্পণের মত স্বচ্ছ হয়ে যেতো তাকে সামনে দেখবামাত্র। নারী-আকর্ষণই তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্ত্যক্ত করে-ছিল। তিনি অটুট-বীর্য্য ছিলেন, কিন্তু যেভাবে নারী-আকর্ষণ তাকে এতটা ব্যতিব্যস্ত করেছিল,—এমনই তার প্রতি ভালবাসা, দেখামাত্রই অনুরক্ত হওয়া আরম্ভ হয়েছিল, যাতে তাঁকে এই চিন্তায় দিবারাত্র বিব্রত করেছিল,—এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার পথ কি! যদি তিনি পার্থিবমনা, কামিনীকাঞ্চনের ভোগে আসক্ত হতেন, যদি একটু লালসা থাকতো, তাহলে ঐ দুইটি ভোগই আশাতীতভাবে পূর্ণ হোতো তাঁর জীবনে। চক্ষের তেজ, সম্মোহন শক্তি ও তার আকর্ষণ ক্রমশঃ এমনই একটা প্রবল শক্তি উৎপন্ন করেছিল, সেই জন্য অস্থির, যেখানেই যখন যান সেইখানেই নরনারী তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতো। বলেছিলেন আমায় শেষে স্থানত্যাগ করতে হয়েছিল ঐ কারণে, তা সত্ত্বেও এই ভয়ঙ্কর টানাটানি, তখন কত নারী নিঃসঙ্কোচে তাঁর কাছে তার দ্বারে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেচে। যে সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতো তার প্রভাবমুক্ত হবার কোন উপায় না পেয়ে তিনি পাগলের মত দিবারাত্র হাঁটতেন আর কোন গ্রাম বা শহর থেকে বাইরেই থাকতে চাইতেন। নায়িকা সম্বন্ধ ব্যতীত নারীর যেন অন্য অস্তিত্ব নেই এমনই তাঁর তখনকার দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছিল।

এক আশ্রয়ে গিয়ে পড়লে সেখানেও ঐ নারী-আকর্ষণ। কারো দৃষ্টিপথে তাঁর মূর্ত্তি পড়ামাত্রই তাঁর আনুগত্য, নির্লজ্জভাবে এসে সেবার প্রার্থনা। ঐ সময়ে তিনি দুই-একটি সতী নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের ব্যবহারের কথাও বলেছিলেন। যারা স্বভাবতঃ সতী, তারাও তাঁকে চাইতো, সেখানেও বাৎসল্য ভাবে সন্তানবৎ মাতৃ-

ভাবে সম্বোধন করতে পারতেন না। নায়িকা ভাব ছাড়া নারীকে মাতৃভাবে দেখতেই পারতেন না।

শেষে যখন নিরাশ হয়ে, অনুতপ্ত চিত্তে কিসে এ অস্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এই যখন তাঁর দিবারাত্রের চিন্তা হয়ে উঠলো, তখনই তাঁর অবধূত গুরু লাভ হোলো। একটি বৎসর প্রায়শ্চিত্তের তপস্যার পর তিনি সহজ হলেন, ঐ গুরু তখন তাঁকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। তিনি বলতেন ডাকিনীসিদ্ধির পর প্রায় তিনটি বৎসর তাঁর ভূতগ্রস্তের মতই কেটেছে, কেবল নারীরূপ, নারীসৌন্দর্য্যই সামনে এসেছে। তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এলো গুরুর কৃপায়, তারপর তিনি যথার্থ ঐ সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবমুক্ত হলেন। তাঁর নাম হোলো তখন অবধূত নির্ম্মল। নিজে থেকে গুরুকে বললেন, এখন আমি নির্ম্মল আনন্দের অধিকারী হয়েছি আপনারই কৃপায়, ঐ নামটিই আমার থাক্। তখন থেকেই তিনি নির্ম্মল আনন্দ। এইভাবেই তাঁর নবজন্ম হয়েছিল।

এরপরই তার যোগসাধন আরম্ভ হোলো। রাম—আত্মারামই তাঁর ইষ্ট, তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর তিনি বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। তাঁর যোগসিদ্ধিও অপূর্ব্ব,—তাঁর গুরু যোগেশ্বর তাঁকে তাঁর সর্ব্বপ্রধান শিষ্য বলেছিলেন।

আমি বলিলাম, তা হলে ডাকিনীসিদ্ধির কোন কল্যাণকর ফল নেই?

আমার গুরুকে যোগেশ্বর বলেছিলেন, বৌদ্ধতান্ত্রিক কাপালিকেরা এক শ্রেণী, যাঁরা আত্মশক্তিকে নারীসম্ভোগের (তৃপ্তির) পিছনেই লাগাতে ঐ ভাবের সিদ্ধি আবিষ্কার করেছিল। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি এই সকল ক্রিয়া প্রভাবমুক্ত হয়ে যৌবনে নারীসম্ভোগে অটুট থাকবার জন্যই এই ডাকিনীসিদ্ধি। এতে সিদ্ধ হলে তার উপর অপর কোন শক্তির প্রভাব ক্রিয়া করবে না। তাদের ভোগের আদর্শ হোলো যাকে ইচ্ছা তাকেই তুমি আকৃষ্ট করতে পারবে,—ঐ সিদ্ধির ফলে যুবতী নারীমাত্রেই আকৃষ্ট হবে তোমায় দর্শনমাত্র। আসলে আত্মশক্তিকে এমনই একটি কাজে বা ভোগের পিছনে লাগানো যাতে তার মুক্তি অর্থাৎ আত্মা আর স্বরূপে প্রতিভাত হতে পারবেন না;—পুনঃ পুনঃ দেহ আশ্রয় করে সংস্কারবশে ঐ নারীসম্ভোগেই রত থাকতে হবে, তা থেকে আর মুক্তি নেই। শেষে বলিলেন, গল্পে শোনো নি মাঝে মাঝে যমালয়েও যেমন ভুলে কাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর ভুল সংশোধন করে তাকে আবার এ-লোকে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো পরলোক থেকে,—সেই রকমেই এই ডাকিনী বুড়ী তার শক্তির প্রভাবে পুরন্দর শর্ম্মাকে টেনেছিলেন, আর গোড়া থেকে নারীবিদ্বেষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তাঁকে ঐ স্বল্পকালসাধ্য শক্তিলাভের তপস্যায় লাগিয়েছিলেন। তারপর যখন নায়িকা সিদ্ধ হলেন—তখনই তিনি বুঝলেন এটা বিপথ।

আসলে ঐ মন্ত্রে সিদ্ধির প্রভাবে বা ডাকিনীসিদ্ধির ফলে চিরযৌবন লাভ করে চিরদিন

নারী-নায়িকা যথেচ্ছ সম্ভোগ করা যাবে, কিন্তু তাতে সিদ্ধ হতে গেলে অটুট ব্রহ্মচর্য্য চাই, না হলে কখনই সিদ্ধিলাভ ঘটবে না। আত্মশক্তি ঐ মন্ত্রের গুণে বাধ্য হয়েই সম্পূর্ণ মার্গ উত্তীর্ণ হতে পারবেন, ঐ মন্ত্রে অবিচলিত থেকে।

এইভাবে তন্ত্রসাধন নিয়ে বড় বড় যোগী, মন্ত্রসিদ্ধ কাপালিক তখনকার দিনে যত রকমের ভোগ আছে তার মধ্যে ধনৈশ্বর্য্য, বাহুবল, ইন্দ্রিয়ভোগের অবাধ অধিকার লাভ ঐ আত্মশক্তির সাহায্যে আবিষ্কার করেছিল, যা বরাবরই একশ্রেণীর ভোগকামী বিমূঢ় জীবকে তাদের ঐ পথে পৌঁছে ভোগতৃষ্ণা মিটাতে সাহায্য করেছিল। তাতে আসলে দানবীয় শক্তিই বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজের কল্যাণ হয় নি। শয়তানের খেলা বলেই এগুলিকে দেখা উচিত।

এইভাবে কাশীতে আসিয়া প্রথম কাজ গুরুর জীবন-বৃত্তান্ত শেষ করিয়া একবার আমায় পাক খাওয়াইলেন। দিনটি আমার কি উদ্বেগেই কাটিল,—সকাল হইতেই অদর্শন। ব্যাপারটা এমনি ঘটিল,—উনি নিজে গান করেন, গান শুনিতে তন্ময় হন, বলিতে কি এই কয় মাসে এতগুলি শক্তি-প্রসারের ব্যাপার ছাড়াও গান করিতে করিতেই আমরা কাশীতে আসিয়াছি বলিলে মিথ্যা হইবে না।



সেদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটেই এক সাধু একতারা বাজাইয়া কবীরের গান করিতেছে। তিনি বসিয়া পড়িলেন, তাঁরই কাছে আমিও বসিলাম। মুগ্ধ হইলাম সেই গান শুনিয়া। এমন দোঁহা, এমন ভাবের ভজন আগে শুনি নাই। লোক অনেক হইয়াছে, সে কথা আর বলিতে হইবে না। মগ্ন হইয়া ছিলাম অনেকক্ষণ হইল। যখন আমার হুঁস আসিল তখন প্রভু উধাও হইয়াছেন, সেখানে আর অবধূতের চিহ্নও নাই।

আর গান শুনিয়া সুখ নাই। খুঁজিব কোথায়? গঙ্গাময় কাশীর পশ্চিম কূল একটির পর একটি ঘাট খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলাম— কোথায় রহিয়াছেন জানি না।

ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে দেখি মণিকর্ণিকায় বসিয়া প্রভু এক-মনে শবদাহ দেখিতেছেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, আজ তোমার খাওয়া হয় নি? তা এক-আধদিন যদি উপবাস দাও তো ভালই, তোমরা সাধু লোক। আমার বলিবার আর তো কিছুই নাই।

সারারাত ঐ মণিকর্ণিকার গর্ভে কাটিল,—কথা-গান সব কিছুই হইল। পরদিন আমরা আবার ঘাট বদলাইলাম। হঠাৎ অবধূত বলিলেন, দেখো সিদ্ধি সিদ্ধি করে মানুষ যেমন ক্ষেপে উঠেচে—সেই সিদ্ধির সহজ আয়ত্তাধীন গুণ ও ক্রিয়াশীল প্রতিরূপ হোলো ভাং, ঐ ভাংএ সিদ্ধির আনন্দলাভ হয়,—তুমি খেয়েচ কখনও?

আমার বাবা, খুড়ো, জেঠা এরাই সিদ্ধির ভক্ত, ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে ওর ব্যবহার শুধু নয়, খেয়েও অনেকবার দেখেচি। পরিমিত ব্যবহারে বেশ স্ফূর্তি হয়, নির্ম্মল আনন্দও ভোগ হয়। তবে অভ্যস্ত হলেই সর্ব্বনাশ। কেন, কি হয়?

আমার জেঠামশাই দশটি বৎসর বাতে শয্যাশায়ী থেকে মারা যান।

অবধূত বলিলেন, ঐ বড় দোষ এদের সৃষ্টির, দ্রব্যগুণ আবার অপগুণকে টানে কেন? আবার বলিলেন, তোমার বাবাও তো ভৈরব ছিলেন—তোমার এমন বৈষ্ণব মত কেন?

অদৃষ্ট, কিন্তু যদি তা না হোতো তা হলে আপনার সঙ্গলাভ আমার ঘটতো কি করে?

আচ্ছা, আমায় যদি দেখো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছি, টলচি, তখন আমার উপর আর শ্রদ্ধা রাখতে পারবে;—কি করবে বলো তো?

তখনই গিয়ে পিছনে দু'হাত বাড়িয়ে, যাতে পড়ে না যান এমন ভাবে ধরে দাঁড়াবো।

এই নেশাগুলি কিন্তু অত্যন্ত কল্যাণকারী ভেষজ, জগতে কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল—অবশ্য তার কাজও চলচে—উপকারও যতটা অপকারও ততটা এইভাবে প্রকৃতির রাজ্যের দ্রব্যগুণ বা শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। কত কত জীবের অবলম্বন হয়ে আছে।

সব সময়েই দেখি রামলীলার পর লক্ষ্মণ বর্জ্জন আছেই। ইহা যেন এড়াইবার জোটি নাই।

কাশীতে আসিয়া নানাস্থানে আরও প্রায় একটি মাস কাটাইবার পর অবধূত একদিন নির্জ্জনে বসিয়া বলিতেছেন, দেখো, তোমায় আজ একটা স্বরূপ কথাই বলব। আজই সে লগন এসেছে, এখন কথাটা তোমায় বলতেই হবে। দেখলে তো অনেক কিছু। এত দিন তো ঘুরে ঘুরেই কাটলো, অথচ পেটে তোমার কত বড় গুণ আছে, শিল্পী মানুষ। শিল্পীর প্রকৃতি তোমার পাগল স্বভাব, তার উপর মনের অতটা শক্তি নিয়ে, আর কেন,—

এইবার বসে যাও কোথাও, নিজে কিছু করো, যা শুনেছো পেয়েছ, দেখেচও কম নয়. সঙ্গে যোগশাস্ত্রের যা কিছু মিলিয়ে নাও, কাজের মত কিছু কাজ হোক। ও'ই জীবনের সম্বল হয়েই থাকবে।

বুঝিলাম এবার কাটিবার ও কাটাইবার সময় আসিয়াছে, এটা তারই গৌ হইল। বলিলাম, আপনি তো বুঝেছেন, আমার সবই জেনেছেন,—আপন আমার কোন কথা বলতে বাকী রাখি নি, জীবনের সব কথাই বলেচি। তারপর ' সঙ্গ, আমার দিক থেকে শুধু নয়, আপনারও জানতে বাকী নেই যে, এই কয় মাস টানে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছি। প্রথমে আমি নিজেই পরিষ্কার বুঝি নি কি ' দু'মাসে বুঝেছি আমি আপনাতে আত্মসমর্পণই করেছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস আগেই এটা বুঝেছিলেন। সত্যই বুঝে যদি থাকেন, তাহলে আপনিই বলুন ' করবো,—আপনি যা বলবেন তাই আমি করবো। আর তাতেই আমার ইষ্টলাভ বিশ্বাসেই করবো।

তুমি তো প্রয়াগ থেকেই কোথাও বসে যাবে বলে চেষ্টা করছিলে?

তারপরে সঙ্গমে স্নানের পরেই আপনি তো লটকে ফেললেন—

তুমি ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়াতে বুঝি, খুব প্যাঁচ খেলতে আর উড়ন্ত ঘুড়ি লটকাতে? খুব কথাটা লাগিয়েছ—এখন বলো লটকাবার পর কিভাবে নাবিয়ে নিয়েছি তোমাকে।

আমি নামানোর কথা কল্পনাও করি নি, কারণ আপনি লটকে আমায় নামান নি সঙ্গেই রেখেচেন। এখন মাঝপথে নামাবার মুখেই খসিয়ে দিচ্চেন।

তা এখন সত্যই তো নিজে কিছু করবার সময় হয়েছে—এতদিন ঘোরাফেরা করে অনেক বিষয়ে তো জ্ঞান হয়েছে, এখন নিজে করো, এক জায়গায় আসন করে বসে লেগে যাও,—তাইতেই তোমার ভালো হবে।

আমি বলিলাম, ভালো আর কি হবে আমার—আপনার সঙ্গই আমার ভালো।

পাগল নাকি, এর পর তোমার সঙ্গ কত লোক কামনা করবে জানো তুমি? অবশেষে অবধূত বলিতে লাগিলেন, এদিককার কাজ শেষ করে যখন আবার নূতন মানুষ হয়ে সংসারে প্রবেশ ঘটবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, ঐ কথাটা এমনই ভয়ঙ্কর আমার পক্ষে—

কিন্তু তোমার শুনতে অরুচিকর বললে তো কাজ হবে না, বিধাতার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে হবে তো? এখন তোমার সাধনশেষে যে অধ্যাত্মশক্তির পুঁটলি বেঁধে নিয়ে সংসারে ঢুকবে তাই-ই হবে তোমার পুঁজি। তাই ভাঙিয়ে চলবে তোমার জীবন, কত লোকের কামনার বস্তু হবে তোমার সঙ্গ, কত লোককে পথ দেখাবে—

না, গুরুগিরির কথা বলবেন না, বড়ই কঠিন কর্ম্ম;—সিদ্ধ না হলে গুরু হওয়া

বিড়ম্বনা। তাইতেই ভণ্ড ভাবে ভরে গিয়েছে আমাদের সমাজ,—ও আমি চাই না।

থাক্, তাহলে ভণ্ড ভাবে পূর্ণ না করে তুমি যাতে নিজ ভাবে পূর্ণ করতে পার সমাজকে সেই চেষ্টাই করবে। মোট কথা এখন তোমার নিজের কিছু ধববার সময়ই হয়েছে, পরের ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল দেখা অনেক হযেছে, এখন বসে যাও।

সে তো ধরেচি অনেক দিন।

শুনিয়া তিনি বলিলেন, সে ধবা, নিজে না বসলে, ফল দেবে না, বুঝেছ?

বোধ হয় বুঝেছি। এখন জানতে ইচ্ছা, আপনি কি কববেন, কোথাও যাবেন? কি ভাবে থাকবেন, এই কথাই তো মনে হচ্চে।

অবধূত বলিলেন, তা আমি হযতো একটু অসহায় হয়ে পডবো বটে তোমার অভাবে কিন্তু তার পর আবার চলে যাবে, যেমন তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে চলছিল। এক এক গ্রামে যাওয়া, একটা রাত্রি কাটিযে, দক্ষিণ ভাবত হয়েচে উত্তর হয়েচে শেষ এই কাশী থেকেই যেখানে যাবো শুনলে তোমার মনে আবার চাঞ্চল্য আনতে পারে তাই বলব না।

না, আমার এখন মন আব চঞ্চল হবে না। কারণ আমায় যে বসে যেতেই হবে।

বেশ, তা হলে জেনে রাখো হিমালয়েই যাবো, যাতে আর ফিরে আসতে না হয় এই কামনা নিয়েই যাবো। তা হলে তুমি যাচ্চ তোমার বসবার জাযগায়, কেমন? জায়গা ঠিক আছে তো?

বলিলাম, তা একরকম আছে মনে মনে।

বলিলেন, কোথায়?

বৃন্দাবনে।

শুনিয়াই প্রসন্ন বদনে আনন্দে যেন অধীর হইয়াই বলিলেন, খুব ভাল, ঐ স্থানটিতে অনেক সিদ্ধির বীজ পড়ে আছে—এমন স্থান আর নেই। আমি তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম। জোড়হাতে প্রণাম করিলেন—জয়গুরু—জয়গুরু—জয়গুরু।

পরদিন প্রাতে আমায় লইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, আমায় মুণ্ডন করাইলেন, তার পর স্নানে নামিয়া জলে ডুব দিবার সময় বলিলেন, ডুব দিয়ে উঠবার সময়ে পৈতেটা যেন আর গলায় না থাকে। তারপর একখানি সাদা কৌপীন ও বহির্ব্বাস আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহা পরাইলেন, বলিলেন, শীত আসচে একখানা কম্বল যোগাড় করে নিও, বলিয়া পদব্রজে রাজঘাট স্টেশনে আনিয়া হাতে আমার দশ টাকার একখানা নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, যাও এবার বৃন্দাবনে, তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি যাত্রা করবো, তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি যাব উত্তরে। আশ্চর্য্য মানুষ, কখনও যিনি সঙ্গে এক পয়সাও রাখেন না, তাঁর কাছে কখনও দেখি নাই, কাহারও নিকটে পয়সা ভিক্ষা করিতে দেখি নাই—তিনি

এই দশ টাকা কোথা হইতে পাইলেন ?

একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না, আচ্ছা, আপনি তো ভালই জানেন, ধ্যে মধ্যে খটকা আছে, এ কাজে নেমে সন্দেহ আসবে—তখন কি হবে,—গুরু নেই, আপনিও থাকবেন না কাছে, কি করবো তখন ?

কানের কাছে মুখটি আনিয়া চুপিচুপি ফিসফিস করিয়া বলিয়া দিলেন,—সেই জগদীশ বাবা আছেন, তাঁরই কাছে যেও, সব ঠিক করে দেবেন।

-শেষ—